
মাসুদ রানা
গোপন শত্রু
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা

মাসুদ রানা

গোপন শত্রু

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

কারও সঙ্গে দেখা করতে রওনা হয়ে নির্জন পাহাড়ী পথে যদি অচল হয়ে বসে থাকতে হয়, কেমন লাগে? অপেক্ষা করতে যাদের ভাল লাগে না, মাসুদ রানা তাদেরই দলে। বলা যায়, অ্যাকশন-প্রিয় মানুষের এটা একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তবে প্রতীক্ষারও রকমফের আছে। পাগল বিজ্ঞানী কবীর চৌধুরী বা বহুরূপী দাতাকু হাইয়াত কোথাও আসবে শুনলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওত্ পেতে বসে থাকতে ওর খারাপ তো লাগবেই না, বরং প্রতিটি মুহূর্তে উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ অনুভব করবে। কিন্তু এই মুহূর্তে যা করছে ও, অচল গাড়ির বনেটে বসে মেকানিকের অপেক্ষায় পথের দিকে তাকিয়ে থাকা, এরচেয়ে একঘেয়ে ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না।

মানচিত্রে ঠিক যেন পানির একটা ফোঁটা, কবি বলেছেন সিন্ধু টিপ্—শ্রীলঙ্কা। যুদ্ধ ও রক্তপাত কিন্তু দেশটার উত্তর দিকটায় ফুল ফুটতে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। পাহাড়ের গা সবুজে মোড়া। সাদা, লাল, বেগুনি, সোনালি ও গোলাপী স্রোতের মত নেমে এসে একেবারে সৈকত ছুঁই-ছুঁই করছে থোকা-থোকা চেনা-অচেনা কত রকমের ফুল। আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী পথ, প্রতিটি বাঁকেই নতুন কিছু না কিছু আছে। আঁকা ছবির মত দু'একটা খামারবাড়ি।

পাহাড় চূড়ায় ঝুলে থাকা প্রাচীন দুর্গ। স্বল্পবসনা সিংহলী তরুণী, হাট থেকে একা ফিরছে–চোখে চোরা চাহনি, নিতম্বে উথালপাথাল ঢেউ, ঠোঁটে রহস্যময় হাসি। কিংবা হয়তো রোডব্লক; কখনও সরকারী সৈন্যেরা সার্চ করার জন্যে থামতে বলছে, কখনও তামিল টাইগার গেরিলারা–যে এলাকা যখন যাদের দখলে আর কি।

সব কিছুই শ্বাসরুদ্ধকর; কিন্তু রানার জন্যে উপভোগ্য হয়ে উঠতে না পারার কারণ হলো, নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যে পৌঁছে বিশেষ একটা বোট ধরার জন্যে ছুটছিল ও, হঠাৎ বিনা নোটিশে মাঝপথে বিকল হয়ে গেল রেন্ট-আ-কারের পুরানো ঝক্কড়মার্কা মার্সিডিজ।

কাজ চালাবার মত সিংহলী ও তামিল ভাষা রানা জানে, এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ভাগ্যগুণে একটা ট্রাক আসতে দেখে হাত তুলে থামাল, ড্রাইভারকে অনুরোধ করল পরবর্তী শহর থেকে কাউকে যেন পাঠায়।

কলম্বো থেকে ক্যান্ডিতে আসে রানা ট্যাক্সি নিয়ে। নতুন হেলিকপ্টার সার্ভিস চালু হয়েছে শুনে সরাসরি পয়েন্ট পেড্রোতে যেতে চেয়েছিল। পয়েন্ট পেড্রো শ্রীলঙ্কার একেবারে উত্তর প্রান্ত। কিন্তু ওকে বলা হলো, ওদিকটা ওঅর জোন, হেলিকপ্টার মানকুলাম-এর পর আর যাবে না। মানকুলাম থেকে হাইওয়েটা পয়েন্ট পেড্রোর কাছাকাছি পৌঁছে দিতে পারত ওকে, কিন্তু হেলিকপ্টারের পাইলট কথায় কথায় জানাল একশো চল্লিশ মাইল রাস্তা পেরুতে অন্তত চোদ্দবার রোডব্লকে থামতে হবে ওকে–কখনও থামাবে সরকারী সৈন্যরা, কখনও তামিল টাইগার গেরিলারা। অবিশ্বাস্য হলেও, মানকুলামের পর উত্তর দিকে এটাই বাস্তবতা, দু'পক্ষ যে যেখানে পেরেছে দখল করে রেখেছে হাইওয়ে, শহর, বন্দর ও বাজারের অংশবিশেষ। ঝামেলা এড়াতে মানকুলাম থেকে পুব দিকে রওনা হলো রানা, উদ্দেশ্য সন্ধিপুরা পৌঁছানো, তারপর পাহাড়ী রাস্তা ধরে পয়েন্ট পেড্রোতে যাবে,

সঙ্গিনী হিসেবে ওর ডান পাশে থাকবে ভারত মহাসাগর।

সব ঠিকঠাক মতই চলছিল–মানকুলাম থেকে সন্ধিপুরা, সন্ধিপুরা পিছনে ফেলে আরও পঞ্চাশ মাইল পেরুতে মাত্র তিনবার রোডব্লকে থামতে হয়েছে; কিন্তু তারপর হঠাৎ পাহাড়ের মাথায় বেঁকে বসল মার্সিডিজ। এখন যেহেতু অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু করার নেই, গাড়ির বনেটে বসে পাখি দেখছে রানা, তাদের সুরে সুর মিলিয়ে শিস দিচ্ছে। শুধু পাখিরা নয়, মাঝেমধ্যে কাঠবিড়ালী, গিরগিটি, খরগোশ ও হনুমানও সঙ্গ দিচ্ছে ওকে। তবে মনে রীতিমত চোটই পেল যখন দেখল মহাবীর হনুমান ভেংচি কাটছে ওকে, আর হুপ্-হুপ্ করে যেন বলতে চাইছে, 'যে আসে লঙ্কায় সে-ই হয় রাবণ।' রামভক্তের এই আচরণ প্রত্যাশিত নয়, গ্রহণযোগ্যও নয়। সেটাই সবিনয়ে বলতে চেষ্টা করল ও। উত্তরে হনুমানটি কয়েকটা কচি ডাব ছুঁড়ে মারল।

ডাবের ঠাণ্ডা পানি খেয়ে তেষ্টা মেটাল রানা। হনুমানকে বলে কোন লাভ নেই, তবে রাবণ হতে নয়, বরং কয়েকটা রাক্ষসের খোঁজ পেতেই লঙ্কাদ্বীপে পাঠানো হয়েছে ওকে। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকায় বসে তাঁর অন্যতম দুর্ধর্ষ এজেন্টকে ব্রিফ করেছেন। ঘটনাটা ছবির মত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রানা।

কবীর চৌধুরীর মিসাইল ঘাঁটি ধ্বংস করে দিয়ে চীন থেকে দেশে ফেরার পর লম্বা একটা ছুটি পেতেই পারে রানা। এ-ব্যাপারে বসের প্রাইভেট সেক্রেটারি ইলোরার সঙ্গে কাল ওর আলাপ হয়েছে। ইলোরা আভাস দিয়েছে, বসের মন-মেজাজ এখন ভালই, ছুটি চাইলে না পাবার কোন কারণ নেই। তাই আজ অফিসে এসেই ওর প্রাইভেট সেক্রেটারি কাকলিকে দিয়ে দরখাস্তটা লিখিয়ে নিচ্ছে রানা। গৎ বাঁধা কয়েকটা মাত্র কথা, ডিকটেশন

দেয়ার দরকার নেই; নির্দেশ পেয়েই আউটার রুমে ফিরে গিয়ে কমপিউটরের সামনে বসে পড়েছে কাকলি। তার মন অবশ্য বেশ একটু ভার হয়ে আছে, জানে রানা। কারণটা হলো, সে-ও ছুটি চায়। বেচারি চেয়েছিল রানার সঙ্গে নিজের দরখাস্তটাও বসের কাছে পাঠাবে, কিন্তু তার সে প্রস্তাবে সরাসরি ভেটো প্রয়োগ করেছে ও। মেজাজ যতই ভাল থাকুক, ছুটির দরখাস্ত দেখলেই গম্ভীর হয়ে যান বস্। একসঙ্গে দুটো দরখাস্ত দেখলে রেগে গিয়ে দুটোই না-মঞ্জুর করতে পারেন। কাজেই রানা কোন ঝুঁকি নিতে চায়নি।

ডেস্কে তোলা জুতোসুদ্ধ পা নাচছে, নাভী ঢাকা শার্টের ওপর কাপ-পিরিচ, কফি থেকে ধোঁয়া উঠছে; বন্ধ চোখের ভেতর আসা-যাওয়া করছে ক্যারিবিয়ান সাগরের খুদে দ্বীপ, লাস ভেগাসের আলো ঝলমলে ক্যাসিনো, অথৈ মহাসাগর আটলান্টিকের উত্তাল ঢেউ ভেঙে ছুটে চলা ঝকঝকে ইয়ট, মাদ্রিদের রক্ত গরম করা বুলফাইট, মস্কোয় মাইকেল জ্যাকসনের লাইভ শো, রাবাতের নাইটক্লাবে মিশরীয় নর্তকীর বেলী ডান্স...তাসত্ত্বেও নিজের ওপর বিরক্ত রানা, কারণ ছুটিটা কোথায় কাটাবে ঠিক করতে পারছে না কিছুতেই।

হঠাৎ ইন্টারকম বাজল। সাবধানে রিসিভার তুলতেই কানে ঢুকল রাহাত খানের ভারী গলা, 'রানা?' উত্তরের অপেক্ষায় থাকলেন না। 'এখুনি একবার আমার চেম্বারে চলে এসো।'

কোল থেকে কাপ-পিরিচ তুলে ডেস্কে রাখল রানা, চেয়ার ছেড়ে টাইয়ের নট ঠিক করল, ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে। বসের গলায় কি যেন একটা আছে, এখনও সেটা বাজছে কানে, কথাগুলোর অনুরণন ওর স্নায়ুতন্ত্রে কম্পন সৃষ্টি করছে। কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এল ও, চিন্তায় ঝুঁকে আছে মাথাটা, সামনে এসে দাঁড়াল কাকলি। 'এই নাও তোমার ছুটির দরখাস্ত,' বলে

কমপিউটর প্রিন্ট-আউটটা ওর হাতে ধরিয়ে দিল। ‘সই করার আগে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ো।’

‘ঠিক আছে,’ বিড়বিড় করল রানা, কাকলিকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল করিডরে, দেখতেই পেল না যে ওর পিঠে কিল মারার ভঙ্গি করছে কাকলি, চোখের তারায় দুষ্টামির ঝিলিক।

ইলোরা তার ডেস্কে নেই দেখে একটু অসহায় বোধ করল রানা, বস্ কেন ডেকেছেন তা আগাম জানার কোন উপায় নেই। চেম্বারের দরজায় নক করতে গম্ভীর আওয়াজটা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল, ‘কাম ইন।’

ভেতরে ঢুকে এক মুহূর্ত থমকাল রানা, দেখল, ডেস্কের পিছনে দেয়ালজোড়া ওয়ার্ল্ড ম্যাপের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বস্।

‘এদিকে এসো,’ রানার দিকে না ফিরেই বললেন রাহাত খান। একটু আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পাশে এসে দাঁড়াল রানা, বসের কপালের পাশে একটা শিরা লাফাচ্ছে দেখে ওর শরীরেও সংক্রমিত হলো প্রবল উত্তেজনা। বুঝে নিল কপালে ছুটি নেই, তবে সেজন্যে কোন খেদ অনুভব করছে না। সাধারণ মানুষ কখনোই টের পায় না যে আপাত শান্তির সময়ও একের পর এক কঠিন যুদ্ধে জড়িয়ে থাকে দেশ, সেই গোপন যুদ্ধে সেনাপতিত্ব করেন রাহাত খান, সম্মুখ সমরে থাকে রানা বা রানার মত নির্ভীক ও নিঃসঙ্গ কোন যোদ্ধা। রানা নিশ্চিত, ওকে আজ আরেকটা নতুন রণাঙ্গনে পাঠাবার জন্যেই ডেকেছেন বস্। নিশ্চয়ই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোথাও কোন ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে।

রাহাত খান কোন ভূমিকা করলেন না, হাতের পয়েন্টার দিয়ে ম্যাপের বিভিন্ন জায়গা চিহ্নিত করছেন। ‘এই বন্দরগুলো লক্ষ করো,’ বললেন তিনি। ‘পুবদিকে ম্যানিলা, হংকং, সিঙ্গাপুর, জাকার্তা, টোকিও, ডারউইন ও পার্থ; পশ্চিমে মালে, মুম্বাই,

করাচি, মোগাদিসু, মোম্বাসা, মৌরিতাস, ডারবান, পোর্ট এলিজাবেথ, মাল্টা, সিসিলি, ত্রিপোলি, জিব্রাল্টার, সেভিল, লিসবন, রোম, মার্সেই; তারপর দুই আমেরিকার বিভিন্ন বন্দর—সব মিলিয়ে প্রায় চল্লিশটা পয়েন্ট, রানা।'

'চল্লিশটা পয়েন্ট কি, স্যার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

পয়েন্টার রেখে দিয়ে ডেস্কের দিকে এগোলেন রাহাত খান, রিভলভিং চেয়ারে বসে বাক্স খুলে একটা হাভানা চুরুট ধরাচ্ছেন। 'বসো,' ইঙ্গিতে সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। রানা লক্ষ করল, বসের হাত দুটো পুরোপুরি স্থির নয়, একটু কাঁপছে। 'এই চল্লিশটা পয়েন্টে গত দুই-তিন দশক ধরেই চোরাই জ্বালানি তেল বিক্রি হচ্ছে। তবে ছ'মাস ধরে তার পরিমাণ অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে। বিরাট কোন নতুন উৎস থেকে সাপ্লাই পাচ্ছে চোরাকারবারীরা। এই তেল অত্যন্ত উন্নতমানের, রিফাইন করারও দরকার হচ্ছে না।'

রানার ঠিক বিশ্বাস হতে চাইছে না যে বিসিআই চোরাই তেল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। এরমধ্যে নিশ্চয়ই আরও কোন ব্যাপার আছে। জিজ্ঞেস করল, 'কতটা বেড়েছে, স্যার?'

'হিসাবটা আনুমানিক, তবে খুব একটা এদিক-ওদিক হবে না,' বললেন রাহাত খান। 'আগে ধরো প্রতিমাসে তিন থেকে পাঁচ লাখ ব্যারেল বিক্রি হচ্ছিল। এখন সেটা বেড়ে পঁচিশ থেকে ত্রিশ লাখ ব্যারেলে দাঁড়িয়েছে।'

হিসাবটা হয়তো আঁতকে ওঠার মতই। তবে এখনও রানা অন্ধকারে। বলল, 'বাংলাদেশে তো, স্যার, তোলার মত তেল পাওয়া যায়নি; তাহলে এ নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি কেন?'

'হ্যাঁ, অতি সামান্য যা তেল পাওয়া গেছে, তুলতে গেলে খরচে পোষায় না,' বললেন রাহাত খান। 'আমাদের গ্যাস আছে প্রচুর, কিন্তু তেল নেই, এটাই ধরে নেয়া হয়েছে। সেজন্যেই মাথা

ঘামাতে হচ্ছে, রানা। তেলই যেখানে নেই, সেখানে বাংলাদেশকে তেল বেচার জন্যে পীড়াপীড়ি করা হবে কেন?'

'ঠিক বুঝলাম না, স্যার।'

'দুটো মার্কিন কোম্পানি–উইলস্ আর ফরচুনা। গত দু'তিন মাস ধরে পেট্রোলিয়াম করপরেশন, জ্বালানি মন্ত্রণালয়, সিনিয়র মন্ত্রী, এমনকি প্রধানমন্ত্রীকেও বিরক্ত করে মারছে ওরা। তেল নেই, এ-কথা বলে চুক্তি করতে রাজি না হওয়ায় উইল্স-এর এক প্রতিনিধি রেগে গিয়ে মীটিং থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বলেছে–"চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, সেদিকে চোখ নেই, অথচ আমরা পয়সা দিয়ে কিনতে চাইলে দেবে না!" '

রানার দম আটকে এল। 'বলেন কি, স্যার! কি বলতে চায়, ব্যাখ্যা চাওয়া হয়নি?'

'হয়েছে। সে এখন অস্বীকার করছে–এ-ধরনের কথা নাকি বলেনি। কিন্তু আমাদের সিনিয়র একজন মন্ত্রী নিজের কানে তাকে কথাটা বলতে শুনেছেন। আরেক কোম্পানি, ফরচুনা। এরাও তেল নেই জানার পরও মোটা টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে তেল কেনার চুক্তি করতে চায়। প্রশ্ন করায় জবাব দিয়েছে, তেল পাওয়া না গেলে লোকসান দেবে তারা, তাতে বাংলাদেশের তো লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। প্রশ্ন হলো, ফরচুনাই বা কেন বোকার মত লোকসান দিতে চাইছে?'

'তাই তো!' রহস্যটা আরও জটিল লাগছে রানার। 'তাছাড়া, স্যার, চল্লিশটা বন্দরে চোরাই তেল বিক্রির সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে উইলস ও ফরচুনার তেল কিনতে চাওয়ার কি সম্পর্ক?'

'এ প্রশ্নের উত্তর তোমার কাছ থেকে চাই আমি,' বললেন রাহাত খান, চুরুট ধরা হাতের তর্জনী সরাসরি রানার বুকে তাক করা। 'এটাই তোমার অ্যাসাইনমেন্ট, রানা।'

ঘাবড়ে গেল রানা। 'কিন্তু, স্যার...,' প্রতিবাদ করে কিছু

বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল, পরিবর্তে জিজ্ঞেস করল, '...মানে, আর কোন তথ্য নেই?'

'তোমার কাজে লাগবে, এরকম মাত্র একটা তথ্য পেয়েছি আমরা,' বিসিআই চীফ বললেন। 'সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে শোনো প্রাথমিক তদন্তে কি জানা গেছে।'

সময় নিয়ে, ধীরে ধীরে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলেন রাহাত খান। সারা দুনিয়া জুড়ে বিভিন্ন বন্দরে চোরাই তেল বিক্রির পরিমাণ অস্বাভাবিক মাত্রায় বেড়ে গেছে, এই খবরটা মাত্র দুমাস আগে জানতে পারে বিসিআই। প্রায় একই সময়ে বিদেশী দুই তেল কোম্পানি বাংলাদেশ থেকে তেল কেনার জন্যে রীতিমত মাথা কুটতে শুরু করে। বিসিআই প্রথমে কয়েকজন ইনফর্মারকে গোপনে খবর নিতে বলে, জানতে চায় চোরাই তেলের সরবরাহ বেড়ে যাবার কারণ কি। ইনফর্মাররা নিরেট কোন তথ্য দিতে পারেনি, শুধু বিভিন্ন বন্দরে ছড়িয়ে পড়া একটা গুজবের কথা রিপোর্টে উল্লেখ করেছে। গুজবটা হলো, এই তেল নাকি বাংলাদেশ থেকে আসছে।

এরপর বিসিআই কয়েকজন এজেন্টকে তদন্ত করতে পাঠায়। তারা কয়েকটা জাহাজকে অনুসরণ করে, ওগুলো চোরাই তেল খালাস করে সাগরে ফিরে যাচ্ছিল। পাঁচটা জাহাজকে অনুসরণ করা হয়–দুটো প্রশান্ত মহাসাগরে, দুটো আটলান্টিক মহাসাগরে, একটা ভারত মহাসাগরে। পাঁচটা জাহাজই গভীর সাগরে অপেক্ষারত সুপারট্যাংকারের পাশে এসে ভেড়ে, এবং তেল নিয়ে আবার বন্দরের দিকে ফিরে যায়। এর অর্থ হলো, জাহাজগুলো সরাসরি উৎস থেকে তেল চুরি করছে না। এরপর বিসিআই এজেন্টরা সুপারট্যাংকারগুলোর ওপর নজর রাখতে শুরু করে। গভীর সাগরে কাজটা অত্যন্ত কঠিন। বোট ও হেলিকপ্টার নিয়ে অনুসরণ করা হয়েছে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট সুপারট্যাংকারের কাছে

ব্যাপারটা গোপন থাকেনি। ফলে যেখান থেকে তেল সংগ্রহ করে সেদিকে যায়নি ওগুলো। সব মিলিয়ে এরকম আটটা সুপারট্যাংকার শনাক্ত করা হয়েছে। বিসিআই এজেন্টরা রিপোর্ট করেছে, ওগুলো কোন না কোন সময় ভারত মহাসাগর ধরে বঙ্গোপসাগরের দিকে আসে, কিন্তু পিছু নেয়া হয়েছে বুঝতে পারলেই অন্যদিকে চলে যায়, কিংবা দাঁড়িয়ে পড়ে–তখন অন্য একটা ট্যাংকার এসে তেল দিয়ে যায়। তবে তার মানে এই নয় যে অনুসরণ করা না হলে বাংলাদেশের উপকূলের দিকে আসত ওগুলো। পুরোটা উপকূল এলাকার ওপর কড়া নজর রাখা হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন জাহাজ বা সুপারট্যাংকারকে বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশ করতে দেখা যায়নি।

রানা এই পর্যায়ে বলল, 'ওগুলো বাংলাদেশের জলসীমায় ঢুকছেই না যখন, কি করে বলা যায় ওই তেল আমাদের?'

'ব্যাপারটাকে আমি একটা ধাঁধা হিসেবে দেখছি, রানা,' রাহাত খান বললেন। 'সমাধানের দায়িত্ব তোমার। তবে এ-প্রসঙ্গে তোমাকে মনে করিয়ে দিই, বাংলাদেশের বিশাল একটা এলাকায় তেল আছে কিনা তা স্বাধীনতার পর জরিপ করে দেখা হয়নি। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে যে-সব জরিপ হয়েছিল, তার বেশিরভাগই ইসলামাবাদে রয়ে গেছে, বারবার চেয়েও আদায় করা যায়নি। এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না যে ওই তেল অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য এক কৌশলে বাংলাদেশ থেকেই চুরি করা হচ্ছে।'

'এখানে কারিগরি জ্ঞানের কথাটাও মাথায় রাখতে হবে, স্যার,' বলল রানা। 'হাইলি সফিসটিকেটেড টেকনিক্যাল নো-হাউ আয়ত্তে না থাকলে কোন দেশ থেকে তেল চুরি করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।'

'এখানে তাই আবার দুই মার্কিন কোম্পানি উইলস আর

ফরচুনার প্রসঙ্গ চলে আসে,' বললেন রাহাত খান। 'তেল আবিষ্কার ও উত্তোলনের ব্যাপারে ওরা এক্সপার্ট। হয়তো এই দুই কোম্পানি নয়, এদের সমগোত্রীয় কোন কোম্পানি এই তেল চুরির সঙ্গে জড়িত, কোনভাবে সে-খবর এরা জেনে ফেলেছে, তাই বাংলাদেশের সঙ্গে তেল কেনার চুক্তি করতে এতটা মরিয়া ভাব দেখাচ্ছে।'

'সেক্ষেত্রে, স্যার, এই দুই কোম্পানি আসল কথাটা আমাদেরকে বলে দিচ্ছে না কেন? তাদের তো এ-কথা বোঝা উচিত যে এই উপকারটা করলে তাদেরকেই আমরা তেল তোলার সুযোগ দেব।'

'এটাও একটা রহস্য, এর সমাধানও তোমাকে করতে হবে,' নিভে যাওয়া চুরুটে আগুন ধরাচ্ছেন বিসিআই চীফ। 'তবে আসল কথা বলতে না চাওয়ার পিছনে অনেক কারণই থাকতে পারে, রানা। হয়তো তেল চুরির সঙ্গে বড় কোন আন্তর্জাতিক ক্রাইম সিন্ডিকেট জড়িত, ভয়ে এরা মুখ খুলতে পারছে না। কিংবা হয়তো লাভের বখরা এরাও পাচ্ছে, কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট নয়, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে।'

'আপনি একটা তথ্যের কথা বলছিলেন, স্যার,' মনে করিয়ে দিল রানা।

'তার আগে একটা ক্লু দিই তোমাকে,' বললেন রাহাত খান। 'সবগুলো সুপারট্যাংকার একই কোম্পানির, নাম লা মর্তে ল্যাম্পি শিপিং লাইন। লাইবেরিয়ায় রেজিস্ট্রি করা, ব্যবসা দেখাশোনা করে লইয়ারদের একটা চেম্বার, মালিকের পরিচয় কোন অবস্থাতেই তারা প্রকাশ করবে না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রাহাত খান, রানার জন্যে নতুন অভিজ্ঞতাই বটে। 'একটা সুপারট্যাংকারের ক্যাপাসিটি কম করেও দুই লাখ পঁচাত্তর হাজার টন, দাম পড়ে কয়েক হাজার কোটি টাকা। মর্তে ল্যাম্পির হাতে

পুরো একটা বহর রয়েছে। আমার ধারণা, অত্যন্ত শক্তিশালী একটা ক্রাইম সিন্ডিকেট ওগুলোর মালিক।

'এবার যে তথ্যটা তোমার কাজে লাগবে। দুনিয়ার প্রায় বন্দরেই স্টিভিডরদের সংগঠন চালায় মাফিয়ারা, বন্দরের সমস্ত চোরাকারবারও তাদের নিয়ন্ত্রণে। চোরাই তেল এই মাফিয়ারাই কিনছে, কিন্তু নগদ টাকায় নয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বন্দর থেকে চেক যাচ্ছে একটা সুইস ব্যাঙ্কের নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে। গোপন সূত্র থেকে আমরা জানতে পেরেছি, অ্যাকাউন্টটা কোন ব্যক্তির নামে নয়, একটা প্রতিষ্ঠানের নামে। প্রতিষ্ঠানের নাম ফোরবল। আরও জানা গেছে, ফোরবল-এর হেড অফিস শ্রীলঙ্কার জাফনায়।

মনে মনে প্রমাদ গুণল রানা। বলল, 'জাফনা তো নিষিদ্ধ এলাকা, স্যার। জাফনার ওপর শ্রীলঙ্কা সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণই নেই। তামিল টাইগাররা বাইরের কোন লোককে ওখানে ঢুকতেই দেয় না। তাছাড়া, প্রতিদিন ওখানে তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে।'

'সেজন্যেই একটা ক্রাইম সিন্ডিকেটের জন্যে জাফনা নিরাপদ আস্তানা,' বললেন রাহাত খান। 'তুমি কাজ শুরু করবে সিংহলের পয়েন্ট পেড্রো থেকে, তবে আমার ধারণা জাফনাতেও তোমাকে যেতে হবে। ওখানে আমাদের একজন ইনফর্মার আছে, আশা করি সে তোমাকে জাফনায় ঢুকতে সাহায্য করতে পারবে। তার নাম ফয়সল। পেশায় গাইড।'

'কোথায় দেখা হবে আমাদের?' জানতে চাইল রানা।

'গোটা ব্যাপারটা জানিয়ে তাকে আমরা তদন্ত করতে বলেছিলাম,' রাহাত খান বললেন। 'দিন দশেক পর গতকাল মেসেজ পাঠিয়েছে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য পেয়েছে সে, কিন্তু সে-সব টেলিফোনে বলা বা ফ্যাক্স যোগে পাঠানো সম্ভব নয়, কারণ তামিল টাইগাররা এ-সব মনিটর করে। তাছাড়া, তার ওপর নাকি নজরও রাখা হচ্ছে।'

‘কারা নজর রাখছে, স্যার?’

‘তা ফয়সল জানায়নি,’ বললেন রাহাত খান। ‘এই মুহূর্তে একদল ইউরোপিয়ান জার্নালিস্ট জাফনা সফর শেষ করছে, কাল তারা জাফনা থেকে একটা বোট নিয়ে পয়েন্ট পেড্রোতে আসবে। ফয়সল ওদের গাইড হিসেবে কাজ করছে। জার্নালিস্টদের জাহাজ অপেক্ষা করছে ওখানে। তাদেরকে জাহাজে তুলে দিয়ে আবার জাফনায় ফিরে যাবে সে। মেসেজে জানিয়েছে, আমরা যদি পয়েন্ট পেড্রোতে কাউকে পাঠাই তাহলে তথ্যগুলো তাকে জানাতে পারে সে।’

রানা এক সেকেন্ড ইতস্তত করে বলল, ‘ফয়সলকে টোপ বানানো হয়নি তো, স্যার?’

‘তোমাকে ফাঁদে ফেলে ধরার জন্যে?’ বিসিআই চীফ গম্ভীর হলেন। ‘অসম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে তোমার কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে। যারা তোমাকে ধরবে তাদের পরিচয় জানতে পারবে তুমি।’

মনে মনে আঁতকে উঠল রানা। বুড়ো বলে কি! শত্রুর পরিচয় জানা যাবে, তাই তাদের ফাঁদে ধরা পড়াটাকে আশীর্বাদ বলে চালাতে চাইছে! তারা যে ওকে বাগে পেয়েই মেরে ফেলতে পারে, এটা একবারও ভাবছে না।

যেন রানার মনের কথা বুঝতে পেরেই ঘন গোঁফের ভেতর মুচকি একটু হাসলেন রাহাত খান। ‘ঝুঁকি একটু থাকলেও, আমি চাই এই তেল-চোরদের হাতে তুমি ধরা পড়ো। শুধু যে পরিচয় জানতে পারবে তা নয়, তাদের প্রভাব আর ক্ষমতা সম্পর্কেও পরিষ্কার একটা ধারণা পেয়ে যাবে তুমি।’

‘কিন্তু,’ মনের ভাব কোনরকমে চেপে রেখে স্পষ্ট উচ্চারণে প্রশ্ন করল রানা, ‘আমাকে নিয়ে ওদের যদি অন্য কোন রকম প্ল্যান থাকে?’

‘অন্য কোন রকম প্ল্যান বলতে ঠিক কি বোঝাতে চাইছ তুমি?’ পাল্টা প্রশ্ন করলেন বস্।

‘ধরুন ওরা আমাদের পুরানো কোন শত্রু। ফাঁদটা পাতবেই ধরতে পারলে আমাকে মেরে ফেলার জন্যে।’

‘ধরল আর মারল, সাধারণত এরকম ঘটে না,’ বললেন বস্। ‘অন্তত তোমাকে ইন্টারোগেট করার জন্যে খানিকটা সময় দরকার হবে ওদের।’

এ এমন একটা বিষয়, তর্ক করা রানার সাজে না। ঝুঁকি নিতে পারে বলেই তো বিসিআই এজেন্ট ও। কিন্তু বসের কথা বলার ধরন ওকে খেপিয়ে তুলছে, খানিকটা অভিমানও জাগছে। জেদের সুরেই বলল, ‘ওরা যদি আমাকে জাফনায় ধরে নিয়ে যায়, ওখান থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসা অত্যন্ত কঠিন হবে, স্যার।’

‘তোমার আজ হয়েছে কি বলো তো?’ রাহাত খান বিরক্ত। ‘ভয় পাচ্ছ নাকি?’

না হাসার চেষ্টা করল রানা, শিরদাঁড়া আরও একটু খাড়া করে বলল, ‘জ্বী-না, ভয় পাচ্ছি না; তবে আমার মনে হয় স্বেচ্ছায় ধরা না দিয়েও শত্রুর পরিচয় জানার আরও উপায় থাকা উচিত।’

‘সে উপায় কাজে লাগাতে কেউ তোমাকে বারণ করছে না,’ গম্ভীর গলায় বললেন বস্। ‘সম্ভব হলে প্রগ্রেস রিপোর্ট পাঠাবে তুমি, অবস্থা বুঝে আমি যাতে নির্দেশ দিতে পারি। প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র যা লাগবে সব ইলোরার কাছে আছে, চেয়ে নাও।’

ধীরে ধীরে চেয়ার ছাড়ল রানা।

‘তোমার হাতে ওটা কি?’ অকস্মাৎ জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান, কাঁচাপাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল।

ভুলেই গিয়েছিল রানা, বস্ প্রশ্ন করায় মনে পড়ল ছুটির দরখাস্তটা এখনও ওর হাতে। উত্তর দিতে এক সেকেন্ড দেরি করে ফেলল ও, আর সেটাই বিপদ ডেকে আনল। ‘এটা...কিছু না,

স্যার...'

'কিছু না মানে? দেখি!' হাতটা লম্বা করে দিলেন রাহাত খান।

একটা ঢোক গিলল রানা। না, আপনার দেখে কাজ নেই, এ-কথা কি বসকে বলা যায়? যাই বলুক, বুড়োর বাড়ানো হাতকে তো আর অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। 'ভেবেছিলাম ছুটি চাইব, তাই দরখাস্ত...'

ইতিমধ্যে প্রিন্ট-আউটটা নিয়ে চোখ বুলাতে শুরু করেছেন রাহাত খান। 'কাকলি আর তুমি একসঙ্গে ছুটি চাও? তোমরা দু'জন আগ্রায় যাবে তাজমহল দেখতে?'

একেই বলে বিনা মেঘে বজ্রপাত। রানা অভিশাপ দিল, কাকলির যেন গোঁফ-দাড়ি গজায়! একইসঙ্গে প্রার্থনা করল, ধরণী দ্বিধা হও! 'জ্বী, না, মানে...'

'সই করোনি কেন?' কাগজটা ছিঁড়ে ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দিলেন রাহাত খান। 'তাছাড়া, তাজমহলে কি আছে?'

'না, মানে, কাকলি...'

'কাকলি বলল আর তুমিও রাজি হয়ে গেলে?' ধমক দিলেন বস্। 'তাজমহল তো দু'জনেরই দেখা আছে, কাজেই এমন কোথাও যাওয়া উচিত যেখানে কিছু শেখার আছে, জ্ঞান বাড়ে।'

'স্যার!' রানা উপলব্ধি করছে আকাশ থেকে পড়া কাকে বলে।

'আইডিয়াটা কিন্তু মন্দ নয়,' বললেন বস্। 'একসঙ্গে ছুটি কাটাতে গেলে সিকিউরিটি রিস্ক অনেকটাই কমে যায়, একজন আরেকজনকে কাভার দিতে পারবে। সঙ্গে কেউ থাকলে দায়িত্ব বাড়ে, বেচাল চলার প্রবণতা কমে যায়। ঠিক আছে, ব্যাপারটা আমি বিবেচনা করে দেখব। আর হ্যাঁ, ইলোরাকে পাঠিয়ে দাও।'

দরজার দিকে পা বাড়িয়ে রানা ভাবছে, ওর শুনতে ভুল

হয়েছে, নাকি বসের মতিভ্রম ঘটল?

চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করল, দেখল নার্ভাস চেহারা নিয়ে ইলোরার সঙ্গে নিচু গলায় কি যেন বলছে কাকলি। ওকে দেখেই প্রায় ছুটে সামনে চলে এল সে। ‘রানা, দরখাস্তটা কোথায়?’

‘কেন, বসের কাছে!’

‘সর্বনাশ!’ আতঙ্কে নীল হয়ে গেল কাকলি। ‘ওটা তো আমি ঠাট্টা করে তোমাকে দিয়েছিলাম…’

‘কিন্তু বস্ ব্যাপারটাকে অত্যন্ত সিরিয়াসলি নিয়েছেন,’ এক গাল হেসে বলল রানা। ‘বললেন, বিয়ে-টিয়ের দরকার নেই, যখন খুশি আমি তোমাকে নিয়ে হানিমুনে যেতে পারি।’

‘ইস্, ছি, তোমার মুখে কিছু আটকায় না। প্লীজ, রানা, বলো না কাগজটা কোথায়?’

‘ও, বিশ্বাস করছ না!’ ইলোরার দিকে তাকাল রানা। ‘বস্ তোমাকে ডাকছেন, ইলোরা। সম্ভবত এই ব্যাপারটা নিয়েই বিস্তারিত আলাপ করবেন।’ আবার তাকাল কাকলির দিকে। ‘বিশ্বাস করো, একটুও বাড়িয়ে বলছি না। দরখাস্তে যাই তুমি লিখে থাকো, পড়ে বস্ বললেন আইডিয়াটা তাঁর ভাল লেগেছে।’ দরজার দিকে পা বাড়াল ও। ‘তুমি তৈরি হয়ে থেকো, হাতের কাজটা শেষ করেই তোমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব…’

পয়েন্ট পেড্রোর দিক থেকে আরেকটা ট্রাক আসছে। মার্সিডিজের বনেট থেকে নেমে হাতঘড়ি দেখল রানা। আশ্চর্য, এক ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট হলো এখানে আটকা পড়ে আছে ও, অথচ একটা গাড়িকেও পয়েন্ট পেড্রোর দিকে যেতে দেখেনি। উল্টোদিকে তবু তো এটাকে নিয়ে দুটো ট্রাক যাচ্ছে। সন্ধিপুরার দিকে যেতে কাছাকাছি শহর এখান থেকে বিশ মাইল দূরে,

ড্রাইভার লোকটা যদি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে থাকে, এতক্ষণে একজন মেকানিকের পৌঁছে যাবার কথা। মদ খেয়ে ট্রাক চালাচ্ছিল, ওর কথা হয়তো ভুলেই গেছে ড্রাইভার।

পয়েন্ট পেড্রো এখান থেকে আরও প্রায় নব্বুই মাইল দূরে। ঘড়িতে দুপুর একটা, ফয়সলের সঙ্গে জেটিতে ওর দেখা করার কথা আড়াইটার সময়। ফাঁকা রাস্তা, দেড় ঘণ্টায় নব্বুই মাইল পেরুনো কঠিন নয়। তবে সামনে নিশ্চয়ই আরও কয়েকটা রোডব্লক পড়বে। তাছাড়া, মেকানিকই যেখানে আসেনি, এই গাড়ি নিয়ে কোথাও যাবার প্রশ্নই তো ওঠে না।

ট্রাকটা যদি খালি হয়, টাকার লোভ দেখিয়ে ড্রাইভারকে পয়েন্ট পেড্রোতে যাবার প্রস্তাব দেয়া যেতে পারে। হাত তুলতে যাবে রানা, এঞ্জিনের শব্দ শুনে পিছন দিকে তাকাল। দেখল, ঢাল বেয়ে উঠে আসছে একটা ফোক্সওয়াগেন ব্রেকডাউন ভ্যান, ছোট ও গোল আকৃতির উইঞ্চটা পিছন থেকে বেরিয়ে আছে।

মেকানিক অত্যন্ত চটপটে এক তরুণ, নিজের কাজও খুব ভাল বোঝে। সিংহলী ও তামিল ছাড়াও ইংরেজি জানে। সুটের কাটিং দেখে সে বুঝে নিল রানা বিদেশী ট্যুরিস্ট, তবে অস্বস্তিকর কোন প্রশ্ন করল না। গাড়িটা দ্রুত পরীক্ষা করে জানাল, গোলমালটা কারবিউরেটারে, এখুনি নতুন একটা লাগিয়ে দিচ্ছে। কাজ শেষ হতে রানা তার বিল মেটাল মার্কিন ডলারে। খুশি হলো তরুণ, উপযাচক হয়ে বলল, 'পয়েন্ট পেড্রোতে একটু সাবধানে থাকবেন, স্যার।'

'কেন বলো তো?'

'ওখানে সরকারী প্রশাসন আছে ঠিকই, কিন্তু সেনাবাহিনীর স্থায়ী কোন ক্যাম্প নেই। টাইগার গেরিলারা জাফনা থেকে অবাধে আসা-যাওয়া করে। ক্যাম্প নেই, কারণ টাইগাররা ঘোষণা করেছে পয়েন্ট পেড্রোতে তারা সরকারী সৈন্যদের দেখতে চায়

না। সেনাবাহিনী মাঝে মধ্যে শহরে ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে চোরা-গুপ্তা হামলা শুরু করে তারা। কাজেই আপনাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল রানা।

পরবর্তী চল্লিশ মাইল নির্বিঘ্নে পেরিয়ে এল ও। তারপর বিশ মাইলের ব্যবধানে দুটো রোডব্লকে থামতে হলো। প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র আছে সঙ্গে, জাফনা বাদে শ্রীলঙ্কার সব জায়গায় যেতে পারবে ও। নাম ঠিকই আছে, বদল হয়েছে শুধু পেশা। সিঙ্গাপুর ও হংকং থেকে একযোগে প্রকাশিত ডেইলি নিউ এশিয়ার ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি ও। নিউ এশিয়া শ্রীলঙ্কার গৃহযুদ্ধে কোন পক্ষ অবলম্বন না করে নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করে, তামিল গেরিলারা তাই এই পত্রিকাকে খারাপ চোখে দেখে না। তবে নীতিগত কারণে টাইগারদের হাইকমান্ড ওর জাফনা সফরের আবেদন নাকচ করে দিয়েছে। বছরে মাত্র দু'বার বিভিন্ন দেশের জার্নালিস্টকে একসঙ্গে জাফনায় ঢুকতে দেয়া হয়, বাকি সময় জার্নালিস্ট বা ট্যুরিস্টের জন্যে জাফনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এলাকা। বিনা অনুমতিতে কেউ ঢুকলে তাকে স্পাই হিসেবে গণ্য করা হবে, এমনকি দেখামাত্র গুলি করাও হতে পারে।

দুটো রোডব্লকে সাত মিনিট নষ্ট হলো। রানার সঙ্গে সুটকেস ও ব্রীফকেস আছে। সুটকেসে গোপন করার মত কিছু নেই। তবে ব্রীফকেসের ফলস বটমে লুকানো আছে ওর প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথার। ওই ফলস বটমের সন্ধান পেতে হলে ব্রীফকেসটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে হবে। খুদে বালিশ আকৃতির কয়েকটা ব্যাগের মাঝখানে শুইয়ে রাখা হয়েছে পিস্তলটাকে, ব্যাগগুলোর ভেতর বিসিআই বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত বিশেষ ধরনের একটা কেমিক্যাল কমপাউন্ড থাকায় মেটাল ডিটেকটরেও ওটা ধরা পড়বে না। এরপর রানা ঘণ্টায় আশি মাইল স্পীডে গাড়ি চালিয়ে

ঠিক আড়াইটায় পৌঁছাল বন্দর নগরী পয়েন্ট পেড্রোর উপকণ্ঠে; নির্দিষ্ট জেটি থেকে এখনও দশ মাইল দূরে ও। এখানে আরেকটা রোডব্লক, তবে সরকারী সৈন্যরা কাগজ-পত্রে একবার চোখ বুলিয়েই ছেড়ে দিল ওকে।

শহরে ঢোকার পর ট্র্যাফিক জ্যামে পড়ল রানা। তারপর নির্জন পাহাড়ী পথে উঠতে হলো আবার, কারণ ওর গন্তব্য বন্দর ছাড়িয়ে আরও তিন মাইল পশ্চিমে। এদিকে তিনটে বাজতে আর পাঁচ মিনিট বাকি। এই পাঁচ মিনিটে জেটিতে পৌঁছাতে পারলেও আধ ঘণ্টা দেরি হয়ে যাবে ওর।

ঢাল বেয়ে পাহাড় থেকে নামার সময় গাছপালার ভেতর দিয়ে জেটিটা দেখতে পেল রানা। সামনে ভারত মহাসাগরের সীমাহীন বিস্তার। জেটি থেকে মাইল খানেক দূরে একটা যাত্রীবাহী জাহাজ ভাসছে। প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা একটা বোট দেখল রানা, সম্ভবত জাহাজটার গা থেকেই রওনা হয়েছে, ছুটে আসছে জেটির দিকে। বোটটার খোল সবুজ, তবে মাঝখানে কেবিন সেকশনটা সাদা পেইন্ট করা। হুইলহাউসে দু'জন লোককে দেখা যাচ্ছে, তবে কারও গায়ে সবুজ জ্যাকেট না থাকায় বোটে ফয়সল আছে কিনা বুঝতে পারছে না রানা। তবে বোটটা যে জার্নালিস্টের দলটাকে জাহাজে তুলে দিয়ে ফিরে আসছে, এটা ধরে নেয়া চলে। সেক্ষেত্রে ওই বোটেই থাকার কথা ফয়সলের। কোন কারণে হয়তো কেবিন থেকে এখুনি বেরুতে চাইছে না সে। জেটি থেকে এখনও বোটটা সাত-আটশো গজ দূরে হলেও, পাহাড়ের ঢালে মার্সিডিজটা তার দেখতে পাবার কথা–অবশ্য যদি তাকিয়ে থাকে।

জেটির দিকে তাকাল রানা। শেষ মাথায় ভিড় করে আছে ছোট আকৃতির অনেকগুলো জেলে নৌকা, প্রতিটিতে আউটবোর্ড মোটর লাগানো। বেতের তৈরি ঝাঁকায় মাছ তুলছে জেলেরা,

একদল কিশোর সেগুলো মাথায় নিয়ে ছুটছে। জেলে নৌকার ভিড়ে দু'চারটে অন্যান্য বোটও রয়েছে, আরোহীদের হাতে ফিশিং রড। এরকম অন্তত দুটো বোটে স্কার্ট ও ব্লাউজ পরা মেয়ে রয়েছে, হুইলে হাত, অ্যাংলারদের মাছ ধরতে নিয়ে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত হলেও, শ্রীলঙ্কার শিক্ষার হার শতকরা নব্বুই শতাংশেরও বেশি, এবং মেয়েরা পুরুষদের মত যে-কোন পেশা বেছে নেয়ার স্বাধীনতা ভোগ করে। মধ্যবিত্ত ঘরের প্রায় সব মেয়েই সাইকেল চালিয়ে স্কুল-কলেজে যায়।

মার্সিডিজ ঢাল থেকে নামার আগেই জেটির কাছাকাছি পৌঁছে গেল সবুজ-সাদা বোট। ফয়সলকে দেখতে পাবার আশায় তাকিয়ে আছে রানা, তাই ওর চোখের সামনেই ঘটনাটা ঘটল। দৃশ্যটা স্লো-মোশনে মুভি-র মত; অপ্রত্যাশিত বলেই অবাস্তব লাগল। তবে যতই অবাস্তব মনে হোক, নিরীহ একদল মানুষকে খুন হতে দেখে ঘৃণায় রি-রি করে উঠল রানার শরীর। আর ফয়সলের সম্ভাব্য পরিণতির কথা ভেবে চোখ দুটো কঠোর হয়ে উঠল।

পর পর দুটো শব্দ শুনল রানা। প্রথমে একটা বোমা ফাটল, তারপর বিস্ফোরিত হলো বয়লার। দ্বিতীয় বিস্ফোরণটা এতই শক্তিশালী, মার্সিডিজকে কাঁপিয়ে দিল। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে রানা দেখল, বোটের কেবিন সেকশন সহস্র টুকরো হয়ে বাতাসে উড়ছে। গোটা বোট বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। ধোঁয়া, আগুন ও আবর্জনার মধ্যে মানুষের দেহও চেনা গেল—পাক খাচ্ছে; হাত, পা বা মাথার অংশবিশেষ নেই।

হার্ড ব্রেক করল রানা; প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে জেটির মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল মার্সিডিজ। সাগরের পানি ও জেটির মাথায় এখনও বৃষ্টির মত আবর্জনা নেমে আসছে। ব্রীফকেসের ফলস বটম থেকে পিস্তলটা বের করল ও, গাড়ি থেকে নেমে ছোটার সময় গায়ের

জ্যাকেট ও শার্ট খুলে ফেলল।

জেটির এত কাছে বিস্ফোরণটা ঘটেছে, প্রায় সবগুলো নৌকাই উল্টে গেছে, আরোহীরা কমবেশি সবাই আহত হয়েছে। কয়েকটা নৌকায় আগুন জ্বলতেও দেখল রানা। কান্না, চিৎকার, ছুটোছুটি–সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। যারা আহত হয়নি, আরও বিস্ফোরণের আশঙ্কায় ছুটে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে জেটির কাছাকাছি আহত লোকজনের উপকারে লাগার কথা রানা ভাবছে না, ওকে আগে দেখতে হবে ফয়সলকে সাহায্য করা যায় কি না। ব্যাপারটা স্যাবটাজ, বিস্ফোরণের উদ্দেশ্য ছিল ফয়সলকে খুন করা–এভাবে চিন্তা করলে এটাও রানার ধরে নেয়া উচিত যে শত্রুপক্ষ জানে এখানে কেউ একজন ফয়সলের সঙ্গে দেখা করতে আসবে, এবং চিনতে পারলে তাকেও খতম করার সুযোগ তারা ছাড়বে না। তবে পরিস্থিতিটা রানা একটু অন্যভাবে দেখছে। ও প্রায় নিশ্চিত যে বোমাটা রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে ফাটানো হয়নি, কারণ সেক্ষেত্রে ও বোটে না ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হত। শত্রুপক্ষের কোন লোক জেটির কাছে উপস্থিত আছে বলেও মনে হয় না, থাকলে জেটির এত কাছে বোমাটা ফাটানো হত না। আর লোকজন যা আছে সব জেটির কাছেই, আশপাশে আর কেউ নেই। সেজন্যেই রানা ভাবছে, ঝুঁকি নিয়ে হলেও ওর বরং একটু তৎপর হওয়াই উচিত। কন্ট্যাক্ট-এর অস্তিত্ব যদি লোপ পেয়েই থাকে, অ্যাসাইনমেন্টের স্বার্থে কিছু ক্লু না পেলে ওর চলবে না, আর তা পাবার একমাত্র উপায় প্রতিপক্ষের সামনে নিজেকে জাহির করা। জলে বা ডাঙায় তাদের কেউ যদি থাকে, তাকে ওর চিনে নিতে হবে।

হাতের শার্ট ও জ্যাকেট জেটির কিনারায় রাখল রানা, ওগুলোর নিচে চাপা দিয়েছে ওয়ালথারটা। ট্রাউজার খুলে ডাইভ

দিল সাগরে।

ফয়সলের বোটটা ইতিমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। পানির ওপর ভেসে আছে শুধু বো আর স্টার্ন, পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়ছে। সাগর শান্ত, অকুস্থলে কাঠের টুকরো আর জঞ্জাল ভাসছে।

বোটটার হুইলহাউসে দু'জন লোককে দেখেছিল রানা, আর হয়তো কেবিনে ছিল ফয়সল। এরকম বিস্ফোরণে কারও বেঁচে থাকার কথা নয়, তবে বলাও যায় না। বেঁচে থাকুক বা না থাকুক, রানাকে নিশ্চিত হতে হবে বোটে ফয়সল ছিল। পাহাড়ী রাস্তার দু'পাশে কয়েকটা বাড়ি দেখেছে ও, টেলিফোনের তারও দেখেছে, থানায় ও হাসপাতালে নিশ্চয়ই এতক্ষণে খবর পৌঁছে গেছে। ছোট একটা টাগ বোট দেখল রানা, দিক বদলে ছুটে আসছে এদিকে।

ভাঙা খোল ও রেইল পাশ কাটিয়ে গেল ওকে। উপুড় হয়ে একটা লাশ ভাসছে, গায়ের রঙ কুচকুচে কালো, সম্পূর্ণ উলঙ্গ। মুখটা দেখতে গিয়ে অসুস্থবোধ করল রানা, অর্ধেকটাই উড়ে গেছে। লোকটা ফয়সল নয়, কারণ তার গোঁফ নেই।

পিছনে একটা শব্দ হতে ঘাড় ফেরাল রানা। প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না, তারপর চোখে পড়ল ভাঙা রেইল ও কয়েক টুকরো খোলের মাঝখানে রঙিন কি যেন নড়ছে। ঘুরে জেটির দিকে ফিরে আসছে ও, এই সময় পানি থেকে মাথা তুলে হাঁপাতে দেখল মেয়েটাকে। দ্রুত সাঁতার কেটে তার পাশে চলে এল।

দু'হাত লম্বা মোটা একটা কাঠ ধরে ভেসে আছে মেয়েটা, তার শরীরের ভারে পানির নিচে ডুবে আছে সেটা। পঁচিশ থেকে ত্রিশের মত বয়স হবে, রোগাই বলা যায়, পরে আছে জিনস আর নীল শার্ট। মুখটা দেখেই মনে হলো চেনে ও। কিন্তু কোথায় দেখেছে মনে করতে পারল না। মেয়েটার শরীরের নিচে নিজের কাঁধ রাখল রানা, ভেসে থাকতে সাহায্য করছে। প্রশ্ন করে লাভ নেই, কারণ চোখে ঘোর লাগা দৃষ্টিই বলে দিচ্ছে যে-কোন মুহূর্তে

জ্ঞান হারাবে। ঠিক সময় মতই দেখেছে রানা, আরেকটু দেরি হলে নির্ঘাত ডুবে যেত।

মেয়েটাকে দ্রুত পরীক্ষা করল রানা। হাত-পা ঠিক আছে। শরীরের কোথাও থেকে রক্তপাত হচ্ছে না। কোন হাড়ও ভাঙেনি। সম্ভবত প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে এই অবস্থা হয়েছে। বোটের আরোহী ছিল কিনা বলা মুশকিল।

এতক্ষণ কোন রকমে ভেসে ছিল, সাহায্য পৌঁছাতে দেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে মেয়েটা। ইতিমধ্যে আশপাশ থেকে অনেকগুলো মাছ ধরার নৌকা ছুটে এসেছে, জেটির সামনে উদ্ধার কাজ শুরু করেছে জেলেরা। তাদেরই একটা নৌকায় মেয়েটাকে নিয়ে উঠল রানা। এই সময় জ্ঞান ফিরে পেয়ে ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে তাকাল সে, তারপর ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলল। এই কান্না দেখেই তাকে চিনে ফেলল রানা।

রানার হাত ধরে জেটিতে উঠল মেয়েটা। ঘাড় ফিরিয়ে দু'তিনবার পিছন দিকে তাকাল সে, প্রতিবার শিউরে উঠল। পিস্তলসহ কাপড়গুলো তুলে নিল রানা। জেটি ধরে হাঁটার সময় মেয়েটাকে এক হাতে জড়িয়ে রাখল ও, সে-ও ওর কাঁধে মাথা ঠেকিয়ে রেখেছে। ভেজা কাপড়ে শরীরের রেখাগুলো এত বেশি স্পষ্ট, তাকাতে অস্বস্তিবোধ করছে রানা। জেটি থেকে নেমে এসে রানার কাঁধ থেকে মাথা তুলল সে। চোখে চোখ রাখল, সারা মুখে দৃষ্টি বুলাল, তারপর ধরা গলায় বলল, 'আ-আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। ধন্যবাদ, অসংখ্য...'

'আমি না হলে জেলেরা, কেউ না কেউ বাঁচাতই,' বলল রানা, জেটির দিকে তাকিয়ে কাপড় পরছে। জেলেরা ধরাধরি করে দুটো লাশ তুলছে। ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে টাগবোটটা, ক্রুরা তিনজনকে পানি থেকে তুলল, একজন সম্ভবত বেঁচে নেই।

'আপনি কি বোটে ছিলেন?' জানতে চাইল মেয়েটা।

'না। গাড়ি নিয়ে পাহাড় থেকে নামছিলাম, এই সময় বিস্ফোরণটা ঘটল,' বলল রানা। 'ওই বোটে আমার এক বন্ধু ছিল, তার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি।' ইঙ্গিতে গাড়িটা দেখাল। 'আপনি এটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ান, আমি দেখি পানি থেকে কাদেরকে তোলা হলো।' তারপর, এক সেকেন্ড ইতস্তত করে জানতে চাইল, 'আপনি থাকেন কোথায়, মল্লিকা?'

মেয়েটা শুধু যে বিস্মিত হলো, তা নয়, একটু যেন চমকেও উঠল। 'আপনি আমাকে চেনেন?'

'এটা একটা প্রশ্ন হলো?' হাসল রানা। 'বিখ্যাত অ্যাথলেট মল্লিকা রত্নপ্রভাকে কে না চেনে! গত বছর সার্ক স্পোর্টস-এ নতুন রেকর্ড করেছেন একশো মিটার দৌড়ে প্রথম হয়ে। টিভিতে আপনাকে আনন্দে কাঁদতে দেখেছি আমি।'

'ওহ্, গড!' মল্লিকা এখনও আড়ষ্ট। 'আপনি ছিলেন ওখানে!'

হাতটা বাড়িয়ে দিল রানা। 'মাসুদ রানা। জার্নালিস্ট, সিঙ্গাপুরে থাকি,' বলল ও, হাতটা একবার ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিল। 'মানকুলাম থেকে টেলিফোনে একজন গাইডের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম, তার সঙ্গে দেখা করতেই পয়েন্ট পেড্রোতে আসা। ওই বোটে তার থাকার কথা ছিল। ভাল কথা, আপনার সঙ্গে আর কেউ ছিল না?'

'না।' দ্রুত মাথা নাড়ল মল্লিকা। 'ছোট একটা বোট নিয়ে একাই বেরিয়েছিলাম। সময় কাটছিল না, ভাবলাম দেখি তো দু'একটা মাছ পাই কি না।'

সাইরেন বাজিয়ে একটা অ্যামবুলেন্স এসে দাঁড়াল, পিছু নিয়ে এল পুলিসের একটা জীপ। 'ঠিক আছে, এখানে অপেক্ষা করুন আপনি। আমি দেখি গাইড ভদ্রলোককে পাওয়া গেল কিনা।'

'এক মিনিট,' বলল মল্লিকা। 'এখানকার পরিস্থিতি কিন্তু খুব গোলমেলে। পুলিসের কোন সাহায্য চাওয়া আপনার উচিত হবে

না। এমনকি বোটে আপনার পরিচিত কেউ ছিল, এটাও ওদেরকে বলবেন না।'

'কেন?'

'কারণ পুলিস আপনাকে মিছিমিছি গেরিলাদের সাহায্যকারী বলে সন্দেহ করবে,' বলল মল্লিকা। 'শুধু তাই নয়, আপনার প্রতিটি আচরণ টাইগাররাও লক্ষ করছে। পুলিস যদি আপনাকে গ্রেফতার না-ও করে, ওরা আপনাকে সরকারের এজেন্ট হিসেবে সন্দেহ করবে। আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন, তাই এত কথা বলছি–সবচেয়ে ভাল হয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পয়েন্ট পেড্রো ছেড়ে আপনি যদি চলে যান।'

'সাবধান করার জন্যে ধন্যবাদ, মল্লিকা,' বলল রানা। 'তবে কি জানেন, আমার পেশাই খবরের পিছনে ছোটা। বোটটা যে বোমা মেরে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে, এ তো নিজের চোখেই দেখলাম। অন্তত পুলিস এই স্যাবটাজ সম্পর্কে কি বলে তা তো না শুনে পারি না। তবে বেশি সময় নেব না, যাব আর আসব...'

'সে আপনার ইচ্ছা,' ম্লান মুখে বলল মল্লিকা। 'তবে দয়া করে এই ঝামেলার মধ্যে আমাকে জড়াবেন না। কুমিরের হাত থেকে বাঁচিয়ে এখন যদি আমাকে বাঘের হাতে তুলে দেন, এর চেয়ে নিষ্ঠুরতা আর কিছু হতে পারে না।'

'ঠিক আছে, আপনার কথা কাউকে বলব না।' জেটি ধরে দ্রুত এগোল রানা। দূর থেকেই দেখতে পেল অ্যামবুলেন্স কর্মীরা আহত লোকজনকে স্ট্রেচারে তুলছে।

দুই

অফিস থেকে পাওয়া চেহারা ও পোশাকের বর্ণনা হুবহু মিলে যাওয়ায় লাশ দেখে ফয়সলকে চিনতে পারল রানা। তবে শনাক্ত করার প্রশ্ন ওঠে না এই জন্যে যে প্রথমত ফয়সলকে আগে কখনও দেখেনি ও, দ্বিতীয়ত তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল শুনলে পুলিস ঝামেলা পাকাবার সুযোগ পাবে। পুলিস কোন প্রশ্ন করল না, ও-ও যেচে পড়ে কিছু বলতে গেল না। মল্লিকাকে উদ্ধার করতে ওকে অনেকেই দেখেছে, তবে প্রসঙ্গটা কেউ না তোলায় স্বস্তি বোধ করল রানা। সব মিলিয়ে সাতটা লাশ পাওয়া গেছে, জেলেরা বলছে খুঁজলে আরও পাওয়া যাবে। মোবাইল ফোনে খবর পাঠানো হয়েছে, পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে ডুবুরী আসবে। পুলিসের বড় কর্তারা এখনও এসে পৌঁছাননি, তবে পথেই আছেন তাঁরা। রানা বুঝতে পারল, এখানে ঘুর-ঘুর করাটা ঠিক হবে না।

আহত লোকজনকে নিয়ে অ্যামবুলেন্স চলে গেছে, রাস্তায় শুধু পুলিসের জীপ আর রানার মার্সিডিজ। চারদিকে তাকিয়ে মল্লিকাকে কোথাও দেখতে পেল না ও। প্রথমে ভাবল, আশপাশেই কোথাও গেছে, এখুনি এসে পড়বে। কিন্তু দশ মিনিট অপেক্ষা করার পরও ফিরল না সে। রানার মনে পড়ল, কোথায়

থাকে জিজ্ঞেস করায় মল্লিকা জবাব দেয়নি। তবে সেটা ইচ্ছাকৃত কিনা বলা মুশকিল। মেয়েটা নিশ্চয়ই বোকা নয়, কাজেই সে বুঝবে যে তার মত নামকরা একটা মেয়েকে খুঁজে বের করা মোটেও কঠিন কোন কাজ নয়।

প্রশ্ন হলো, রানা তাকে খুঁজবে কি না। কোন কিছু আশা করে তাকে রানা সাহায্য করেনি। তার এভাবে না বলে চলে যাওয়াটা অস্বাভাবিক হলেও, অন্যায় কিছু নয়। তবে বিস্ফোরণটা যেহেতু স্যাবটাজ–তাতে বিসিআই-এর একজন উপকারী বন্ধু মারাও গেছে–এবং মেয়েটা ঘটনার খুব কাছাকাছি থাকায় কিছু প্রশ্নের উত্তর রানা তার কাছে চাইতেই পারে। ধরলে অনেক কিছুই ধরা যায়। একা একটা মেয়ে ভর দুপুরবেলা বোট নিয়ে মাছ ধরতে যাচ্ছিল কেন? পুলিসকেই বা তার এত ভয় কিসের? আর এভাবে চলে যাওয়াটা?

ঝাঁকা মাথায় আবার মাছ নিয়ে ছুটোছুটি শুরু করেছে কিশোর ছেলেগুলো। তাদের একজনকে ডেকে মল্লিকার কথা জিজ্ঞেস করল রানা। ও যে তাকে সাগর থেকে তুলেছে, এটা সে দেখেছে, কিন্তু কোথায় থাকে বা কোনদিকে গেছে তা জানে না। একে একে আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করল রানা, কিন্তু সবাই মল্লিকা সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করল। এমনকি বয়স্ক জেলেরাও মল্লিকাকে চেনে না। সে দৌড় প্রতিযোগিতায় সোনা জিতেছে শুনে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল তারা।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল, মল্লিকা আশপাশে কোথাও থাকে না। এই এলাকার মেয়ে হলে জেলেরা অবশ্যই তাকে চিনত। খুঁতখুঁতে ভাবটা আরও বেড়ে গেল রানার। এখন মনে হচ্ছে ইচ্ছা করেই মল্লিকা জানায়নি কোথায় থাকে সে।

কি করা যায় ভাবছে রানা, ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিস ইন্সপেক্টরকে এগিয়ে আসতে দেখে সতর্ক হয়ে উঠল।

‘এক্সকিউজ মি,’ বলে অমায়িক হাসল সে। ‘শুনলাম আপনি একটা মেয়েকে উদ্ধার করেছেন। ধন্যবাদ, স্যার।’ ইন্সপেক্টর করমর্দনের জন্যে হাতও বাড়াল না, নিজের নামও বলল না। ‘তবে এ-কথা কি সত্যি যে তিনি মল্লিকা রত্নপ্রভা?’

মল্লিকার নিষেধ সত্ত্বেও প্রশ্নের জবাবে রানাকে বলতে হলো, ‘হ্যাঁ, সত্যি।’

ইন্সপেক্টরের চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ‘সেক্ষেত্রে অকুণ্ঠচিত্তে বলতে হয়, প্রতিটি শ্রীলঙ্কান আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। মল্লিকা রত্নপ্রভা এই জাতির বিরাট এক গর্ব, আপনি আমাদের সেই গর্বকে অকালে হারিয়ে যেতে দেননি—সত্যি, কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাব...’

‘কিন্তু বলতে পারেন,’ বাধা দিল রানা, ‘এখানে কেউ তাকে চেনে না কেন?’

‘কি করে চিনবে বলুন, মল্লিকা তো এখানে থাকেন না,’ বলল ইন্সপেক্টর। ‘তাছাড়া, অশিক্ষিত জেলেরা কি এত খবর রাখে...’

‘কিন্তু মল্লিকা আমাকে বলেছেন, একটা বোট নিয়ে মাছ ধরতে যাচ্ছিলেন। এখানে যদি না-ই থাকেন...’

ইন্সপেক্টর বলল, ‘এখানে মল্লিকার কাকা রত্নগিরি জয়শঙ্খ থাকেন। থাকেন মানে, এই এলাকায় ভদ্রলোকের বিশাল এক দুর্গ আছে। উনি শিল্পপতি, দুর্গটা শখ করে নিলামে কিনেছেন। বেশিরভাগ সময় বিদেশেই কাটান ভদ্রলোক। তবে কাকা ফিরেছেন শুনে মল্লিকা হয়তো তাঁর কাছে বেড়াতে এসেছেন।’

ইন্সপেক্টরের আচরণ রহস্যময় লাগছে রানার। ওর পরিচয় বা এখানে উপস্থিতির কারণ সম্পর্কে কোন প্রশ্নই করছে না সে। বলল, ‘আমার ধারণা, আপনারা ঝামেলা করতে পারেন এই ভয়েই মল্লিকা তাড়াহুড়ো করে চলে গেছেন।’

‘আরে না, অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট, তা নিয়ে আমরা

ঝামেলা করতে যাব কেন!' হেসে উঠল ইন্সপেক্টর। 'তাছাড়া, মল্লিকা রত্নপ্রভা দেশের গর্ব...'

'আপনার তাহলে বিশ্বাস, ব্যাপারটা দুর্ঘটনাই ছিল?'

'হ্যাঁ, আমার ধারণা তদন্তে সেটাই প্রমাণিত হবে,' বলল ইন্সপেক্টর। 'প্রায় খালি একটা বোট কে স্যাবটাজ করবে, বলুন! এরইমধ্যে জানা গেছে, বোটে উল্লেখযোগ্য আরোহী বলতে জাফনার একজন গাইড ছাড়া আর কেউ ছিল না। কাজেই এটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে বাধ্য।'

হাস্যকর যুক্তি, গ্রহণ করার প্রশ্ন ওঠে না। তবে তর্ক এড়াবার জন্যে রানা চুপ করে থাকল।

'আপনি তো মাসুদ রানা, তাই না?' জিজ্ঞেস করল ইন্সপেক্টর। 'জার্নালিস্ট, সিঙ্গাপুর থেকে আসছেন।'

'আপনি জানলেন কিভাবে?'

ইন্সপেক্টর হাসল, 'সরকারী রোডব্লক কে কোথায় পার হচ্ছে, সব খবর সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাই আমরা, মি. রানা। এখানে একটা যুদ্ধ চলছে, স্যার।'

'দেখা হলে তাহলে মল্লিকাকে বলব যে পুলিস তাঁকে নিয়ে কোন ঝামেলা করবে না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' হাসল ইন্সপেক্টর। 'এখানে আমার কাজ আছে, তা না হলে আমি নিজেই আপনাকে পৌঁছে দিতাম। তবে বলে দিলে আপনি দুর্গটা চিনে নিতে পারবেন। এই তো কাছেই, ডান দিকের ওই পাহাড় টপকে মাইল খানেক এগোবার পর পশ্চিমে যাবেন। কিছুদূর গেলেই ডান দিকে পড়বে প্রাইভেট রোডটা। চারপাশে ঘন জঙ্গল, আর কোন বাড়ি-ঘর নেই। রাস্তাটা ঢাল বেয়ে উঠে গেছে দুর্গের গেট পর্যন্ত। পাহাড়ের মাথায় ওটা, পিছন দিকে সাগর।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার...' হাত বাড়াল রানা।

‘পেরেরা, ইন্সপেক্টর সিঙ্গি পেরেরা। ইউ আর ওয়েলকাম, মি. রানা।’ হাতটা একবার ধরেই ছেড়ে দিল সে, ঘুরে জীপের দিকে এগোল।

তার পিঠে চোখ রেখে রানা ভাবল, ইন্সপেক্টর পেরেরা চাইছে দুর্গে মল্লিকার কাছে যাক ও। কেন, তার কি স্বার্থ?

গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল রানা, জীপের দিকে চোখ পড়তে দেখল মোবাইল ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলছে ইন্সপেক্টর পেরেরা।

*

পাহাড়টা টপকে এল মার্সিডিজ। মাইলখানেক এগোতে হলো না, তার আগেই ব্লেইযার পরা মল্লিকা রত্নপ্রভাকে দেখতে পেল রানা, দু’চাকার সাইকেল নিয়ে তীরবেগে ছুটে আসছে।

গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল রানা। ওর পাশেই থামল মল্লিকা, আড়ষ্ট হেসে বলল, ‘না বলে চলে আসায় সত্যি দুঃখিত। আসলে ভিজে কাপড়ে খুব অস্বস্তি লাগছিল তো, তাই ভাবলাম…’ হঠাৎ বিস্মিত হয়ে প্রসঙ্গ বদলাল, ‘আপনি কি আমার খোঁজেই এদিকে এসেছেন? কিন্তু এখানে তো আমাকে কেউ চেনে না, আপনি জানলেন কিভাবে কোথায় থাকি আমি?’

‘এক পুলিস ইন্সপেক্টর সাহায্য করল,’ বলল রানা। ‘যাক, আবার দেখা হয়েছে, এতেই আমি খুশি। আমার দু’একটা প্রশ্ন আছে…’

‘এখানে দাঁড়িয়ে? বুঝেছি, আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন! নিশ্চয়ই অকৃতজ্ঞ ভাবছেন আমাকে। না-না, অস্বীকার করবেন না।’ সাইকেল থেকে নেমে পড়ল মল্লিকা। ‘আমি যে অকৃতজ্ঞ নই, এবং নিজের আচরণের জন্যে লজ্জিত, সেটাই এখন আমি প্রমাণ করব। পয়েন্ট পেড্রোতে যে ক’দিন আছেন, আপনাকে আমার আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে…’

‘যে-ক’দিন আছি মানে? আজই আমি চলে যাব।’

‘বললেই হলো চলে যাব? আপনাকে আমি যেতে দিলে তো!’ ইঙ্গিতে সাইকেলটা দেখাল মল্লিকা। ‘বনেটটা খুলুন, এটাকে আপনার গাড়ির পিছনে তুলি।’

‘না, মল্লিকা...’

‘প্লীজ, মি. রানা! নষ্ট ইমেজটা পুনরুদ্ধারের একটা সুযোগ অন্তত দিন আমাকে। আপনি আমাকে নতুন জীবন দান করেছেন—আপনার অসম্মান করলে অধর্ম হবে যে।’

হেসে ফেলল রানা, তবে মনে মনে ভাবল, পরিবর্তনটা চোখে বড় লাগছে; তাহলে বরং দেখাই দরকার কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়। বলল, ‘ইন্সপেক্টর বলল, আপনি নিজেই এখানে অতিথি, কাকার কাছে বেড়াতে এসেছেন, সেক্ষেত্রে আমার কি আপনার অতিথি হওয়া চলে?’

‘আমিই কাকার একমাত্র উত্তরাধিকারী, এই দুর্গসহ তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আর ব্যবসা একদিন আমার হবে,’ বলল মল্লিকা। ‘কাকা যদি শোনেন আমি এখানে কাউকে এন্টারটেইন করছি, তিনি খুশি হবেন। আই ইনসিস্ট, মি. রানা।’

পাহাড়ী পথ কাঁচা হলেও, খানিক দূর পশ্চিমে যাবার পর ডান দিকে পাকা রাস্তা পাওয়া গেল। ঘন জঙ্গলের ভেতর প্রাইভেট রোড এটা, বেশ কয়েকটা বাঁক নিয়ে ক্রমশ ওপরে উঠে গেছে। এক সময় দুর্গটা দেখা গেল। প্রাচীন ও ধূসর প্রকাণ্ড একটা পাথুরে কেল্লা, দূর থেকে দেখে রানার গা কেন যেন ছমছম করে উঠল। দুর্গটাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে গভীর ও চওড়া পরিখা। ফটকের সামনে পৌঁছাতে হলে একটা ড্রব্রিজ পেরুতে হবে। রানা ভাবল, পথ নির্দেশ দেয়ার সময় এটার কথা তো ইন্সপেক্টর বলেনি!

গাড়ির স্পীড কমে আসছে দেখে মল্লিকা বলল, ‘পুরানো হলেও, এখনও একটা ট্যাংকের ভার সহ্য করতে পারবে ব্রিজটা, সোজা উঠে পড়ুন।’

ড্রব্রিজ পেরিয়ে এসে বিশাল কাঠের ফটকের সামনে মার্সিডিজ থামাল রানা। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল মল্লিকা, দুর্গটাকে ঘিরে থাকা উঁচু পাঁচিল ধরে হন-হন করে হাঁটছে। একটা বাঁকের কাছাকাছি থামল, বড় একটা বোল্ডারের তলায় হাত ঢুকিয়ে কি যেন বের করল। ফিরে এল সে, হাতে চাবির একটা গোছা–চাবিগুলো আধ হাত করে লম্বা। তালা খুলে ফটকের পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢোকার পথটা উন্মুক্ত করল। আবার ইন্সপেক্টর সিঙ্গি পেরেরার কথা মনে পড়ল রানার। পথ নির্দেশ দেয়ার সময় কিভাবে ফটক খুলতে হবে বলেনি সে। জীপে বসে মোবাইল ফোনে কথা বলছে, দৃশ্যটা আরেকবার স্মরণ করল ও।

গাড়িতে ফিরে এসে মল্লিকা বলল, 'নিন, ঢুকে পড়ুন।'

পাথুরে প্রাঙ্গণটা বিশাল ও নির্জন, চারপাশে শুধু দেব-দেবীদের মর্মর মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে, মাঝখানে সুদৃশ্য একটা ফোয়ারা। 'আপনার কাকার দুর্গে টেলিফোন আছে তো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

হেসে উঠল মল্লিকা। 'ক'টা চাই আপনার?'

'না, মানে, গাইড ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলো না তো, তাই ভাবছি কোন ট্র্যাভেল এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

'ঠিক আছে, করবেন। তবে, আমিও তো আছি, কি দরকার না দরকার বললে সাহায্য করতে পারব আপনাকে।'

সাদা মার্বেল পাথরের ধাপগুলোর নিচে গাড়ি থামাল রানা। ধাপের ওপর বড়-বড় কাঠের দরজা, সবগুলো বন্ধ; আশপাশে কোন লোকজনের ছায়া পর্যন্ত নেই। ফাঁকা দুর্গ খাঁ-খাঁ করছে, কেমন ভৌতিক একটা নিস্তব্ধতা। গাড়ি থেকে নেমে মল্লিকার সঙ্গে ধাপ টপকাচ্ছে রানা; এক হাতে ব্রীফকেস, অপর হাতে সুটকেস। 'চাকরবাকররা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ও।

'আসলে আমি কোন খবর না নিয়েই চলে এসেছি,' বলল

মল্লিকা। 'এখানে এসে শুনলাম বিদেশ থেকে ফিরতে আরও কিছু দিন দেরি হবে কাকার। বিদেশে গেলে প্রতিবারই ওদেরকে ছুটি দিয়ে যান উনি। এখন শুধু একজন মালী আছে, সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমায়। একজন কেয়ারটেকার বা দারোয়ানও আছে, তবে না থাকারই মত।'

'কেন?'

'লোকটার কাজই হলো ওয়াইন সেলার-এ গিয়ে চুরি করে মদ খাওয়া। আমি এসে পড়ায় নিশ্চয়ই তার খুব অসুবিধে হচ্ছে। পালিয়ে পালিয়ে থাকে, ডাকলেও সাড়া পাওয়া যায় না। রান্নাবান্না করার জন্যে গ্রাম থেকে কাকার দুই চাকরানীকে ডেকে এনেছিলাম, কিন্তু তাদের রান্না পছন্দ না হওয়ায় বিদায় করে দিয়েছি।' ব্লেইযারের পকেট থেকে আরেক গোছা চাবি বের করে একটা দরজা খুলল সে। 'আসুন, গেস্টরূমটা দেখিয়ে দিই আপনাকে।'

'ওয়াইন সেলার?' রানা বিস্মিত। 'এরকম একটা প্রাচীন দুর্গে? তাছাড়া, শ্রীলঙ্কায় প্রচুর পরিমাণে মদ তৈরি হয়, এরকম তো কখনও শুনিনি।'

হাসল মল্লিকা। 'হয়, প্রচুর পরিমাণেই তৈরি হয়। মদ খায় না এমন লোক খুব কমই পাবেন আপনি শ্রীলঙ্কায়। তবে এ-দেশে শুধু চিনিকলের উপজাত থেকে মদ তৈরি করা হয়। কাকার কথা অবশ্য আলাদা, উনি ফ্রান্স আর স্কটল্যান্ড থেকে জাহাজ ভর্তি করে ওয়াইনের পিপে আমদানি করেন।'

মেইন হলরূমের ভেতর দিয়ে পথ দেখাল মল্লিকা। লম্বা একজোড়া ওক টেবিল দেখল রানা, সিলিং থেকে ঝুলছে ক্রিস্টাল ঝাড়বাতি। প্রতিটি দেয়াল পুরনো ও দামী অয়েল পেইন্টিং-এ সাজানো। দোতলার গেস্টরূমটা বেশ বড়। চাঁদোয়া লাগানো কিং সাইজ বেড। মখমলের পর্দা দিয়ে দেয়ালগুলো ঢাকা। গদি

লাগানো দুটো চেয়ার। বাতাস ভারী হয়ে আছে মিষ্টি একটা সেন্টের গন্ধে। হাত তুলে একটা দরজা দেখাল মল্লিকা। 'ওটা বাথরূম। আপনি মুখ হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিন, আমি দেখি আপনার জন্যে খাওয়াদাওয়ার কি ব্যবস্থা করা যায়।'

'মানকুলাম থেকে আমি খেয়েই আসছি,' বলল রানা। 'এক কাপ চা বা কফি হলেই চলবে, ধন্যবাদ।'

দরজা খুলে করিডরে বেরুতে যাবে মল্লিকা, ঘাড় ফিরিয়ে হাসল। 'আপনার পাশের কামরাটাই আমার।' কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে।

বাথরূম থেকে ফিরে এসে বিছানায় চিৎ হলো রানা। মল্লিকাকে আদৌ কোন প্রশ্ন করা উচিত হবে কিনা ভাবছে। তার এখনকার স্বতঃস্ফূর্ত, প্রায় উচ্ছ্বসিত আচরণ দেখে মনেই হচ্ছে না যে বিস্ফোরণের ফলে প্রচণ্ড শকে কাহিল হয়ে পড়েছিল সে। কেমন যেন অভিনয় বা কৃত্রিমতার গন্ধ পাচ্ছে ও। কিছু জিজ্ঞেস না করে চোখ-কান খোলা রাখলেই বরং হয়তো অনেক প্রশ্নের উত্তর বেরিয়ে আসবে।

হঠাৎ দরজা খুলে গেল। সবুজ ঘাস আর এক রাশ গোলাপ দেখতে পাচ্ছে রানা। ওকে মুগ্ধ ও বিস্মিত হতে দেখে হাসল মল্লিকা। ব্লেইযার বদলে আঁটসাঁট সাদা স্কার্ট পরেছে সে, প্রিন্ট করা ঘাসগুলো গাঢ় সবুজ; ওপরে পরেছে উন্নত স্তনে এঁটে বসা ব্লাউজ, সুতোয় তোলা গোলাপগুলো নীল। 'মনেই ছিল না যে আপনি ফোন ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন,' বলল সে, মখমলের পর্দার দিকে হাত তুলল। 'ওদিকের দেয়ালে পাবেন।'

'ধন্যবাদ।'

'নিচে, মেইন হলে আছি আমি। কাজ সেরে দশ মিনিটের মধ্যে নেমে আসুন, তা না হলে কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।' নিতম্বে ঢেউ তুলে আবার বেরিয়ে গেল মল্লিকা, তবে দরজাটা বন্ধ করার

সময় অকারণে হাসতে ভুলল না।

বিছানা থেকে উঠে পর্দার দিকে এগোল রানা। ফয়সল খুন হবার পর ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করাটা জরুরী হয়ে পড়েছে। ওর কল মনিটর করা হতে পারে, জানে ও, তবে সেজন্যে মোটেও চিন্তিত নয়। বিসিআই হেডকোয়ার্টার ওকে মানকুলাম-এর একটা ফোন নম্বর দিয়েছে, ফোনগাইডে সেটা নেই, নব্বুই সেকেন্ডের বেশি কথা না বললে লাইনটা ট্রেস করাও সম্ভব নয়।

ডায়াল করল রানা।

'চন্দ্রিকা ট্র্যাভেল এজেন্সি,' ঝরঝরে ইংরেজিতে বলল মিষ্টি নারীকণ্ঠ। চন্দ্রিকা কোড ওয়ার্ড, এই নামে কোথাও কোন ট্র্যাভেল এজেন্সি নেই।

'পেড্রোতে এক পয়েন্ট খুইয়েছি,' বাংলায় বলল রানা, ওর কথা অপরপ্রান্তে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। 'সে নেই। তিনি কি বলেন শোনার জন্যে অপেক্ষা করব আমি।' এরপর মল্লিকার টেলিফোন নম্বরটা জানিয়ে দিল।

'তিন মিনিটের মধ্যে যোগাযোগ হলে হবে, তা না হলে এক ঘণ্টা পর,' বলে লাইন কেটে দিল মেয়েটা।

সে এখন বিসিআই হেডকোয়ার্টারে ফোন করে রেকর্ড করা রানার রিপোর্ট শোনাবে, অফিসে পাওয়া গেলে খোদ রাহাত খানকেই। রানাকে যদি তিনি এখুনি কোন নির্দেশ দিতে চান, তার লাইনের সঙ্গে মল্লিকার লাইনের সংযোগ ঘটিয়ে দেবে চন্দ্রিকা।

দুই মিনিটের মাথায় রিঙ হলো। অপরপ্রান্তে রাহাত খান। 'তোমার সঙ্গে তার কোন কথাই হয়নি?' সরাসরি জানতে চাইলেন তিনি।

'না, স্যার। জেটিতে ভিড়তে যাচ্ছিল বোট, এই সময় বিস্ফোরণ ঘটে।'

'একা শুধু ওকেই টার্গেট করা হয়?'

'জ্বী, স্যার।'

'বোধহয় টাইমিঙে গোলমাল করে ফেলেছে,' বললেন বস্। 'সাবধানে থেকো, দ্বিতীয়বার ওদের টার্গেট না-ও মিস হতে পারে। কাল মানকুলামে সোহেলের সঙ্গে তোমার দেখা হবে। তুমি জানো কোথায়। গুডলাক।' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

তিন

ভারী দরজা খুলে ঠাণ্ডা পাথুরে করিডরে বেরিয়ে এল রানা। এখানে আলো খুব কম, দীর্ঘ করিডরের শেষ মাথা আবছা অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। হঠাৎ রানার মনে হলো, ও একা নয়। পিঠে কারও দৃষ্টি অনুভব করছে। দ্রুত ঘুরল, কিন্তু গাঢ় ছায়ার ভেতর কাউকে দেখতে পেল না। অথচ অনুভূতিটা আগের মতই, কেউ ওর দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর করিডরের শেষ মাথার কাছে আবছা অন্ধকারের চেয়েও কালো একটা আকৃতি নড়ে উঠল। না নড়লে লোকটাকে ছায়ামূর্তি বলে চেনাই যেত না। বেশ লম্বা সে, খালি গায়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অস্পষ্ট হলেও ফুলে থাকা পেশির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এ লোক মালী হতে পারে না। কেয়ারটেকার?

নিজের উপস্থিতি জাহির করার জন্যেই সামান্য একটু নড়েছে লোকটা। কি উদ্দেশ্য বলা মুশকিল। পরস্পরের দিকে দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল ওরা। তারপর আবার নড়ল

লোকটা, অসংখ্য খিলানের একটা ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেদিকে আরও কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর ঘুরে সিঁড়ির দিকে এগোল রানা, ধাপ বেয়ে নেমে এল মেইন হলরূমে। একটা ওক টেবিলের মাথায় কফির সরঞ্জাম নিয়ে ওর অপেক্ষায় বসে রয়েছে মল্লিকা।

'এইমাত্র একটা লোককে দেখলাম,' বলল রানা। 'খালি গায়ে করিডরের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে ছিল।'

'ও, আপনি পশুপতিকে দেখেছেন। কাকার কেয়ারটেকার বা দারোয়ান, যাই বলুন।' গম্ভীর হলো মল্লিকা। 'আপনাকে দেখে ও বোধহয় অস্বস্তি বোধ করছে।'

'কেন?'

'মনিবের অনুপস্থিতিতে তাঁর তরুণী আত্মীয়া এরকম প্রকাণ্ড ও নির্জন একটা দুর্গে বেড়াতে চলে এলে নিঃসঙ্গ তাগড়া যোয়ান একটা চাকর কি ধরনের ফ্যান্টাসীতে ভুগতে পারে কল্পনা করে নিন।' হঠাৎ হাসল মল্লিকা। 'আপনি ওর সেই ফ্যান্টাসীতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন।'

'তাহলে তো আমার একটু সাবধানেই থাকা উচিত, কি বলেন?' হালকা কৌতুকের সুরে বলল রানা।

আরও একটু গম্ভীর হলো মল্লিকা। 'আমার এমন কিছু বলা উচিত নয় যা শুনে আপনি ভয় পান। বাদ দিন তো, এখানে বসুন।' ইঙ্গিতে পাশের চেয়ারটা রানাকে দেখাল।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে তারিফ করল রানা। 'বাহ্, সুন্দর। ধন্যবাদ, মল্লিকা। আপনি কি বলেন, রাতে আমরা বাইরে কোথাও খেতে যাব?'

'ফরম্যালিটি বাদ দিয়ে পরস্পরকে আমরা তুমি বললে পারি না?' হাসল মল্লিকা, রানার কব্জিতে আঙুল ছুঁইয়ে তখুনি আবার সরিয়ে নিল হাতটা। 'হ্যাঁ, কোন রেস্তোরাঁয় যেতে পারি। লাভ

হবে এই যে কষ্ট করে আর ফিরে আসতে হবে না, গেরিলারা দয়া করে একটা বোমা ফাটিয়ে সোজা পরপারে পাঠিয়ে দেবে।'

'পরিস্থিতি এতই খারাপ?'

'সবসময় কোথাও না কোথাও বোমা ফাটছে। কেন, জেলেদের জেটিতে কি ঘটল নিজের চোখেই তো দেখলেন,' দ্বিতীয়বার দেখা হবার পর এই প্রথম বিস্ফোরণের ঘটনাটা স্মরণ করল মল্লিকা। কথাটা বলে মাথা নত করল সে, যেন ঘটনাটার জন্যে সে-ই দায়ী, বা কোন কারণে অপরাধ বোধে ভুগছে।

নিস্তব্ধতা ভারী হয়ে উঠতে রানা জানাল, কাল সকালে ওকে মানকুলামে যেতে হবে।

'তাহলে তো ভালই হলো,' মুখ তুলে বলল মল্লিকা। 'আমি মানকুলামেই থাকি। সকালে একসঙ্গেই রওনা হওয়া যাবে। আর ডিনারের ব্যাপারটা আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন–দাও। তিন-তিনটে রেফ্রিজারেটর, সব কেনা আছে, কি খেতে পছন্দ করো বলবে, আমি নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াব তোমাকে।' এবার রানার হাতে হাত রাখল, সরিয়ে নেয়ার আগে চাপ দিল একটু।

'না, মানে, আমার কিন্তু ইচ্ছা নয় তোমাকে এভাবে ঝামেলায় ফেলি,' ভদ্রতা করে বলল রানা।

'তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, মনে আছে? শুধু একটা ডিনার নয়, আরও অনেক কিছু পাওনা তোমার। তবে ওটা দিয়েই শুরু করা যাক, কি বলো?'

কল্পনার চোখে রানা দেখতে পেল, গভীর রাতে ওর দরজায় নক করছে মল্লিকা। তারপর ভাবল, যদি সত্যি নক করে, সাড়া না দেয়াটা কি অন্যায় হয়ে যাবে না? দুর্গের পরিবেশটাকে রোমান্টিক ও ভৌতিক, দুটোই বলা যায়। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, আশপাশে বিপদ ওত্ পেতে আছে। কিন্তু একই সঙ্গে মল্লিকার আকর্ষণও দুর্নিবার। তার স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটা ধরে রাখার চেষ্টা

বারবার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, সে-কারণেও প্রচণ্ড কৌতূহল বোধ করছে রানা। কিছু একটা গোপন করছে মল্লিকা। সে কি ফয়সলকে চিনত? বিস্ফোরণটা যেখানে ঘটল, তার আশপাশেই ছিল সে—সেটা কি ইচ্ছাকৃত, নাকি ঘটনাচক্র? মল্লিকার আসল পরিচয়টা কি?

এ-সব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে মেয়েটার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হতে হবে ওকে। অন্তত এই কারণেও মল্লিকাকে প্রত্যাখ্যান করাটা ভুল হবে। ফয়সল বিসিআই-এর ইনফর্মার ছিল। তারচেয়ে বড় কথা, বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করতে গিয়ে খুন হয়েছে সে। তার খুনীকে চিনতে হবে। না চিনলে তাকে শাস্তি দেবে কিভাবে।

সন্ধ্যা হয়ে আসতে আলো জ্বালল মল্লিকা। ফিরে এসে চেয়ারে বসল না, রানার একটা হাত ধরে বলল, 'এসো, কিচেনে বসে গল্প করব।'

কিচেনটা আধুনিক, ভেতরে প্রচুর জায়গা। সিলিং থেকে ঝুলন্ত লম্বা হুকের সঙ্গে আটকানো রয়েছে তামা, পিতল ও স্টেইনলেস স্টীল-এর কেটলি ও প্যান। র‍্যাকটা একদিকের পুরো দেয়াল জুড়ে, তাতে থরে থরে সাজানো ডিশ, প্লেট ও কাটলারি। আরেক দিকের দেয়ালে স্টোন আভেন, পাশে একজোড়া গ্যাসের চুলো। দরজার একপাশে দুটো রিফ্রিজারেটর, আরেক পাশে বিশাল একটা ডীপ ফ্রিজার। ওটা থেকে বড় এক টুকরো বীফ বের করে ধারাল ছুরি দিয়ে দ্রুত হাতে ফালি-ফালি করে কাটল মল্লিকা। দেখতে দেখতে কয়েক ধরনের পট ও প্যানে রান্না চড়িয়ে দিল সে, সবগুলো চুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। হাত থেমে নেই—গাজর, টম্যাটো, শসা, ক্যাপসিকাম, ঝাল মরিচ, ধনে পাতা, লেবু ইত্যাদি কেটে স্তূপ করে ফেলল চীনামাটির লম্বাটে একটা ডিশে। সে কাজ করছে, একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে

দিয়ে মৃদু দোল খাচ্ছে রানা, সেই সঙ্গে মল্লিকার প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনছে। শ্রীলঙ্কান স্পোর্টস ফেডারেশন-এর একজন ট্রেইনার সে, মানকুলাম শাখায় ছোট ছেলেমেয়েদের কিভাবে দৌড়াতে হয় শেখায়। তবে তার বাড়ি মানকুলামে নয়, জাফনায়। সে ছাড়া তার পুরো পরিবার জাফনায় আটকা পড়ে, এবং এই অভিশপ্ত যুদ্ধে সবাই মারা যায়।

রান্নার এক পর্যায়ে রানাকে নিয়ে মেইন হলে ফিরে এল মল্লিকা, দাঁড়াল ছোট একটা বার-এর সামনে, অতিথির প্রতি সম্মান জানিয়ে অনুরোধ করল সে যেন নিজের পছন্দ মত পানীয় বেছে নেয়। তারপর, হাতে গ্লাস, দুর্গের ভেতরটা ঘুরিয়ে দেখাল রানাকে। হাঁটার সময় পরস্পরের হাত ধরে থাকল ওরা, মল্লিকার ঊরু রানার ঊরুর সঙ্গে ঘষা খেলো। 'একটা দুঃখজনক ঘটনা আমাদেরকে কাছাকাছি এনে দিয়েছে,' এক সময় বলল মল্লিকা। 'তবে ওই ঘটনার প্রথম অংশটা আমি ভুলে যেতে চাই, মনে রাখতে চাই শুধু দ্বিতীয় অংশটা। কিন্তু তা-ও সম্ভব কিনা আমি জানি না।'

'কেন, এ-কথা বলছ কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তুমি হঠাৎ দেবদূতের মত উদয় হলে। এ তো স্রেফ একটা মায়াই। হঠাৎ দেখব তুমি নেই। নির্মম হলেও, এটাই কঠিন বাস্তব—কষ্ট হলেও মেনে নিতে হবে আমাকে।'

রানার মনে হলো, ওকে কি যেন বলতে চেয়েও বলতে পারছে না মল্লিকা। হয়তো কোন সম্পর্ক নেই, তা সত্ত্বেও টেলিফোনে পাওয়া বসের সতর্কবাণী মনে পড়ে গেল ওর—'সাবধানে থেকো, দ্বিতীয়বার ওদের টার্গেট না-ও মিস হতে পারে।'

'হারিয়ে ফেলব তোমাকে, এ-কথা জানি বলেই তোমার সম্পর্কে আমার কোন কৌতূহল নেই,' ম্লান সুরে আবার বলল মল্লিকা। 'শুধু জানতে ইচ্ছে করছে, তুমি আমার সম্পর্কে কি

ভাবছ, রানা?’

উত্তরটা একটু ঘুরিয়ে দিল রানা। ‘আমি আসলে মানুষকে আনন্দে থাকতে দেখতে পছন্দ করি। হাসি, আনন্দ, পুলক, উল্লাস আর তৃপ্তির ভক্ত আমি। মাটির পৃথিবীতে স্বর্গের কোন নমুনা যদি থাকে, এগুলোই–মানুষের সুখানুভূতি। তোমার সেই কান্নার মধ্যে পরম আনন্দ দেখেছিলাম আমি, তাই ভাল লেগেছিল। আজও, আনন্দে অধীর হয়ে তুমি যদি প্রাণ খুলে হাসতে পারতে, আমার ভাল লাগত। কিন্তু কারণটা কি জানি না, কি যেন তোমাকে বাধা দিচ্ছে। তুমি হাসতে পারছ না।’

‘দেবদূত যে অন্তর্ভেদী হবে, এতে আর আশ্চর্যের কি আছে!’ ম্লান হাসল মল্লিকা। ‘কি জানো, কারও মা-বাবা আর ভাই-বোন যদি যুদ্ধে বন্দী অবস্থায় খুন হয়, তার পক্ষে প্রাণ খুলে হাসা সত্যি সম্ভব নয়। প্লীজ, এর বেশি কিছু জানতে চেয়ো না।’

তারমানে আরও কিছু জানার আছে। কথাটা মনে গেঁথে রাখল রানা। সম্ভব হলে মল্লিকার মা-বাবা ও ভাই-বোন সম্পর্কে খবর নিতে হবে ওকে।

রানা লক্ষ করল, দুর্গের তিন ও চারতলা থেকে মূল কাঠামোর বাইরে বেরুনো যায়, সেদিকে ছোট আকৃতির বেশ কয়েকটা কামরা আছে। প্রাচীন হলেও, পাথরের তৈরি সিঁড়ির ধাপগুলো আজও মসৃণ, কোথাও এতটুকু ভাঙা নয়, পাক খেয়ে উঠে গেছে। দেয়ালে-দেয়ালে মধ্যযুগের অস্ত্র ঝুলছে। কোথাও দেয়াল কেটে তৈরি করা হয়েছে গভীর তাক, প্রতিটি তাকে গম্ভীর অথবা নির্লিপ্ত মুখে বসে আছে পৌরাণিক বীরপুরুষদের ব্রোঞ্জমূর্তি। দোতলায় বড়সড় একটা কামরার ভেতর করিডরের আলো পড়ায় আধুনিক ফার্নিচার ও সারি-সারি বুক শেলফের আভাস পাওয়া গেল। জিজ্ঞেস করায় মল্লিকা জানাল, ওটা তার কাকার স্টাডি। বিমর্ষ ভাবটা কাটিয়ে হঠাৎ উচ্ছল ও মুখর হয়ে উঠল মল্লিকা, দুর্গের

বিভিন্ন অংশের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছে। তার এই পরিবর্তন একটু সন্দেহের চোখেই দেখল রানা। তার কারণও আছে। তিনতলার পুরো বাম দিকটা সযত্নে এড়িয়ে গেল সে, আর সেটা বুঝতে দিতে চায় না বলেই যেন এত কথা বলছে। রানা লক্ষ করল, ওদিকে পাশাপাশি তিনটে কামরা রয়েছে, সবগুলোর জানালা দরজা শক্তভাবে বন্ধ করা। দুর্গের বাকি অংশের তুলনায় ওই বন্ধ কামরাগুলো সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগল, যেন নিষিদ্ধ বা গোপন কিছু আছে ওগুলোয়।

নিচে ফিরে আসার পর ওয়াইন সেলারটা দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করল রানা। পরিষ্কার বোঝা গেল না, একটু কি ইতস্তত করল মল্লিকা? 'ও, হ্যাঁ, ওয়াইন সেলারের কথা বলেছি তোমাকে। তা বেশ তো, চলো, ওটাও দেখিয়ে আনি।' হাসল মল্লিকা, পথ দেখাল, সরু পাথরের ধাপ বেয়ে ওয়াইন সেলারে নামিয়ে আনল রানাকে।

সারির পর সারি দাঁড়িয়ে আছে বিরাট আকারের পিপে। প্রতিটির ছিপি আঁটো করে আঁটা। গায়ে একটা করে ট্যাগ সাঁটা, তাতে কোন পিপে কোন দেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে, কোন শ্রেণীর পানীয়, কবে তৈরি ইত্যাদি লেখা। সেলারটা এত বড়, মল্লিকা সুইচ টিপে আলো জ্বালার পরও শেষ মাথার অন্ধকার কাটল না। রানা আন্দাজ করল, কম করেও কয়েক হাজার পিপে রয়েছে এখানে। কিন্তু কেন? শীত প্রধান পশ্চিমা কোন দেশের অনুকরণে এরকম বিশাল ওয়াইন সেলার তৈরি করার পিছনে মল্লিকার শিল্পপতি কাকার উদ্দেশ্যটা কি? এত মদ দিয়ে কি করবেন ভদ্রলোক?

সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় আরও একটা কি যেন চোখে পড়তে চাইল রানার, কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকিয়েও জিনিসটা দেখতে পেল না। মনটা খুঁত-খুঁত করতে লাগল ওর।

ওকে আরেকবার পিছন ফিরে তাকাতে দেখে মল্লিকা হেসে

উঠে বলল, 'জানি কি ভাবছ। এত মদ দিয়ে কি করেন আমার কাকা, এই তো?'

'হ্যাঁ, প্রশ্নটা আমার মনে জেগেছে।'

'মদ বেচা-কেনা করা কাকার একটা সাইড বিজনেস, বুঝলে!' ব্যাখ্যা করল মল্লিকা। 'শ্রীলঙ্কার প্রায় সব বার-এ এখান থেকেই সাপ্লাই যায়।'

ব্যাখ্যাটা রানার পছন্দ না হলেও চুপ করে থাকল। ওর মন এখনও সেই ব্যাপারটা নিয়ে খুঁত-খুঁত করছে। ওয়াইন সেলারে কি যেন একটা আছে। কিন্তু বুঝতে পারছে না কি সেটা।

এ হলো ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের এক ধরনের খেলা। কিছু একটা ইঙ্গিত পেয়েছে চক্ষু, কিন্তু ইঙ্গিতটা চিনতে না পেরে মস্তিষ্কের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়েছে–কি দেখলাম বলো! উত্তরটা মস্তিষ্ক দেবে ঠিকই, কিন্তু কিছুটা সময় খেলিয়ে নেয়ার পর।

ডিনারে বসার পর মল্লিকার আচরণে আবারও পরিবর্তন লক্ষ করল রানা। বলেছিল, ওর ব্যাপারে তার কোন কৌতূহল নেই, অথচ ব্যক্তিগত নানা বিষয়ে জানতে চাইছে এখন। ঠিক কি কাজে শ্রীলঙ্কায় এসেছে। সিঙ্গাপুর তো কর্মক্ষেত্র, দেশ বা মাতৃভূমি কোথায়। ও কি এখনও একা? কাউকে ভালবাসে?

রানা তার সব প্রশ্নেরই জবাব দিল। তবে প্রথম প্রশ্নের জবাব দিল একেবারে শেষে। 'আমি বাংলাদেশী। শ্রীলঙ্কায় এসেছি তেল চুরির একটা গুজবের ওপর রিপোর্ট তৈরি করতে।' কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখার জন্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

কিন্তু মল্লিকার কোন প্রতিক্রিয়াই হলো না। মাংসের ডিশটা ওর দিকে ঠেলে দিয়ে অভিযোগের সুরে বলল, 'কিছুই তো খাচ্ছ না। রান্না কি ভাল হয়নি?'

'আরে না, প্রতিটি আইটেম দারুণ হয়েছে। খাচ্ছি তো।' মল্লিকার কোন প্রতিক্রিয়া না হওয়ায় রানা হতাশ। ভাবল, ও কি

তাহলে ভুল করছে? মেয়েটার সঙ্গে ওই বিস্ফোরণের কোন সম্পর্ক নেই?

ডিনার শেষ হবার পর কফি পরিবেশন করল মল্লিকা, হাভানা চুরুটের একটা দেখিয়ে বলল, 'অভ্যাস থাকলে খেতে পার। কাকা নিজে ধূমপান করেন না, তবে অতিথিদের অফার করেন।'

'ধন্যবাদ, আমি খাই না,' বলল রানা। 'আরে, তোমার কাকা সম্পর্কে তো প্রায় কিছুই বলোনি। তাঁর মূল ব্যবসাটা যেন কি?'

'ক'টার কথা বলব। রেডিমেড গার্মেন্টস থেকে শুরু করে কসমেটিক্স, সিল্ক মিল, সার ও সিমেন্ট কারখানা, কোনটা না করেন।'

'তাঁর কি সমুদ্রগামী জাহাজ আছে? কার্গো ভেসেল? সুপারট্যাংকার?' রানার চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

'নাহ্, শুধু ওইটাই বোধহয় বাদ পড়েছে।'

'তিনি বিয়ে-টিয়ে করেননি, করবেনও না, তাহলে এত ব্যবসা আর টাকা দিয়ে কি হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, তোমাকে বলেছি যে আমিই কাকার একমাত্র উত্তরাধিকারী।' হাসল মল্লিকা। 'তবে তার মানে এই নয় যে বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত তিনি পাল্টাবেন না। তাছাড়া, টাকা বানানোটা কাকার একটা নেশা।'

'এই দুর্গে হয়তো তিনি মাঝেমধ্যে বেড়াতে আসেন, নিশ্চয়ই বসবাস করেন না?'

'জাফনায় তাঁর বাড়ি আছে।'

মল্লিকা অস্বস্তি বোধ করছে বুঝতে পেরে কাকা প্রসঙ্গ ত্যাগ করল রানা। তাছাড়া, সারাদিন ড্রাইভ করে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, এবার শাওয়ার সেরে ঘুমিয়ে পড়া দরকার।

প্রসঙ্গটা তুলতে মল্লিকা বলল, 'হ্যাঁ, সকালে রওনা হব, আমারও শুয়ে পড়া দরকার। চলো তাহলে।'

দোতলায় উঠে রানার কামরার সামনে দাঁড়াল ওরা। মল্লিকা বলল, 'রাতে তোমার যদি কিছু দরকার হয়, আমাকে ডেকো। একা বেরিয়ো না, কেমন?'

'কেন, ভূত-টূত আছে নাকি?'

হেসে ফেলল মল্লিকা। 'প্রাচীন দুর্গ, ভূত না থাকলেও অতৃপ্ত আত্মা থাকা খুবই সম্ভব। সব দুর্গের ইতিহাসই তো এক–বিদ্রোহী পুরুষ আর সুন্দরী মেয়েদেরকে ধরে এনে নৃশংসভাবে খুন করা হত।'

'সাবধান করার জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু তোমাকে ডাকতে হলেও তো ঘর ছেড়ে বেরুতে হবে আমাকে, তাই না?'

'না, বেরুতে হবে না। পাশের ঘরে আমি থাকছি, আর দুই ঘরের মাঝখানে একটা দরজা আছে।'

'নক করলেই তোমার ঘুম ভেঙে যাবে?'

'যদি না ভাঙে, ভেতরে ঢুকে ডেকো,' বলল মল্লিকা, চোখ নামিয়ে মেঝের দিকে তাকাল। 'গুডনাইট, রানা।'

'গুডনাইট।'

রানার ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। গোটা দুর্গ কবরের মত নিস্তব্ধ হয়ে আছে। গভীর রাতে একবার চমকে উঠেছিল ও, মনে হয়েছিল ব্যথা পেয়ে কেউ চিৎকার করে ওঠায় ঘুমটা এভাবে ভেঙে গেছে। বিছানায় উঠে অনেকক্ষণ কান পেতে বসে থাকলেও কিছু শুনতে পায়নি। ব্যাপারটা স্বপ্নের মধ্যেও ঘটে থাকতে পারে, তাই আবার শুয়ে পড়ে ও। দূর থেকে ভেসে আসা গোলাগুলির শব্দ পেলেও, এরপর আর ঘুম ভাঙবার মত কিছু ঘটেনি। ঘরে মাত্র দুটো দরজা, দুটোই ভেতর থেকে বন্ধ করা ছিল।

শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল রানা। কাপড়চোপড় পরে দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে এল, উদ্দেশ্য কিচেনে নেমে কফি বানাবে। পাশের কামরার দরজা খোলা দেখে উঁকি দিল। ইতিমধ্যে সকাল

হয়ে এসেছে, খোলা জানালা দিয়ে আলো পড়েছে মশারির ভেতর। গায়ের চাদর সরে যাওয়ায় মল্লিকার দীর্ঘ অ্যাথলেটিক কাঠামোটা স্পষ্ট। নিজেকে একটু তিরস্কারই করল রানা। যৌবনের একটা ধর্ম আছে, সেটা অস্বীকার করা ক্ষেত্রবিশেষে অপরাধ। কাল রাতে শোয়ার এক ঘণ্টা পর মাঝখানের দরজায় মৃদু নক হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে সাড়া না দেয়াটা বোধহয় অপরাধই হয়ে গেছে।

চোখের কোণে কি যেন নড়ে উঠতে করিডরের শেষ মাথার দিকে তাকাল রানা। মনে হলো স্যাঁৎ করে কে যেন একটা খিলানের আড়ালে সরে গেল। 'এই, কে ওখানে?' জিজ্ঞেস করল ও, হন-হন করে এগোল সেদিকে।

দীর্ঘ করিডরের অর্ধেকটা পেরিয়ে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, দেখল ওর সামনে একটা পালক পড়ে রয়েছে। লম্বা একটা পালক, রঙটা খয়েরী, গায়ে কালো ফোঁটা। এ-ধরনের পালক আগেও দেখেছে ও, মনে করার চেষ্টা করছে কখন বা কোথায়। এই সময় পিছন থেকে ডাকল মল্লিকা। 'হাই!'

প্রায় স্বচ্ছ স্লিপিং গাউনটা শরীরের অনেক রহস্যই ফাঁস করে দিচ্ছে, তাকাবার পর আর চোখ ফেরাতে পারছে না রানা।

কি ভেবে কে জানে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল মল্লিকা। রানার হাতে ধরা পালকটা দেখল। 'তুমিও দেখছি পেয়েছ! আমিও পাই। আসলে দুর্গটা বিশাল, অথচ লোকজন না থাকারই মত—পাখিরা ইচ্ছেমত আসা-যাওয়া করে।'

কফি খেয়েই বেরিয়ে পড়ল ওরা। দশ মাইল দূরে প্রথম রোডব্লক। কাল এখানে সরকারী সৈন্যরা থামিয়েছিল রানাকে, আজ তাদের লাশ পড়ে আছে চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে; ডিউটি দিচ্ছে টাইগার গেরিলারা। রানাকে বিস্মিত হতে নিষেধ করল মল্লিকা, বলল, 'এরকম হর-হামেশা ঘটছে। এ থেকেই বুঝে নিন

কোথায় বাস করি আমরা।'

গেরিলারা রানার কাগজ-পত্র চেক করল। ভাব দেখে মনে হলো ডেইলি নিউ এশিয়ার নিরপেক্ষ ভূমিকা সম্পর্কে জানে তারা, গাড়ি বা লাগেজ চেক না করেই ছেড়ে দিল। মল্লিকার কাছে আছে মানকুলামে বসবাস করার রেসিডেন্স পারমিট ও আইডেনটিফিকেশন, তবে তাকে চিনতে পেরে সে-সব তারা দেখতে চাইল না। এরকম প্রতিটি রোডব্লকেই বিশেষ কিছু সুবিধে পাওয়া গেল, বিশেষ করে মল্লিকা সঙ্গে থাকায়।

মল্লিকার পথ নির্দেশ পেয়ে মানকুলাম শহরের এক প্রান্তে, একটা নয়তলা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে গাড়ি থামাল রানা। নিচে নেমে মার্সিডিজের নাকের সামনে দিয়ে ঘুরে রানার দিকের জানালার পাশে এসে দাঁড়াল মল্লিকা। জিনসের পকেট থেকে এক গোছা চাবি বের করল, তা থেকে একটা চাবি খুলে বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। 'মানকুলামে যদি রাত কাটাবার প্ল্যান থাকে, তোমাকে আমি হোটেলে থাকতে দিতে রাজি নই। কারণটা আশা করি ব্যাখ্যা করতে হবে না?'

চাবিটা পকেটে ফেলে রানা বলল, 'হবে।'

'আরও একবার নক করে দেখতে চাই,' বলল মল্লিকা। 'ঋণ শোধ করার আর কি কোন উপায় আমার আছে?' তারপর আর দাঁড়াল না, লম্বা পা ফেলে অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে ঢুকে পড়ল।

চার

এমনিতেই পুরনো আর ভাঙাচোরা, তার ওপর অতিরিক্ত দৌড় খাটানো হয়েছে, ফলে অনেকক্ষণ থেকেই ছেড়ে দে মা কেঁদে

বাঁচি বলে কর্কশ চিৎকার করছে মার্সিডিজটা। শহরের আরেক মাথায় পৌঁছে সোহেলের সঙ্গে দেখা করতে হবে রানাকে; তারপর যদি সিদ্ধান্ত হয় যে মানকুলামে দু'একদিন থাকতে হবে ওকে, ওর প্রথম কাজ হবে গাড়িটা বদলানো।

রাস্তার দিকে মনোযোগ, কিছু দূর আসার পর রানা উপলব্ধি করল, মল্লিকার কথা ভুলতে পারছে না ও। কোন সন্দেহ নেই যে অনেক কিছুই গোপন করে গেছে মেয়েটা, তবে তার প্রতিটি আচরণই যে অভিনয় ছিল এ-কথা ওর মন মেনে নিতে পারছে না।

যেমন মেনে নিতে পারছে না ভিউ মিররে আঠার মত সেঁটে থাকা ইস্পাত রঙের ল্যানসিয়াকে স্বাভাবিক ট্র্যাফিকের অংশ হিসেবে। মেইন রোডে যানজট লাগতে যাচ্ছে দেখে সুযোগ পেয়েই বাঁক নিয়ে সাইড রোডে ঢুকল রানা, তারপর থেকে ভিউ মিররে তাকাতেই দু'তিনটে গাড়ির পিছনে দেখতে পেল গাড়িটাকে। লেটেস্ট মডেল, একশো বিশ মাইল তোলা যায়, এঞ্জিনের মতই অত্যন্ত শক্তিশালী বডি।

আরও কয়েকটা বাঁক ঘুরল রানা। সন্দেহ সত্যি প্রমাণিত হলো। ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্যে কয়েকটা গাড়ির পিছনে থাকছে ল্যানসিয়ার ড্রাইভার। অস্পষ্টভাবে তিনটে মাথা দেখতে পেল রানা। বেশিও হতে পারে।

আঙুল তুলে কেউ দেখিয়ে দিয়েছে? তা না হলে এত তাড়াতাড়ি কেউ পিছু নিল কিভাবে? তবে একটু চিন্তা করতে রানা বুঝতে পারল, গেরিলাদের রোডব্লক বা সরকারী সৈন্যদের চেক পয়েন্টে অদৃশ্য শত্রুপক্ষের অনুচররা হয়তো অপেক্ষা করছিল, মার্সিডিজটা দেখেই চিনে ফেলেছে। প্রতিপক্ষ যারাই হোক, শক্তিশালী একটা নেটওঅর্ক আছে তাদের, সেটা এরই মধ্যে নৃশংসতা ও সেই সঙ্গে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে। এই মুহূর্তে পিছু নেয়ার উদ্দেশ্যটাও পরিষ্কার, বিসিআই-এর গোপন শাখাটা

চিনবে। তা ওদেরকে রানা কোনভাবেই চিনতে দেবে না, ফেউ খসাতে ব্যর্থ হলে সোহেলের সঙ্গে আজ দেখাই করবে না ও।

একটা ট্র্যাফিক সার্কেল ধরে দু'বার ঘুরল রানা, নেমে এসে ঢুকে পড়ল একটা সাইড রোডে, একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা আপেল বোঝাই একটা তিন চাকার ভ্যানকে উল্টে দিয়ে। রাস্তার ধারে পেচ্ছাব করতে বসেছিল ফলওয়ালা, হাউমাউ করে ছুটে এসে আপেল কুড়াতে লাগল। ঠোঁটে তৃপ্তির হাসি নিয়ে রানা দেখল ঘ্যাচ্ করে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল ল্যানসিয়া, সাইড রোডে ঢুকতে পারছে না।

পরবর্তী দুশো গজের মধ্যে আরও দু'বার বাঁক নিল রানা। পিছন থেকে হর্ন আর টায়ারের কর্কশ প্রতিবাদ ভেসে আসছে, কাজেই ঠোঁটের হাসি ধরে রাখা গেল না। ব্রীফকেস খুলে পিস্তলটা বের করে কোলের ওপর রাখল ও। সাইড রোডের দু'পাশে সরু গলির অভাব নেই, কিন্তু মার্সিডিজ ভেতরে ঢুকবে না। অগত্যা বাধ্য হয়ে আবার মেইন রোডে বেরিয়ে আসতে হলো ওকে।

রাস্তার একপাশে বিশাল ট্রাক স্ট্যান্ড, আরেক পাশে সারি সারি দৈত্যাকার গুদামঘর–ওয়্যারহাউস। ভিউ মিররে আবার দেখা গেল ল্যানসিয়াকে, স্পীড বাড়াচ্ছে। ড্রাইভার এখন জানে ব্যাপারটা গোপন নেই। একের পর এক কয়েকটা ট্রাককে ওভারটেক করে ধেয়ে আসছে মার্সিডিজকে ধরার জন্যে। মার্সিডিজ আকারে ছোট না হলে কি হবে, ল্যানসিয়ার হেভী চেসিস, বিরাট ফেন্ডার আর শক্তিশালী বাম্পার চড়াও হলে ওটার খবর হয়ে যাবে। এখন আর সম্ভবত রানা এজেন্সির গোপন ঠিকানা জানতে উৎসাহী নয় তারা। একটা সংঘর্ষ বাধাতে চায়, দেখে মনে হবে স্রেফ দুর্ঘটনা। গুলি করার দরকার নেই, তবে সুযোগ থাকলে উল্টে দেয়া মার্সিডিজে খানিকটা পেট্রল ঢালবে, তাতে ছুঁড়ে দেবে একটা জ্বলন্ত কাঠি। তারপর অকুস্থল ছেড়ে

দ্রুত পলায়ন। পরে আগুন আর লাশ নিয়ে যত খুশি কসরৎ করুক পুলিস, কার কি!

মার্সিডিজ যত না ছুটছে তারচেয়ে বেশি ঢাক-ঢোল পেটাচ্ছে। রাস্তার পাশের গুদামঘরগুলো শেষ হতে চাইছে না। বাঁক ঘোরার কোন সুযোগ নেই অথচ দৈত্য ল্যানসিয়া ঘাড়ের কাছে দ্রুত চলে আসছে।

হঠাৎ করেই দুই গোডাউনের মাঝখানে ফাঁকটা দেখতে পেল রানা, তবে এত সরু যে মার্সিডিজ ঢুকবে কি না সন্দেহ। স্পীড না কমিয়ে হুইল ঘোরাল বন-বন করে। ডান দিকে কাত হলো গাড়ি, বাঁ দিকের দুটো চাকাই শূন্যে উঠে পড়েছে। একটা গোডাউনের লোডিং প্ল্যাটফর্মের কিনারায় বাড়ি খেলো ফেন্ডার, কংক্রিটের টুকরো বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। বাঁ দিকের চাকা দুটো নামাল না, নামালে ফাঁকের ভেতর জায়গা পাবে না মার্সিডিজ—দু'পাশে টিস্যু পেপারের মত ফাঁক রেখে বেরিয়ে আসছে রানা। পিছনে ল্যানসিয়ার চাকার সঙ্গে রাস্তার ঘর্ষণ হয়নি, হলে আওয়াজ পেত ও। ব্যাপারটা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। তবে সরু প্যাসেজ থেকে বাইরে বেরুতেই রহস্যটা বোঝা গেল। একটা বাঁক ঘুরে গোডাউনের পিছনের রাস্তায় পড়ল ল্যানসিয়া, সোজা মার্সিডিজের দিকে ছুটে আসছে। তারমানে আরও একটা সুবিধে ভোগ করছে ওরা। মানকুলাম শহরটা রানার চেয়ে ভালভাবে চেনে।

ল্যানসিয়া স্পীড বাড়িয়ে দিল। মুখোমুখি সংঘর্ষ ঠেকাবার কোন উপায় নেই। গলি বেশ কয়েকটাই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এত সরু যে একটাতেও মার্সিডিজ ঢুকবে না। একেবারে শেষ মুহূর্তে হুইল ঘুরিয়ে সংঘর্ষটা এড়াবার চেষ্টা করল রানা। ল্যানসিয়া আঘাত করল মার্সিডিজের রিয়ার ফেন্ডারে। ফল হলো বিস্ময়কর। লাটিমের মত ঘুরতে শুরু করল মার্সিডিজ, তিন পাক

ঘোরার সময় তিনবার আঘাত করল স্থির দাঁড়িয়ে পড়া ল্যানসিয়ার নাকে, পেটে আর নিতম্বে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, মার্সিডিজ ঝাড়া ত্রিশ সেকেন্ড মৌনব্রত অবলম্বন করল, ধাতব একটা টুঁ-শব্দ পর্যন্ত নেই–যেন রানার প্রতিক্রিয়া জানার জন্যে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে। ল্যানসিয়ার বাম্পার ও ফেন্ডার আলগা হয়ে খসে পড়েছে রাস্তার ওপর, উইন্ডস্ক্রীনের কাঁচ বলে কিছু নেই, বডি গেছে তুবড়ে।

'আই য়্যাম ইমপ্রেসড্, মাই ডিয়ার লেডি!' মার্সিডিজের হুইলে একটা চুমো খেলো রানা। 'আস্থা রাখতে না পেরে যে অপরাধ করেছি, সম্ভব হলে ক্ষমা করে দিয়ো।'

এটা বোধহয় আরও অবিশ্বাস্য যে রানা থামতেই আবার ধাতব ঐকতান শুরু করল মার্সিডিজ, এবার আগের চেয়ে দ্বিগুণ জোরে।

তবে বিশেষ কোন লাভ হয়নি। কারণ আবার পাগলা কুকুরের মত পিছু নিয়েছে ল্যানসিয়া। মার্সিডিজ ওটার শুধু দু'একটা পশম ছিঁড়তে পেরেছে, ভেতরের কৃমিগুলোর কোন ক্ষতি করতে পারেনি।

বাঁক নিল রানা। এদিকে রাস্তাটা চওড়া, একদিকে গোডাউন, আরেক দিকে খোলা গ্রোসারি মার্কেট। মার্কেটের সামনে গাড়ি ও লোকজন গিজগিজ করছে, ফলে খুব সাবধানে ড্রাইভ করতে হচ্ছে ওকে। রিয়ার ভিউ মিররে ল্যানসিয়াকে দেখতে পেল ও, বাঁক নিয়ে চওড়া রাস্তায় পড়ল। চারপাশে প্রচুর গাড়ি আর লোকজন থাকায় একটা সুবিধে পাচ্ছে রানা, সংঘর্ষ বাধাবার ইচ্ছাটা আপাতত কাজে লাগাতে পারছে না ল্যানসিয়ার ড্রাইভার। কিন্তু এই সুবিধে বেশিক্ষণ পাবে না ও। তার আগেই কিছু একটা করা দরকার ওর। হঠাৎ করেই মাথায় খেলে গেল সেটা কি হতে পারে। ল্যানসিয়ার ড্রাইভার যেটা কল্পনাও করতে পারবে না!

গ্রোসারি মার্কেটকে ছাড়িয়ে এল রানা। এদিকে এক সারিতে শুধু লেপ-তোষকের দোকান। একটা মোড়ে পৌঁছে মাঝখানের গোল চক্করটা ধরে পুরো এক পাক ঘুরল, স্পীড বাড়াল সরাসরি ল্যানসিয়াকে লক্ষ্য করে। 'সেই খেলাটাই খেলো, সুন্দরী!' বিড়বিড় করে বলল ও। 'তবে একা।' এদিকে রাস্তায় গাড়ি কম, লোকজন আরও কম। দুটো গাড়ি পরস্পরের দিকে ছুটল। লক্ষণ দেখে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাচ্ছে দু'চারটে গাড়ি ও পথিক।

মার্সিডিজের দরজা খুলে একমুহূর্ত অপেক্ষা করল রানা। সামনের রাস্তায় ল্যানসিয়া ছাড়া আর কিছু নেই দেখে সীট থেকে গাড়ির বাইরে ফেলে দিল সুটকেস ও ব্রীফকেস, তারপর নিজেও লাফ দিল সরাসরি একটা দোকানের পিছনের দেয়াল লক্ষ্য করে। বালিশের একটা স্তূপ ও দোকানের বেড়া ভেঙে খোলা মাঠে বেরিয়ে এল শরীরটা, একটা কোল বালিশকে আলিঙ্গন করে গড়াচ্ছে। এক লাফে সিধে হয়েই ছুটল ভিড় ও গ্রোসারি মার্কেটের দিকে। দৈত্যাকার দুই ধাতব ঘাতকের সংঘর্ষ কানে যেন মধুবর্ষণ করল।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাতে হতাশ হলো রানা। মুখোমুখি সংঘর্ষে ল্যানসিয়া উল্টে গেছে, মার্সিডিজ এখনও চার চাকার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ল্যানসিয়ার ভেতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল চারজন কালো কুচকুচে তরুণ। দিক ভ্রান্তি কাটিয়ে উঠতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় নিল তারা, তারপর দুই দোকানের মাঝখানের ফাঁক গলে ঢুকে পড়ল খোলা মাঠে, ধাওয়া শুরু করল রানাকে।

গ্রোসারি মার্কেটে ঢুকল রানা পিছন দিক দিয়ে। হাতে পিস্তল থাকলেও, আড়াল করে রেখেছে। মার্কেটের ভেতর অসংখ্য দোকান, মাঝখানে সরু-সরু প্যাসেজ, এ যেন ঠিক ঢাকার বঙ্গ-বাজার। ভর দুপুরবেলাও ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড়

মন্থরগতি স্রোতের মত। লোকজনকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে এগোচ্ছে রানা। পিছন দিকে তাকিয়ে দেখল চার কালো ভূত এরই মধ্যে স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে।

মার্কেট থেকে বেরিয়ে এসে আরেকটা ল্যানসিয়া দেখতে পেল রানা, তবে এটার রঙ সাদা, গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছোট্ট আয়নায় চোখ রেখে ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষছে অপূর্ব সুন্দরী একটা মেয়ে। ঠিক যা চাইছিল ও–মেয়েটা নয়, গাড়িটা। মাত্র একবার চোখ বোলাতেই ভাল লাগার একটা অনুভূতি জাগল মনে। দাঁড়িয়ে আছে অলস একটা ভঙ্গি নিয়ে, কাঁধে একরাশ কালো সিল্ক-এর স্তূপ, পরনের পার্ল-গ্রে রঙের স্ল্যাকস ও সাদা শার্টের ওপর অ্যাশ-কালারের কার্ডিগান। হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটা, এবং তাকাতেই জ্যাকেটের ভেতর থেকে রানার পিস্তল ধরা হাতটা বেরিয়ে আসতে দেখল। সতর্ক একটা ভাব ফুটল চোখে, তবে তার বেশি কিছু নয়–আতঙ্কে চিৎকার দেয়নি বা কুঁকড়ে ছোট হয়েও যায়নি।

'কোন ভয় নেই,' চাপা গলায় বলল রানা। 'আপনার কোন ক্ষতি করব না,' বলে গাড়ির দরজা খুলে মেয়েটাকে ঠেলে ভেতরে ঢোকাল ও, কোমরে হাতের চাপ দিয়ে সরে যেতে বাধ্য করল পাশের সীটে। কথাগুলো সিংহলী ভাষায় তরজমা করতে যাবে, মেয়েটা বাধা দিল।

'আমি ইংরেজি বুঝি। জানতে পারি, কি ঘটছে?'

সুইচ অন করে স্টার্ট দিল রানা, ল্যানসিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট পূর্ণশক্তিতে গর্জে উঠল। 'আপনার সাহায্য নিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছি।' বিশ গজ দূরের একটা প্যাসেজ হয়ে মার্কেট থেকে বেরুল ভূতগুলো, সরাসরি তাদের দিকে ল্যানসিয়া ছোটাল রানা। ছিটকে সরে গেল লোকগুলো।

পিছন ফিরে তাকাল মেয়েটা। 'ওরা একটা মাইক্রোবাস

হাইজ্যাক করছে,’ বলল সে। ‘দয়া করে গাড়ি থামিয়ে এখুনি নেমে যান আপনি। একটা মেয়েকে এভাবে বিপদে ফেলতে আপনার বিবেকে বাধছে না?’ আবার পিছন দিকে তাকাল সে।

‘দুঃখিত,’ বলল রানা, দুই চাকার ওপর চালিয়ে একটা বাঁক ঘোরাল ল্যানসিয়াকে।

‘আপনি সিংহলী নন, বিদেশী,’ বলল মেয়েটা, কোলের ওপর হাতব্যাগটা শক্ত করে ধরে আছে। ‘একদল গুণ্ডা আপনাকে তাড়া করবে কেন?’

‘সেটা ওরাই ভাল বলতে পারবে।’ কংক্রিটে চাকার কিনারা ঘষে আরেকটা বাঁক নিল রানা।

রানা খেয়াল করল, ঘাড় ফিরিয়ে বারবার পিছনের মাইক্রোবাসের দিকে তাকাচ্ছে মেয়েটা। সামনে দীর্ঘ খোলা রাস্তা পেয়ে অ্যাকসেলারেটারে চাপ দিল ও, ল্যানসিয়ার লাফ দেয়াটা অনুভব করে আপনমনে হাসল একটু।

‘আপনার হাসি পাচ্ছে?’ অসহায় একটা ভঙ্গি করল মেয়েটা। ‘আপনার উদ্দেশ্যটা কি শুনি? কোথায় যাচ্ছেন? আমাকে নিয়ে কি করবেন?’

‘রিল্যাক্স, কিছু করব না।’

হঠাৎ ফোঁস করে উঠল মেয়েটা। ‘একটা গুণ্ডার কথা আমি বিশ্বাস করব কেন?’

দ্রুত একবার তাকাল রানা। গলার স্বরে যে পরিমাণ ঝাঁঝ, তার তুলনায় বলতে হয় মুখে রাগের প্রায় কোন ভাবই নেই, চোখেও নেই বিতৃষ্ণা বা আগুন। বরং ঠাণ্ডা আর আত্মপ্রত্যয়ী ভাবটাই চোখে পড়ছে। মেয়েটার উন্নত স্তনযুগল অনায়াসে ভরাট করে রেখেছে কার্ডিগানটাকে। কিছু বলতে যাবে ও, এই সময় টাং করে শব্দ হলো ল্যানসিয়ার ছাদে। একটা বুলেট, ছাদের কোণে লেগে বেরিয়ে গেল। ‘নিচু হন!’ চিৎকার করল ও।

সঙ্গে সঙ্গে সীট থেকে হড়কে মেঝেতে নেমে গেল মেয়েটা, মুখ তুলে রানার দিকে তাকিয়ে আছে। 'আবার বলে কিনা রিল্যাক্স!'

'দুঃখিত,' হাসি পেলেও চেপে রাখল রানা। আরেকটা বাঁক ঘুরল ও। মেয়েটা ওকে সত্যি অবাক করছে। বুলেটের ভয়ে মেঝেতে বসে আছে ঠিকই, কিন্তু নড়েচড়ে বসাটা যতটা সম্ভব আরামদায়ক করে নিচ্ছে, আবার রানার দিকে তাকিয়েও আছে একদৃষ্টে। শান্ত, যেন বাড়ির নিরাপদ ড্রয়িংরুমে বসে আছে। ল্যানসিয়ার ছাদে আরেকটা বুলেট ঘষা খেলো। ওরা বুঝতে পারছে মাইক্রোবাস নিয়ে ল্যানসিয়াকে ওভারটেক করা কঠিন হবে, এখন ওদের একমাত্র উপায় গুলি করে রানাকে থামানো।

চওড়া রাস্তা বিরাট একটা বৃত্ত তৈরি করেছে, বৃত্তের দূর প্রান্তে কয়েক সারি রেললাইন দেখতে পেল রানা। বিরাট ডিজেল এঞ্জিন একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেনকে নিয়ে উল্টো দিকে ছুটছে, সেটা দেখে একটা আইডিয়া খেলল ওর মাথায়। ইতিমধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে প্রতিটি রাস্তা ঘন-ঘন মোড় নেয়ায়, শহরের ভেতর ট্র্যাফিক বিশৃংখলার মধ্যে, মাইক্রোবাসটাকে খসানো সম্ভব নয়। খসাতে হলে একটা হাইওয়ে দরকার, আর সেটা যখন নেই তখন মন্দের ভাল একটা উপায় কাজে লাগাতে হবে ওকে। প্রথম কাজ মাইক্রোবাসের সঙ্গে ল্যানসিয়ার দূরত্ব বাড়ানো।

গাড়ির স্পীড বাড়াল রানা। মেয়েটা, এখনও মেঝেতে বসে আছে, শক্ত হয়ে গেল। অন্যান্য গাড়িকে ওভারটেক করছে ল্যানসিয়া, ঘন-ঘন কাত হচ্ছে, দু'এক ইঞ্চির জন্যে দুর্ঘটনা ঘটছে না।

'আপনি ধরা দিচ্ছেন না কেন?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা। 'মারা যাওয়ার চেয়ে সেটা কি ভাল নয়? এভাবে চলতে থাকলে তো দু'জনেই মারা পড়ব।'

‘আমার কথা শুনলে আপনার কোন ক্ষতিই হবে না,’ বলল রানা। একটা এক্সপ্রেস ট্রেনকে ওভারটেক করছে ও। খুব দ্রুত ছুটছে ওটা, ওভারটেক করার জন্যে ল্যানসিয়ার স্পীড ঘণ্টায় একশো মাইলে তুলতে হলো। মাইক্রোবাসটা আপাতত দৃষ্টিসীমার বাইরে পিছিয়ে পড়লেও, রানা জানে কালো ভূতগুলো হাল ছাড়ার পাত্র নয়। লক্ষ করল, পানপাতা আকৃতির মুখ তুলে ওকে দেখছে মেয়েটা, চোখ জোড়া একটু কুঁচকে আছে।

রানাকে এখন সময় ও গতির চুলচেরা হিসেব করতে হবে। এক চুল ভুল হলে পরিণতি হবে ভয়াবহ, কারণ তা সংশোধন করার কোন সুযোগই পাওয়া যাবে না। রেলরোড ক্রসিং দৃষ্টিপথে চলে এল, এক মাইলের বেশি দূরে নয় সেটা–ল্যানসিয়ার স্পীড আরও একটু বাড়াল ও–তাকিয়ে দেখল স্পীডোমিটারের কাঁটা একশো পনেরোর ঘরে উঠল। ক্রসিঙে প্রায় পৌঁছে গেছে ওরা। ঘাড় ফিরিয়ে এক্সপ্রেস ট্রেনটাকে চট করে একবার দেখে নিল রানা।

‘সীটে বসুন!’ যেন রানার নির্দেশের অপেক্ষাতেই ছিল মেয়েটা, সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। ‘আমি বললেই গাড়ি থেকে নেমে রেললাইন পেরুবেন–ঠিক আছে?’

জবাবে কিছু বলল না মেয়েটা। অবশ্য তার চেয়ে জরুরী কাজে ব্যস্ত সে–ল্যানসিয়ার ঠিক পেছনে লেগে থাকা ট্রেন আর দ্রুত সামনে ছুটে আসা ক্রসিংটা বারবার দেখে নিচ্ছে।

হুইল ধরা রানার হাত ঘেমে গেছে। পালা করে দুই হাতের আঙুল বারবার খুলে ও ভাঁজ করে আড়ষ্ট ও অসাড় ভাব দূর করল ও। ক্রসিঙের ওপর পৌঁছাতে যাচ্ছে ল্যানসিয়া। সাবধানে একটু চাপ দিল ব্রেকে, জানে তা না হলে উল্টে যাবে গাড়ি। চাকাগুলো হড়কাল, স্থির হলো লাইনের ঠিক ওপরে। ট্রেনটা একশো ফুট দূরে। নিয়তির মত অমোঘ, কার সাধ্য এখন থামায়।

'আউট!' গর্জে উঠল রানা, চিৎকারটা থামার আগেই দরজা খুলে ফেলেছে ওর সঙ্গিনী। তার সুগঠিত নিতম্ব দরজার বাইরে অদৃশ্য হয়ে যেতেই ডিগবাজি খেয়ে বেরিয়ে এল ও। মেয়েটা তখনও তাল সামলাতে পারেনি, তার আগেই লাইনের ওপর পা পড়ল রানার। হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে তাকে সিধে করে ছুটল ও। লাইন ছেড়ে মাত্র বেরিয়ে এসেছে, ল্যানসিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ট্রেন। আগুনের একটা গোলা দুপুরটাকে আরও আলোকিত ও উত্তপ্ত করে তুলল, পিঠে আঁচের তীব্রতা প্রায় ধাক্কা দিয়ে সামনে ঠেলে দিল রানাকে। বিস্ফোরণের সঙ্গে কানে আসছে ধাতব গর্জন–ইস্পাত ও লোহা দুমড়ে, মুচড়ে, ছিঁড়ে, ভেঙে একাকার হয়ে যাচ্ছে। টান দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড আর কিম্ভূতকিমাকার ধাতব স্তূপটার দিকে তাকাল মেয়েটা, ট্রেনটা এখনও সেটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। 'আমার গাড়ি!' ক্ষোভে ও দুঃখে অসহায় দেখাল তাকে।

'আপনাকে নতুন একটা কিনে দেয়া হবে,' বলল রানা, আবার তার হাত ধরে ছুটল। ইতিমধ্যে শত্রুপক্ষের মাইক্রোবাস যদি অকুস্থলে না-ও পৌঁছে থাকে, পৌঁছাতে খুব বেশি দেরিও নেই। লাইনের ওপারে দাঁড়িয়ে কালো ভূতগুলো ধরে নেবে হিসেবে ভুল করেছে রানা, দুর্ঘটনার সময় ল্যানসিয়াতেই ছিল ওরা। আগুন ও ধাতব স্তূপের ভেতর কোন লাশ আছে কিনা নিশ্চিতভাবে জানতে হলে বেশ কিছুক্ষণ লাগবে তাদের, ততক্ষণে রানা এলাকা ছেড়ে অনেক দূরে সরে যাবে।

আধ মাইল হেঁটে একটা ট্যাক্সি স্ট্যান্ড দেখতে পেয়ে থামল রানা, এই প্রথম লক্ষ করল রেললাইনের পাশে পড়ে যাওয়ায় মেয়েটার কাপড়ে ও মুখে যে ধুলো লেগেছিল তা ঘামে ভিজে গেছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে বাড়িয়ে দিল ও, বলল, 'এটা দিয়ে মুখটা অন্তত মুছে নিতে পারেন।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে রুমালটা নিল সে। ‘দুঃখিত, আপনাকে আমার গুণ্ডা বলা উচিত হয়নি। কিন্তু…আসলে কি আপনি? এটা ঠিক কোন্ ধরনের পাগলামি হলো?’

‘আর আপনি?’ জিজ্ঞেস করল রানা। ‘আপনার আচরণটাকে কি বলা যায়? চিৎকার করে লোক ডাকলেন না, আমার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করলেন না, গাড়ির দুঃখে কাঁদলেন না। কে আপনি?’

‘আমি একটা এনজিও-র ফিল্ড অফিসার,’ বলল মেয়েটা। ‘কোথাও যুদ্ধ বাধলে সেখানে খাদ্য ও ওষুধের নিয়মিত সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায়, তখন আমার ওপর দায়িত্ব চাপে সেখানে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সাহায্য করা। অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয় আমাকে। এর আগে অনেক বারই আমার গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়েছে। দু'একটা গাড়ি খোয়াতেও হয়েছে। তবে এই গাড়িটা অফিসেরও নয়, আমারও নয়, আমার বড় বোনের।’

‘বোঝা গেল অভিজ্ঞতাই আপনাকে শান্ত থাকতে শিখিয়েছে,’ বলল রানা, মেয়েটির ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট। ‘তবে চিন্তার কিছু নেই। আপনার নাম ঠিকানা দিন, আমি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করব।’

‘আমার অভিজ্ঞতা কিন্তু আপনার পরিচয় আন্দাজ করতে কোন সাহায্যে আসছে না,’ বলল সে। ‘আবার জিজ্ঞেস করি–কি আপনি?’

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল রানা। ‘বিশ্বাস করুন, এই মুহূর্তে আমার হাতে একদমই সময় নেই। নাম ও ঠিকানা, প্লীজ।’

‘কারণটা কি জানি না, তবে আপনাকে আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে।’

‘কৃতিত্বটা বোধহয় আমার শ্রীমুখের, আই হ্যাভ অ্যান অনেস্ট ফেস।’ হাসল রানা।

‘নো, ইউ হ্যাভ আ ফ্যাসিনেটিং ফেস,’ বলল সে। ‘আর আপনার এই শ্রী-বদনই আমাকে দ্বিধায় ফেলে দিচ্ছে, কারণ দেবদূত থেকে শুরু করে জুয়েল থিফ পর্যন্ত সবই আপনি হতে পারেন।’

‘আপনি এটার ওপর গবেষণা করুন, তবে আমাকে দয়া করে যেতে দিন,’ বলল রানা। ‘নামটা?’

‘আমি যমুনা, মানে অফিসে সবাই আমাকে এই নামে ডাকে আর কি,’ বলল সে। ‘আসল নামটা একটু সেকেলে–হাসনা-হেনা। আমাদের এনজিও সেভ দা ইনোসেন্ট পিপল অব ওঅর জোন-এর হেড অফিস কলম্বোয়, আমি মানকুলাম শাখায় আছি। ফ্ল্যাটের ঠিকানা–তেইশ, বন্দর নায়েক রোড। তো, সত্যি যদি ক্ষতিপূরণ করেন, পদ্ধতিটা কি হবে?’

‘আপনিই বলুন।’

‘আপনি ট্যুরিস্ট হলে শ্রীলঙ্কায় আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই। নতুন একটা ল্যানসিয়ার যে দাম পড়বে, অত নগদ টাকা আপনার কাছে থাকার কথা নয়, থাকাটা বৈধও হবে না। ধরে নিচ্ছি আপনার কাছে ভিসা বা মাস্টার কার্ড আছে।’

‘আছে।’

‘গাড়ির যে-কোন শো-রূমে ওগুলো আপনি ভাঙাতে পারবেন,’ বলল যমুনা। ‘তবে অনুরোধ করব, কেনার সময় খেয়াল রাখবেন গাড়িটা যেন সাদাই হয়–সাদা ছাড়া অন্য যে-কোন রঙ বড় আপার অপছন্দ।’

‘ঠিক আছে। তাহলে সে কথাই রইল, ঝকঝকে নতুন একটা গাড়ি নিয়ে দু’একদিনের মধ্যে আপনার ফ্ল্যাটের সামনে আমি হর্ন বাজাব।’

‘আমার প্রশ্নের উত্তরটা কি সেদিনই পাব, তার আগে নয়?’ জানতে চাইল যমুনা।

'আপনি আবার কখন কি প্রশ্ন করলেন?'

'কয়েকবারই জানতে চেয়েছি–আপনি কি?'

'কি, এর জবাব দেয়ার সময় নেই,' বলল রানা। 'যদি জিজ্ঞেস করেন কে, উত্তর হলো–মাসুদ রানা।' হাত তুলে একটা ট্যাক্সি ডাকল ও। 'আপাতত বিদায়।' ট্যাক্সি পাশে এসে দাঁড়াতে উঠে পড়ল। একটু পর পিছন ফিরে তাকাল ও। সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ওর ট্যাক্সির দিকে তাকিয়ে রয়েছে যমুনা। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা আর দশটা মেয়ের মত নয়। দৃঢ় প্রত্যয়ী অটল একটা ভাব। চোখাচোখি হতেও যমুনা হাত নাড়ল না। তবে ত্রিশ গজ দূর থেকেও তার সাদা দাঁত দেখতে পেল রানা। মিটিমিটি হাসছে সে।

পাঁচ

লেপ-তোষকের দোকানের কাছে ফিরে এসে বালিশ ও বেড়ার একটা দাম ধরে পাওনা পরিশোধ করল রানা, ঠিক পাশের দোকান থেকেই সুটকেস ও ব্রীফকেস ফেরত পাবার বিনিময়ে পাঁচশো রুপি বকশিশ দিল, তারপর ট্যাক্সি নিয়ে চলে এল শহরের উত্তর প্রান্তে।

বিসিআই-এর গোপন শাখা অফিসটি পুত্তান মাতালি রোডের

শেষ মাথায়, কাঁচ মোড়া বহুতল ভবনের অর্ধেকটা গ্রাউন্ডফ্লোর জুড়ে সাজানো একটা অ্যান্টিক শপে। দোকানটার নাম–ওল্ড ইজ গোল্ড। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে হেঁটে পৌঁছাল রানা, নিজেকে সিঙ্গাপুরের একজন অ্যান্টিকস ডিলার বলে পরিচয় দিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে চাইল; উদ্দেশ্য, বেশ কিছু সিংহলী অ্যান্টিকস ইমপোর্ট করতে চায় সে। কর্মচারীরা জানাল, এই মুহূর্তে ম্যানেজার উপস্থিত নেই, তবে ওল্ড ইজ গোল্ড-এর অন্যতম প্রপ্রাইটার মি. সোহেল আহমেদ বর্তমানে শ্রীলঙ্কায় অবস্থান করছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারে ও।

পথ দেখিয়ে ভেতরের একটা অফিস কামরায় পৌঁছে দেয়া হলো রানাকে। দরজা বন্ধ হতেই পায়চারি থামিয়ে বিসিআই-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (অপারেশন্স) সোহেল আহমেদ আলিঙ্গন করল প্রাণপ্রিয় বন্ধুকে। তার অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা ধরা পড়েছে–রানা উদ্বিগ্ন। জানতে চাইল, 'কি ঘটেছে?'

'পিছনে ফেউ লেগেছিল,' বলল রানা।

'এত তাড়াতাড়ি?'

'একটা প্রশ্ন বটে।'

'নিশ্চয়ই খসিয়ে এসেছিস?'

'না, তোকে ধরার জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছে ওরা।'

খোঁচাটা গায়ে মাখল না সোহেল। 'কি ঘটেছে রিপোর্ট কর। পয়েন্ট পেড্রো থেকে শুরু করবি।'

যা যা ঘটেছে সংক্ষেপে বলে গেল রানা।

সব শুনে গম্ভীর হলো সোহেল। 'তথ্য সংগ্রহের জন্যে কয়েক হপ্তা ধরে এখানে-সেখানে ঢুঁ মারছিল ফয়সল, ঢাকা থেকে কাউকে পাঠাবার জন্যে মেসেজও পাঠায়, ফলে প্রতিপক্ষরা তার ভূমিকা সম্পর্কে জেনে ফেলে। কিন্তু তাকে একা কেন মারল ওরা? আর দু'তিন মিনিট অপেক্ষা করলে ওই একটা বিস্ফোরণে তোকেও তো

উড়িয়ে দিতে পারত, তাই না?'

'ওখানে আমাকে যেহেতু টার্গেট করা হয়নি, ধরে নিতে হয় তখনও ওরা আমার পরিচয় বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু জানত না। জেনেছে আমি মানকুলামে ফিরে আসার পর।'

'মল্লিকা রত্নপ্রভা?'

'মেয়েটা যেন কি একটা দ্বিধা বা চাপের মধ্যে আছে। ওর সম্পর্কে কিছু তথ্য দরকার আমার।'

ডেস্কের ওপর রাখা কমপিউটরের দিকে তাকাল সোহেল। 'যেমন?'

'ওর মা-বাবা ও ভাই-বোন কি সত্যি যুদ্ধে মারা গেছে?'

'আর?'

'রত্নগিরি জয়শঙ্খ কি সত্যি ওর কাকা?'

'একটু অপেক্ষা কর।' ইঙ্গিতে রানাকে খালি একটা চেয়ার দেখাল সোহেল। নিজে ডেস্কের পিছনে বসে কমপিউটর অন করল। তিন মিনিট পর মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল ও। 'হ্যাঁ, আড়াই বছর আগের ঘটনা—জাফনায় সরকারী সৈন্য ও এলটিটিই-র মধ্যে প্রচণ্ড গুলি বিনিময়ের সময় ক্রস ফায়ারে পড়ে মল্লিকার মা-বাবা ও দুই ভাই-বোন নিহত হয়। তবে এর মধ্যে একটা কিন্তু আছে। এই খবর কোন সংবাদ সংস্থা সমর্থন করেনি, নিহতদের সরকারী তালিকাতে তাদের নামও নেই। শ্রীলঙ্কান নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, ওদের মৃত্যুর খবর লিবারেশন টাইগারস অব তামিল ইলাম-এর তরফ থেকে মল্লিকাকে ব্যক্তিগতভাবে জানানো হয়েছিল।'

'স্ট্রেঞ্জ!'

'এবার রত্নগিরি জয়শঙ্খ,' বলল সোহেল। 'হ্যাঁ, এই শিল্পপতি ভদ্রলোক মল্লিকার কাকা। তবে তাঁর সম্পর্কেও একটা রহস্য আছে।'

'কি রকম?'

'প্রায় দু'বছর হলো জয়শঙ্খকে প্রকাশ্যে কোথাও দেখা যায়নি,' বলল রানা। 'শেষবার বিদেশে যাবার পর তিনি দেশে ফিরেছেন কি না, তা নিয়েও সন্দেহ আছে। যদি ফিরে থাকেন তো জাফনায় বা টাইগারদের দখল করা এলাকায় ফিরেছেন, কিন্তু ও-সব জায়গা থেকে নির্ভেজাল তথ্য পাবার কোন উপায় নেই। ভদ্রলোকের বেশিরভাগ ব্যবসা ও কারখানা কলম্বোয়, এখন সে-সব দেখাশোনা করছে নতুন চাকরি পাওয়া ম্যানেজাররা।'

'হুম।' রানা গম্ভীর ও চিন্তিত।

'এবার শোন,' কমপিউটর অফ করে বলল সোহেল, 'আমি কেন এসেছি। খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা তথ্য পাওয়া গেছে, জানা থাকলে তেল চুরির রহস্যটা বুঝতে সুবিধে হবে তোর।'

'বল।'

'বিরুপিল্লাই ভবনিয়া-র নাম শুনেছিস?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'তামিল টাইগারদের একজন লীডার?'

'সেকেন্ড ম্যান। বিরুপিল্লাই প্রভাকরণ-এর পরই তার স্থান। নামের মিল দেখে কিছু ধরে নিবি না, ওরা পরস্পরের আত্মীয় নয়। আমাদের পাওয়া তথ্যটা হলো, প্রকাশ্যে সুসম্পর্ক দেখা গেলেও, প্রভাকরণ আর ভবনিয়ার মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। ভবনিয়া গোপনে নিজস্ব একটা বাহিনী গড়ে তুলেছে, উদ্দেশ্য প্রভাকরণকে সরিয়ে টাইগারদের ওপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এবার একটা গুজব সম্পর্কে বলি। ব্ল্যাক মার্কেট থেকে প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ কিনছে ভবনিয়া, এবং দাম মেটাচ্ছে নগদ টাকায় নয়, সোনায়।'

'কেন?'

'এটাই গুজব–হঠাৎ তার হাতে অবিশ্বাস্য রকমের মোটা টাকা

এসেছিল, সেই টাকা দিয়ে সে নাকি এক হাজার টন সোনা কিনেছে।'

ঝট করে দাঁড়ানোয় রানার চেয়ারটা ছিটকে পড়ে গেল। 'হোয়াট! তারমানে কি...' ব্যাপারটা একাধারে অবিশ্বাস্য ও ভীতিকর, তাই কথাটা শেষ করারও সাহস হলো না।

'হ্যাঁ, তুই যে ভয় পাচ্ছিস, আমিও সেই একই ভয় পাচ্ছি,' গম্ভীর স্বরে বলল সোহেল। 'ওই পরিমাণ সোনা ব্ল্যাক মার্কেটে পাওয়া যাবে না। কবীর চৌধুরী আমেরিকার চোদ্দ হাজার টন সোনা ডাকাতি করেছিল, তার মধ্যে মাত্র সাত হাজার টন উদ্ধার করতে পেরেছিলি তুই, বাকি সাত হাজার টন কোথায় ছিল তা মাফিয়া চীফকেও সত্যি করে বলেনি কবীর চৌধুরী। গুজবটা শুনে মনে হচ্ছে, সত্যি যদি এই পরিমাণ সোনা ভবনিয়া কিনে থাকে, নিশ্চয়ই কবীর চৌধুরীর কাছ থেকেই কিনেছে।'

রানা উদ্বিগ্ন। 'দিস ইজ গেটিং মোর অ্যান্ড মোর সিরিয়াস। ভবনিয়ার সঙ্গে ওই উন্মাদ খুনীটার যোগাযোগ ঘটে থাকলে, সম্পর্কটা শুধু সোনা কেনা-বেচার মধ্যে থেমে থাকার কথা নয়। লাখ লাখ ব্যারেল তেল চুরি ফ্যানটাসটিক একটা আইডিয়া, আর ফ্যানটাসটিক বলেই সন্দেহ হয় এই ঘটনার সঙ্গে কোন জিনিয়াস সায়েন্টিস্ট জড়িত না থেকেই পারে না। এই বিপুল পরিমাণ তেল কেউ কোথাও তুলে রাখেনি যে লোকজনকে মারধর করে তাড়িয়ে দিয়ে কেড়ে নিতে পারবে। চুরি করতে হলে আগে তুলতে হবে, আর তোলার জন্যে চাই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে উর্বর কোন মস্তিষ্কের প্ল্যানিং। আমি ভয় পাচ্ছি, সোহেল—এই ষড়যন্ত্রে কবীর চৌধুরীকে বড় বেশি মানিয়ে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, আমি তোর সঙ্গে একমত,' বলল সোহেল। 'এবার লা মর্তে ল্যাম্পি প্রসঙ্গ। এই শিপিং লাইন্সের মালিকের পরিচয় আমরা জানতে পেরেছি।'

'কে?' চেয়ারটা তুলে ধীরে ধীরে বসল রানা।

'আল কাপু, ফ্রেঞ্চ মাফিয়া চীফ। তার নাম তো জানিসই, দুঁভো দ্যেতা চেরোকি। কিন্তু তার ছেলের নাম কি জানিস? ল্যাম্পি।'

'সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ হতে যাচ্ছে,' বলল রানা। 'বিরুপিল্লাই ভবনিয়ার পিছু নিয়ে মঞ্চে আগমন ঘটল কবীর চৌধুরীর। তৃতীয় অভিনেতা যদি ফ্রেঞ্চ মাফিয়া চীফ হয়, চতুর্থ নটবরটি কে?'

'মানে?'

'ফোরবল একটা প্রতিষ্ঠান, হেড অফিস জাফনায়। এই প্রতিষ্ঠানের নামে সুইস ব্যাংকে একটা অ্যাকাউন্ট আছে,' বলল রানা। 'চোরাই তেল পাবার পর ক্রেতারা ওই অ্যাকাউন্টে চেক পাঠাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, জানি।'

'ফোরবল মানে চারজন,' বলল রানা। 'আরেকজন তাহলে কে?'

'তাই তো! আরেকজন কে হতে পারে?'

'চতুর্থ পক্ষ কোন ব্যক্তি না-ও হতে পারে, সোহেল,' বলল রানা, একটু যেন অন্যমনস্ক।

'তোর এরকম মনে হবার কারণ?' নিজের অজান্তেই রানার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ল সোহেল।

'বস্ আমাকে বলেছেন,' স্মরণ করল রানা, 'বাংলাদেশের বিশাল একটা এলাকায় তেল আছে কিনা তা স্বাধীনতার পর জরিপ করে দেখা হয়নি। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে যে-সব জরিপ চালানো হয়েছিল, তার রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি, কাগজ-পত্র সব ইসলামাবাদে রয়ে গেছে। বহুবার চাওয়া হয়েছে, কিন্তু ওরা দেয়নি।'

'তারমানে তুই পাকিস্তানকে চতুর্থপক্ষ ভাবছিস?'

'পুরানো জরিপে যদি বলা হয়ে থাকে যে বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণে তেল আছে, তা একমাত্র পাকিস্তানেরই জানার কথা,' বলল রানা। 'এখন এই অতি মূল্যবান তথ্যটা যদি আইএসআই কাজে লাগিয়ে বিপুল পরিমাণ ফরেন কারেন্সি আয় করতে চায়, এর মধ্যে অবাক হবার মত কিছু আছে কি?'

'আই লাইক ইউ!' সোহেল উত্তেজিত ও উৎফুল্ল। 'এ-ব্যাপারে আমি তোকে সাহায্য করতে না পারলেও লিয়াকত নিশ্চয়ই পারবে।'

'লিয়াকত?' ভুরু কোচকাল রানা।

'আমাদের আরেকজন ইনফর্মার। ফয়সল আসলে এই লিয়াকতের দেয়া তথ্য নিয়েই পয়েন্ট পেড্রোতে তোর সঙ্গে দেখা করতে আসছিল।'

'সে-ও জাফনায় থাকে, এই লিয়াকত?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। সে আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লোক, রানা। আমরা তাকে জাফনা থেকে বের করে আনার ঝুঁকি নিতে পারি না। তোকেই তার কাছে যেতে হবে।' রানা কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলল সোহেল। 'জানি, জানি—জাফনায় ঢোকা খুব কঠিন, আরও কঠিন বেরিয়ে আসা। কিন্তু এ-ব্যাপারে আমরা তোকে কোন সাহায্যই করতে পারব না। এই কাজটা হয় তোকে নিজের চেষ্টায় করতে হবে, তা না হলে লিয়াকতের সঙ্গে দেখা করার চিন্তা বাদ দিতে হবে। কি করবি ভেবে দেখিস। ঠিকানাটা লিখে রাখ।'

গম্ভীর হলো রানা, ঠিকানাটা লিখে নিয়ে বলল, 'দেখি কি করা যায়।' তারপর জিজ্ঞেস করল। 'তুই আছিস ক'দিন?'

'কি বলিস, আজ রাতেই আমার ফ্লাইট। শোন, আরেকটা কথা। লিয়াকত ওখানে তার স্ত্রী আর দুই বাচ্চাকে নিয়ে থাকে।

তোকে খুব সাবধানে তার সঙ্গে দেখা করতে হবে। ওদের কাভার যেন নষ্ট না হয়।'

'ঠিক আছে। আমি তাহলে আমার মাস্টার কার্ড ভাঙিয়ে একটা ল্যানসিয়া কিনে দিই যমুনাকে, তুই খাতায় অফিসের খরচ দেখিয়ে টাকাটা আমাকে তুলে দিস?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সোহেল বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে, তবে তার আগে বসকে জানিয়ে অনুমতি নিতে হবে। আরেকটা কথা। তোর চোখে আরও কম দামী কোন গাড়ি পড়ে না? বারবার শুধু দামী গাড়িই ভাঙতে ইচ্ছে করে?'

'শুধু গাড়ি দেখলে কি চলে, সেটা কে চালাচ্ছে তাও দেখতে হয়,' বলল রানা, হাসছে। 'যমুনা সত্যি আশ্চর্য একটা মেয়ে।'

'যদি বলিস তো ফ্লাইটটা মিস করি, পরিচয় করিয়ে দে।'

'মারব শালা এক লাথ্!'

'কেন রে, এরই মধ্যে মজে গেলি নাকি?' সোহেল হাসছে।

হঠাৎ ম্লান দেখাল রানাকে। 'সত্যি কথা বলি? এ বড় কঠিন মেয়ে, বিশ্বাস কর। কেন জানি না, আমি একটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করছি।'

'স্পাই নয় তো?'

'স্পাই? কি জানি, হতেও পারে।'

'সাবধানে থাকিস,' বলল সোহেল। 'তবে যদি পটাতে পারিস, বলবি, লাইনে তোর পিছনে আমিও আছি...'

শার্টের আস্তিন গুটাচ্ছে রানা। 'কথাটা আরেকবার বল...'

সাদা ল্যানসিয়ার খোঁজে ট্যাক্সি নিয়ে কয়েকটা শো-রূমে ঢুঁ মারতে হলো। পকেট থেকে মাস্টার কার্ড বের করার সময় আঙুলে চাবিটা ঠেকল, অমনি লাফ দিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠল মল্লিকার মুখ। তার তরফ থেকে ওকে দেয়া এটা একটা বোনাসই

বলতে হবে–ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে একটা রাত মানকুলামে কাটিয়ে যাওয়া। এই মুহূর্তে ওর জরুরী কাজ হলো জাফনায় ঢোকার ভাল একটা উপায় খুঁজে বের করা, সে-কাজে গাফলতি না করেও মল্লিকার সঙ্গে দেখা করা যায়–কারণ সে-ই হয়তো ভাল কোন ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। একে তো স্থানীয় মেয়ে, তার ওপর বিখ্যাত। এ-ও ভুলো না যে রহস্যময়ী, নিজেকে মনে করিয়ে দিল রানা। তবে তার আগে ল্যানসিয়াটা যমুনাকে দিয়ে আসতে হবে।

যমুনা সম্পূর্ণ অন্য এক সেট চিন্তাধারার জন্ম দিল। তার সঙ্গে অত্যন্ত অল্প ও ব্যস্ত সময় কাটালেও, আচার-ব্যবহারে মেয়েটা যে দুর্লভ আভিজাত্য ও সফিসটিকেশন-এর পরিচয় দিয়েছে তা শুধু ওর বোধ ও বুদ্ধির ওপর নয়, শরীরের ওপরও প্রবল আবেদন সৃষ্টি করেছে।

মানবচরিত্র বিশ্লেষণে একজন এসপিওনাজ এজেন্টকে দক্ষ হতেই হয়, কারণ এই দক্ষতার ওপরই নির্ভর করে তার অস্তিত্ব থাকবে কি থাকবে না। এই মুহূর্তে যমুনা ও মল্লিকার চরিত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণ জরুরী বলে মনে না হলেও, দু'জনের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য রানার কাছে প্রায় অনায়াসেই ধরা দিল। দু'জনের কেউই খোলা বই নয়। যমুনা যদি নদী হয়, ধরে নেয়ার যথেষ্ট কারণ আছে যে সে নদীর গভীরতা সাগরের মত, ফলে চিত্তকে তা আকর্ষণ করে, মনে জাগায় প্রফুল্ল ভাব, একই সঙ্গে আদায় করে নেয় সমীহ। আর মল্লিকা যদি ফুল হয়, সে ফুল যতই সৌরভে সুবাসিত হোক না কেন, এমন সন্দেহ করার কারণ আছে যে তাতে বিষাক্ত কীটের দাঁত পড়েছে, ফলে তার প্রতি করুণা আর সহানুভূতিই জাগে, ভয় হয় অসময়ে না শুকিয়ে যায়।

তবে কাকতালীয় ব্যাপার হলো, দু'জনের নামের মিলটা; যমুনার আরেকটা নাম হাসনা-হেনা–জাপানি শব্দ হাস্-উ-নো হানা থেকে এসেছে, যার অর্থ পদ্মফুল।

তেইশ বন্দরনায়েক রোড শহরের মাঝখানে অভিজাত এলাকা। পাড়ার ভেতর রাস্তাগুলো পাকা ও নির্জন। এদিকে উচ্চবিত্ত লোকজনের বসবাস। তেইশ নম্বর ফ্ল্যাটবাড়িটা খুঁজে পেতে কোন অসুবিধে হলো না। লোহার গেট খোলা দেখে গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে ঢুকল রানা, পাশের দেয়ালে কালো বোর্ডে সাঁটা রয়েছে নেমপ্লেট। যমুনা বা হাসনা-হেনার নামে কোন নেমপ্লেট নেই দেখে ভুরু কোঁচকাল রানা। তবে হাসনা বানু নামে একটা নেমপ্লেট রয়েছে। নামের নিচে কলিংবেল থাকলেও সেটা না বাজিয়ে গাড়িতে ফিরে এল ও, প্রতিশ্রুতি অনুসারে হর্নই বাজাল—দেখা যাক হাসনা বানুই যমুনা কি না।

হর্নটা তিনবার বাজাতে হলো। অবশেষে উজ্জ্বল দুপুরটাকে বর্ণালি ছটায় উদ্ভাসিত করে দিয়ে দোতলার ঝুল-বারান্দায় উদয় হলো রমণী অপরূপা। শাড়ি পেঁচানো কাঠামো, উত্থান-পতন ও ভাঁজ-খাঁজগুলো স্পষ্ট। রানাকে হতাশ করে দিয়ে যমুনা এতটুকু বিস্মিত হলো না। তবে তার বদলে যে হাসিটা হাসল, ভুবন ভোলানো না বলে উপায় নেই, রানার বুকের রক্ত যেন ছলকে উঠল। কিছু বলার সুযোগ পাওয়া গেল না, একটা আঙুল দেখিয়ে ওকে অপেক্ষা করতে বলে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

এক মিনিট পর গেট দিয়ে বেরিয়ে এল যমুনা।

'তুমি অবাক হওনি,' বলল রানা।

'এখন হলাম, কারণটাও পরিষ্কার,' জবাব দিল যমুনা, হাসিটা এখনও লেগে আছে ঠোঁটে। 'এত তাড়াতাড়ি তোমাকে আমি আশা করিনি।'

'এ-কথা তোমার একবারও মনে হয়নি যে আমি প্রবঞ্চক, ক্ষতিপূরণ করতে আসবই না?'

চোখের বিশাল পাতাগুলো প্রজাপতির ডানার মত ঘন ঘন খুলল আর বন্ধ হলো, সরলতার এমন প্রকাশ সচরাচর দেখা যায়

না। 'দেরিতে হলেও মানুষটাকে আমার চিনতে ভুল হয়নি,' জবাব দিল যমুনা। 'তা না হলে কি গুণ্ডা বলার পর দুঃখ প্রকাশ করতাম?'

গাড়ির চাবিটা বাড়িয়ে দিল রানা। 'ওটা ব্যবহার করতে দিয়েছিলে, সেজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। কাগজ-পত্র সব ড্যাশবোর্ডে পাবে।' নিজের সুটকেস ও ব্রীফকেস গাড়ি থেকে বের করে ফুটপাথে রাখল।

এক চক্কর ঘুরে গাড়িটা দেখল যমুনা। 'বড় আপা সত্যি খুশি হবে। ধন্যবাদ, রানা।' ভুরু জোড়া সামান্য একটু কুঁচকে আছে। 'কিন্তু আমি শুধু মানুষটার একটা দিকের পরিচয় পেলাম, সব দিক বিবেচনা করলে এখনও তুমি আমার কাছে একটা ধাঁধা। তুমি কি, হে?'

'যদি সুযোগ ও সময় হয়, তোমার এ-প্রশ্নের উত্তর আরেকদিন দেব,' বলল রানা। 'তবে প্রসঙ্গত বলি, তুমিও আমার কাছে একটা রহস্য।'

'আরেকদিন কবে?'

'সেটা বলা কঠিন। তবে অবশ্যই আমি যোগাযোগ করব।'

'আমি ফিল্ড অফিসার, মনে আছে?' জিজ্ঞেস করল যমুনা। 'এক হপ্তা আছি এখানে, তারপর আরেক শহরে চলে যেতে হবে। তবে কৌতূহলটা এতই বেশি যে ঝোঁক চাপছে তোমার জন্যে ছ'মাস অপেক্ষা করি।'

'প্রশ্নটা এবার আমাকেও করতে হয়–তুমি কি, হে? তোমার উদ্দেশ্য যদি আমাকে প্ররোচিত করা হয়, অবশ্যই সফল হয়েছ। কিন্তু আমার হাতে জরুরী কাজ রয়েছে, হাসনা বানু, তা না হলে...'

'ও, আচ্ছা, ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছ যে আমি গোমাংসের ভক্ত...'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল রানা।

‘চাই না ভুল বোঝাবুঝির কোন অবকাশ তৈরি হোক, তবে,’ রানা থামতে বলল যমুনা, ‘যার আসার অপেক্ষায় অনেকদিন ধরে বসে আছি, মনে হচ্ছে তুমি সেই মানুষটি হতে পারো।’

‘এরকম মনে হবার কারণ?’

‘সেটা ব্যাখ্যা করার সুযোগ এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে তুমি আমাকে দিচ্ছ কোথায়!’

‘সত্যি দুঃখিত, জরুরী কাজ...’

‘তোমার মত পুরুষের জীবনে জরুরী কাজ একটাই থাকতে পারে,’ রানাকে থামিয়ে দিয়ে বলল যমুনা, ‘কোন ফাঁদে ধরা পড়া।’

প্রায় চমকে উঠল রানা। ‘ঠিক কি বলতে চাও?’

‘আমি মেয়ে বলেই জানি, রানা, তোমার জন্যে সবাই ওরা ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছে। তবে নিজেকে আমি ওদের চেয়েও যোগ্য বলে মনে করি, তাই প্রতিযোগিতায় ভয় পাই না। যাচ্ছ যাও, আমি বাধা দেব না। শুধু এইটুকু বলি, সাবধানে থেকো। সে যাই হোক, তার মায়ার ছলনায় তুমি ভুলো না।’

রানা ঠিক বুঝতে পারছে না কথাগুলো যমুনা প্রতীকী অর্থে বলছে, নাকি ঠারেঠোরে আরও স্পষ্ট কোন ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে কথা আর না বাড়িয়ে বিদায় নিল ও।

এবার যমুনা হাত নাড়ল, সেটাকে ছোট্ট একটা ঢেউ-এর সঙ্গে তুলনা করা চলে, হাতের সামান্য ঝাঁকি বা কম্পন। এই রাস টানা ভঙ্গি শুধু যেন যমুনাকেই মানায়। ট্যাক্সি নিয়ে মল্লিকার ফ্ল্যাটে যাবার পথে রানার মনে ভাল লাগার একটা মধুর অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল।

এসপিওনাজ যতটা ভয়ঙ্কর, ঠিক ততটাই নোংরা একটা খেলাও বটে। এই খেলায় যখনই কোন নিরীহ মানুষকে জড়াতে বাধ্য হতে হয়, রানা নিজেকে অপরাধী না ভেবে পারে না। প্রায়ই

এটা জরুরী প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়, অথচ বিবেকের দংশন কখনোই ওকে রেহাই দেবে না। এটা যে জীবনকে দেখার পুরানো একটা দৃষ্টিভঙ্গি, রানা তা জানে। এ প্রসঙ্গে ওর বস্ রাহাত খান একবার ওকে বলেছিলেন, 'নিরীহ বলে এখন আর কেউ নেই। এই যুগে সবাই জড়িত। কেউ সচেতন, বেশির ভাগই অনুধাবন করে না, কিন্তু তবু তারা সবাই জড়িত।'

অনেকক্ষণ হেঁটে অবশেষে মল্লিকার ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে পৌঁছাল রানা। নেমপ্লেট দেখে জানা গেল সে আটতলার একটা ফ্ল্যাটে থাকে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে নক করার সিদ্ধান্ত নিল ও। চাবিটা আসলে ওকে দেয়া হয়েছে সম্মান দেখিয়ে।

ছয়

এখানে ঠিক উল্টোটা ঘটল। রানাকে দেখে অবাক হবার কথা নয় মল্লিকার, কিন্তু দরজা খুলে এমন হাঁ করে তাকিয়ে থাকল যে, রানা বিব্রত না হয়ে পারল না। বিদ্রূপের সুরে কিছু বলতে যাবে, সময় পাওয়া গেল না। চোখ-মুখ ফুলে আছে, চোখের পাতা ভেজা ভেজা, বোধহয় কাঁদছিল মল্লিকা; হঠাৎ প্রায় রানার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, শক্ত করে জড়িয়ে ধরে কাঁধে মুখ ঘষল—সম্ভবত চোখের পানি মুছছে।

'তুমি আমাকে চাবি দিয়েছিলে, তাই না?' মল্লিকা পিছু হটতে জিজ্ঞেস করল রানা, একটু কঠিন সুরেই। এখনও তার চোখ

থেকে বিস্ময়ের ভাবটা কাটেনি।

'হ্যাঁ, কিন্তু ভুলেও ভাবিনি যে আবার তোমাকে দেখতে পাব,' বলে রানাকে টেনে ফ্ল্যাটে নিয়ে এল মল্লিকা।

'কেন?' রানা গম্ভীর, সুটকেস ও ব্রীফকেস মেঝেতে নামিয়ে রাখল।

চিন্তা করছে মল্লিকা, যেন উত্তরটা তৈরি করতে হচ্ছে। 'কেন মানে? তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করোনি? একবার নক করে সাড়া না পাওয়ায় কি করে আমি আশা করব ঋণ শোধ করার আরেকটা সুযোগ দেয়া হবে আমাকে?'

উত্তরে রানা বলল, 'প্রথম কথা, আমার কাছে তোমার কোন ঋণ নেই। দ্বিতীয় কথা, আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিনি।'

'তাহলে বোধহয় আমারই ভুল হয়েছে–নকটা আরও জোরে করা উচিত ছিল।'

'তুমি ঋণ শোধ করতে চাইছ, এটা বুঝতে পেরেই আমি ঘুমের ভান করে পড়ে ছিলাম,' বলল রানা। 'যদি বুঝতাম আমাকে তোমার ভাল লেগেছে, অন্তরের টানে কাছে আসতে চাইছ, ঠিকই সাড়া দিতাম।'

চোখ দুটো আবার ভিজে উঠল মল্লিকার, এগিয়ে এসে আবার রানাকে আলিঙ্গন করল; এবার সম্পূর্ণ অন্য এক ভঙ্গি–ধীরে ধীরে কোমল মমতায় বুকে টেনে আদরে চুমোয় ভরিয়ে দিল। তারপর বলল, 'তুমি ফিরে আসায় আমি খুশি। কতটা খুশি বলে বোঝাতে পারব না।'

'আমি আসার আগেও তুমি কাঁদছিলে,' বলল রানা। 'কারণটা আমাকে বলা যায়?'

'শুধু এইটুকু যে,' রানার দিকে পিছন ফিরল মল্লিকা, 'তোমাকে নিয়ে একটা ফ্যান্টাসীতে ভুগছি আমি। তার মধ্যে অনেক রকম কষ্ট আর দুঃস্বপ্ন আছে। এর বেশি কিছু জানতে

চেয়ো না।’

‘এটা তাহলে আমার ভুল ধারণা যে তুমি আমাকে কিছু বলতে চাও?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘আমি বড় একা, রানা।’ ধীরে-ধীরে ঘুরল মল্লিকা। ‘বড় অসহায়। ব্যস, এইটুকুই, আর কিছু বলার নেই আমার।’

‘তবু আরেকবার চিন্তা করতে বলি,’ নরম সুরে অনুরোধ করল রানা। ‘সব কথা আমাকে বললে আমি হয়তো তোমাকে সাহায্য করতে পারব।’

‘কে বলল, আমার সাহায্য দরকার? তাছাড়া, তুমি কি আমার মা-বাবা ও ভাইবোনকে ফিরিয়ে দিতে পারবে?’ হেসে উঠল মল্লিকা, সেটা যেন কান্নারই নামান্তর। এক পা এগিয়ে রানার হাত ধরল। ‘এ-সব কথা বাদ দাও। বরং বলো, তোমাকে আমি কতক্ষণের জন্যে পাচ্ছি?’

‘আমার কাজ আছে, মল্লিকা, বেশিক্ষণ থাকতে পারব না।’

‘তাহলে এসো, এই অল্প সময়টুকু আমরা স্মরণীয় করে রাখি?’ রানার বুকে হাত ঘষছে মল্লিকা। ‘প্রথমে খেয়ে নিই, এসো। একার জন্যেই রেঁধেছি, তবে তোমারও হয়ে যাবে।’ রানার হাত ধরে কিচেনে চলে এল সে। ছোট্ট একটা গোল টেবিলে মুখোমুখি বসল ওরা।

খেতে বসে আজ সকালে বাচ্চাদের ট্রেনিং সেন্টারে কি কি মজার ঘটনা ঘটেছে বর্ণনা করল মল্লিকা, তারপর জানতে চাইল রানার সময়টা কিভাবে কাটল। রানা বলল, সরকারী অফিস থেকে তথ্য নিয়ে সিঙ্গাপুরে রিপোর্ট পাঠাতে ব্যস্ত ছিল দুপুর পর্যন্ত। মল্লিকার ব্লাউজের দুটো বোতাম খোলা থাকায় ব্রেসিয়ার থেকে উপচে বেরিয়ে আসা স্তনযুগল বারবার দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছে। খাওয়া শেষ হতে কফি পরিবেশন করল সে, তবে নিজে নিল বিয়ার। কফির কাপটা খালি হতে মল্লিকা বলল, ‘তোমার বোধহয় বিশ্রাম

দরকার। চলো, তোমাকে বেডরূমে দিয়ে আসি।'

তার পিছু নিয়ে মল্লিকার বেডরূমে ঢুকল রানা। ফার্নিচার বলতে একটা ড্রেসিং টেবিল, একটা চেয়ার, সিঙ্গেল একটা খাট। পরিপাটি করে সাজানো বিছানা। খাটের পাশে ছোট একটা টেবিল। টেবিলে ফ্রেমে বাঁধানো একটা গ্রুপ ফটো। ফ্রেমটা হাতে নিয়ে দেখল রানা। বয়স্ক এক দম্পতি, সঙ্গে আট ও দশ বছরের দুই ছেলেমেয়ে। 'এরা তোমার মা-বাবা ও ভাইবোন, তাই না?'

স্থির হয়ে গেছে মল্লিকা। ম্লান সুরে বলল, 'হ্যাঁ।'

'তুমি ঠিক জানো, যুদ্ধে মারা গেছে সবাই?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'মানে, জানতে চাইছি–মৃত্যুর খবরটা শুধু শুনেছ, নাকি প্রমাণও পেয়েছ যে ওরা মারা গেছে?'

'হঠাৎ তুমি আমাকে এ-কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?' মল্লিকার চোখে কেমন যেন একটা সন্দেহ। সন্দেহ, নাকি ভয়?

'যুদ্ধে গত বছর কতজন মারা গেছে, তাদের মধ্যে নামকরা কেউ আছে কিনা, এই সব জানার জন্যে সরকারী অফিসে যেতে হয়েছিল আমাকে,' বলল রানা। 'নিহতদের তালিকায় তোমার মা-বাবার নাম আছে কিনা জিজ্ঞেস করলাম ওদেরকে। ওরা বলল, ওদের মৃত্যুর খবর কোন সংবাদ সংস্থা সমর্থন করেনি।'

'সমর্থন করার প্রশ্নও ওঠে না,' বলল মল্লিকা। 'ওরা মারা গেছে জাফনায়, আর জাফনায় কোন সাংবাদিক ঢুকতে পারে না। খবরটা এলটিটি-ই আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জানিয়েছিল।'

'ব্যাপারটা অদ্ভুত নয়?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'যুদ্ধে তো আরও বহু লোকজন মারা যাচ্ছে, ওরা কি সবার আত্মীয়স্বজনদের জানাচ্ছে?'

ম্লান একটু হাসল মল্লিকা। 'না, অদ্ভুত নয়, রানা,' বলল সে। 'আমাকে খবরটা জানাবার পিছনে একটা বিশেষ কারণ ছিল ওদের। তামিল টাইগারদের বক্তব্যঃ সরকারী সৈন্যদের গুলিতেই

মারা গেছে ওরা। এই খবরটা দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আমাকে বিবৃতি দেয়ার অনুরোধ করে এলটিটি-ই, সেই সঙ্গে এও বলে যে আমি যেন সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে আন্তর্জাতিক কোন প্রতিযোগিতায় ভবিষ্যতে অংশগ্রহণ না করি। গোটা ব্যাপারটাকে ওরা নিজেদের পক্ষে প্রচারণার কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিল।'

ফটোটা টেবিলে রেখে দিল রানা। মল্লিকার ব্যাখ্যায় যুক্তি আছে। তবে তার মধ্যে সত্যতা কতটুক আছে বলা মুশকিল। 'বেশ, খবরটা ওরা তোমাকে জানাল,' বলল ও। 'কিন্তু তুমি প্রমাণ ছাড়া ওদের কথা বিশ্বাস করলে কেন?'

কাঁধ ধরে ঠেলে রানাকে বিছানায় বসিয়ে দিল মল্লিকা। 'এত বকবক না করে, বিশ্রাম নাও,' বলল সে, তারপর প্রায় জোর করেই শুইয়ে দিল বিছানায়, পায়ের জুতো খুলছে।

'এটা কি হচ্ছে?' পা টেনে নেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো রানা।

'যস্মিন দেশে যদাচার,' বলল মল্লিকা। 'সিংহলী মেয়েরা অতিথিদের এভাবেই সেবা করে।' রানার গায়ে একটা চাদর টেনে দিল, তারপর দরজার দিকে রওনা হলো। 'আসছি।'

এক মিনিটও হয়নি, ফিরে এল মল্লিকা, রানার সুটকেস ও ব্রীফকেস দরজার পাশে নামিয়ে রেখে বলল, 'প্রমাণ ছাড়া খবরটা বিশ্বাস করেছি, এ-কথা ঠিক নয়, রানা। সবগুলো লাশ এক জায়গায় জড়ো করে ফটো তুলেছিল ওরা, চিঠির ভেতর সেই গ্রুপ ফটোটাও ছিল। আমার পরিবার সম্পর্কে এতটা আগ্রহ দেখানোর জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ, রানা। তবে এ প্রসঙ্গের এখানেই ইতি।' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল। 'দরজাটা বন্ধ করে যাচ্ছি, কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না...'

'কিন্তু আমি তো আশা করে আছি কেউ নক করবে,' বলল রানা।

উত্তরে কিছু না বলে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল মল্লিকা।

নক হলো, তবে আধঘণ্টা পর।

বাথরূম থেকে ফিরে এসে কাপড় পরল মল্লিকা, বিছানার কিনারায় বসে বলল, 'আমার এই অনুরোধটা রাখা যায় না? অন্তত আজ রাত আর কালকের দিনটা আমার কাছে থাকো তুমি।'

'সত্যি সম্ভব নয়,' বলল রানা। 'কাল সকালে জরুরী কাজ আছে আমার। জাফনায় যেতে হবে, কিন্তু কিভাবে যাব এখনও বুঝতে পারছি না।'

'জাফনায় যেতে চাও?' হঠাৎ কেমন যেন মনোযোগী দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল মল্লিকা। 'কেন?'

'ওখানে স্থানীয় একজন রিপোর্টারের সঙ্গে দেখা করব,' মিথ্যে কথা বলল রানা। 'কিন্তু লোকজন বলছে, টাইগাররা চেক পয়েন্টে আটকে দেবে, ঢুকতে দেবে না।'

'তোমাকে অন্তত আজ রাতটা কাছে পাবার একটা উপায় পাওয়া গেছে,' বলল মল্লিকা। 'জাফনায় তুমি কাল সকালে যেতে চাও তো? দাঁড়াও, সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমি।'

'কিভাবে?'

'আমার মামাতো ভাই বিজয়সিংহ প্রতিদিন মুরগির ডিম সাপ্লাই দিতে যায় ওখানে,' বলল মল্লিকা। 'ওর ট্রাকে একজন হেলপার থাকে। আমি তাকে ওই হেলপারের বদলে তোমাকে নিয়ে যেতে বলব। টাইগাররা জানে বিজয়ের সঙ্গে সব সময় একজন হেলপার থাকে। আমি বললে বিজয় রাজি না হয়ে পারবে না, কারণ এই ব্যবসার পুঁজি আমিই তাকে দিয়েছি।'

'বাহ্, তাহলে তো ভালই হলো,' বলল রানা।

ওর ওপর ঝুঁকে টেবিলের দিকে হাত বাড়াল মল্লিকা,

ক্রেডলসহ ফোনটা তুলে নিজের কোলের ওপর রাখল। ডায়াল করল দ্রুত। 'ওর বেশ বড় একটা মুরগির খামার আছে, আশা করি অফিসে এখন পাব ওকে।' দশ সেকেন্ড পর অপরপ্রান্তে মামাতো ভাই বিজয় রিসিভার তুলল। 'হ্যাল্লো, বিজয় দা? শোনো, দাদা, আমি মল্লিকা। হ্যাঁ, ভালই আছি। তবে আমার একটা উপকার করতে হবে। আমার এক বিদেশী বন্ধু কাল জাফনায় বেড়াতে যেতে চান...হ্যাঁ, বেড়াতে...হ্যাঁ, এই মুহূর্তে তিনি আমার সঙ্গে রয়েছেন। কথায় কথায় আমি ভদ্রলোককে বললাম যে বিজয়দা তার হেলপারের বদলে আপনাকে জাফনায় নিয়ে যেতে পারবে...হ্যাঁ, বিদেশী, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ তো নন...না, কে বলল সিংহলী বলে চালানো যাবে না?' এরপর দীর্ঘ প্রায় এক মিনিট কোন শব্দ না করে শুধু শুনে গেল মল্লিকা। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, সেটাই সবচেয়ে ভাল। বললাম তো, ভদ্রলোককে আমি বলেছি আমার মামাতো ভাই বিজয় মুরগির খামার করে, ডিম সাপ্লাই দেয়ার জন্যে প্রতিদিনই ট্রাক নিয়ে জাফনায় যেতে হয় তাকে। সঙ্গে একজন হেলপার থাকে, তার বদলে...হ্যাঁ, বেশ, তাহলে সেই কথাই রইল, তোমার ট্রাকটা খুঁজে নেবেন তিনি। হ্যাঁ, গুড। বুঝেছি। উনি ওখানে ঠিক সময়ে থাকবেন। তুমি ব্যাপারটা বুঝেছ তো? ভদ্রলোককে শুধু জাফনায় পৌঁছে দেবে। তারপর নিজের কাজে চলে যাবেন তিনি। ধন্যবাদ, বিজয়দা। রাখি তাহলে।' রিসিভার রেখে দিল সে, তারপর টেলিফোন সেটটা রানার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ল। 'তোমার সঙ্গে কথা আছে, তবে তার আগে কফি বানিয়ে আনি।' এক ছুটে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

দু'কাপ কফি বানাতে যতক্ষণ লাগার কথা, তারচেয়ে অনেক বেশি দেরি করে ফিরল মল্লিকা। তবে দেরির কারণটা জিজ্ঞেস করার দরকার হলো না। ম্যাক্সি ও ব্লাউজের বদলে শাড়ি পরেছে

সে, চুল আঁচড়ে ক্লিপ দিয়ে আটকেছে, সামান্য মেকআপও ব্যবহার করেছে মুখে। বিছানায় নয়, রানার হাতে একটা কাপ ধরিয়ে দিয়ে চেয়ারটায় বসল। 'কথা দিতে হবে, জাফনা থেকে কালই যদি ফিরে আসো, সরাসরি আমার কাছে আসবে। ঠিক আছে?'

'অসুবিধে কি, আসব।'

'খুব সকালে রওনা হতে হবে তোমাকে, কারণ জাফনা এখান থেকে অনেক দূরের পথ,' বলল মল্লিকা। 'লঙ্কেশপুরী গেট চেনো? ওই গেট আধ মাইল দূরে থাকতে রাস্তার বাম দিকের ফুটপাথে সকাল ঠিক ছ'টায় অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে। ট্রাকে বিজয়ের নাম লেখা থাকবে, কাজেই চিনতে কোন অসুবিধে হবে না। তবে তোমার কিন্তু সুট পরা চলবে না। সেকেন্ডহ্যান্ড মার্কেট থেকে পুরানো ট্রাউজার আর শার্ট কিনে পরতে হবে। কখন কিভাবে ফিরবে, বিজয়ের সঙ্গে আলাপ করে নিয়ো। সে সাধারণত বিকেলের দিকে জাফনা থেকে বেরিয়ে আসে, মানকুলামে পৌঁছাতে রাত দশটা-এগারোটা বেজে যায়।'

'সেটা কোন সমস্যা নয়,' বলল রানা। 'অসংখ্য ধন্যবাদ, মল্লিকা। অনেক ঝামেলা থেকে বেঁচে গেলাম আমি। চলো, বাইরে থেকে ঘুরে আসি। ডিনারও খাওয়া হবে, সেকেন্ডহ্যান্ড মার্কেট থেকেও একবার ঘুরে আসা হবে।'

'তুমি একা যাও, রানা, তাড়াতাড়ি মার্কেট থেকে ঘুরে আসো,' বলল মল্লিকা। 'বাইরে ডিনার খাওয়ার কথা ভুলে যাও, কারণ সাতটা থেকে কারফিউ। কি খেতে পছন্দ করো বলো, আমি রাঁধতে বসি।'

রানা আশা করেছিল সকালে মল্লিকা ওর ঘুম ভাঙাবে। কিন্তু ঘুম ভাঙল ড্রইংরূম থেকে ভেসে আসা অ্যালার্মের শব্দে। বালিশের

তলায় হাত চলে গেল, পিস্তলটা জায়গামতই আছে। বিছানা থেকে নেমে ড্রইংরুমের দিকে এগোল, অস্ত্রটা গুঁজে রাখল কোমরে। টেবিল ঘড়িতে পাঁচটা বাজে। অ্যালার্ম বন্ধ করে জানালার পর্দা সরাল, ডিভানটা খালি দেখে মল্লিকার নাম ধরে ডাকল কয়েকবার। কোন সাড়া নেই। তারপর টেবিলের ওপর চোখ পড়তে চিরকুটটা দেখতে পেল। তাতে ইংরেজিতে লেখা–'দৌড়াতে গেলাম। মল্লিকা।'

দাড়ি কামাবার সময় কাল রাতের কথা স্মরণ করল রানা। খাওয়াদাওয়ার পাট শেষ করে বেডরুমেই শুয়েছিল মল্লিকা, কিন্তু রাত বারোটার দিকে বিছানা থেকে নেমে ড্রইংরুমে চলে যায়, কারণ হিসেবে বলে একা না শুলে তার ঘুম আসে না। পিছু নিয়ে রানাকে চৌকাঠ পর্যন্ত আসতে দেখে সে ভেবেছিল, ও বোধহয় তাকে বিছানায় ফেরার জন্যে অনুরোধ করবে। কিন্তু না, রানা কোন অনুরোধ করেনি। শুধু বলেছে, দরজা খোলা রাখলে ওরও ঘুম আসে না। মল্লিকার অনুমতি পাবার অপেক্ষায় থাকেনি ও, দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছে।

যেখানেই ঘুমাক রানা, বিশ্বস্ত বন্ধুর মত ওকে পাহারা দেয় ষষ্ঠইন্দ্রিয়; তাছাড়াও দুটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং একটি অন্তরিন্দ্রিয় ঘুমের মধ্যেও সাহায্য করে। অস্পষ্ট কোন শব্দ পেলে কান সঙ্গে সঙ্গে তা মস্তিষ্কে পাঠিয়ে দেয়। যে-কোন অপ্রত্যাশিত গন্ধ পেলে নাকও তাই করে। মনের কাজ অবশ্য সম্পূর্ণ আলাদা; হাজারটা ফলস অ্যালার্ম বাজালেও ঘুমটা ভাঙতে দেয় না, কিন্তু ষষ্ঠইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যোগাযোগটা এত শক্তিশালী যে সত্যিকার বিপদ পুরোপুরি উপস্থিত হবার আগেই টের পেয়ে যায়, এবং তখন প্রয়োজনে এমনকি ঘুমন্ত মানুষটাকে বিছানায় উঠে বসতে বাধ্য করে।

সেকেন্ডহ্যান্ড মার্কেট থেকে কেনা প্যান্ট-শার্ট পরে পায়ে

স্যান্ডেল গলাল রানা, মাথায় চাপাল কালো একটা সুতি ক্যাপ। এই ক্যাপটা মল্লিকার বুদ্ধিতে কেনা; শ্রীলঙ্কায় বাস বা ট্রাকের হেলপাররা খুব পরে এটা।

সুটকেস ও ব্রীফকেস মল্লিকার ফ্ল্যাটে রেখে যাচ্ছে রানা, জাফনা থেকে ফিরে হোটেলে ওঠার আগে নিয়ে যাবে। চেক পোস্টে ওকে সার্চ করা হতে পারে, জানা সত্ত্বেও ওয়ালথারটা সঙ্গে নিচ্ছে, ইচ্ছে বিজয়সিংহকে না জানিয়ে ট্রাকের কোথাও লুকিয়ে রাখবে।

লিয়াকতের ঠিকানাটা মুখস্থ করার পর কাগজটা কালই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে রানা। মল্লিকার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে লঙ্কেশপুরি গেটের দিকে পায়ে হেঁটে এগোল ও। গেটটা অনেক দূর থেকে দেখা যায়, আন্দাজ মত আধমাইল থাকতে বাম দিকের ফুটপাথে থামল ও। ছ'টা বাজতে চলেছে, রাস্তা এখনও প্রায় ফাঁকা। রাস্তার ওপারে একটা বাসস্ট্যান্ড, শুধু ওখানেই দু'চারজন লোক দেখা যাচ্ছে। রানা নিশ্চিত, ওর পিছু নিয়ে কেউ আসেনি। রাস্তার ওপারে যারা রয়েছে তাদের মধ্যে কেউ ওর ওপর নজর রাখছে, এমনটিও মনে হলো না। সোহেলের ভাষ্য অনুসারে, ইনফর্মার হিসেবে লিয়াকত অত্যন্ত মূল্যবান, তার কাভার কোনভাবে নষ্ট করা যাবে না; তাছাড়া, স্ত্রী ও দুই বাচ্চাকে নিয়ে জাফনায় থাকে সে, কাজেই তাদের নিরাপত্তার দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

অপেক্ষা করতে হলো না, কাঁটায় কাঁটায় ঠিক ছ'টায় একটা বাঁক ঘুরে মেইন রোডে বেরিয়ে এল তিন টনী ট্রাকটা, গায়ে বহুরঙা মুরগি ও ঝুড়িভর্তি সাদা ডিম আঁকা। ট্রাকের পিছনে প্লাস্টিকের ট্রেগুলো একটার ওপর একটা সাজানো। মাপমত গর্ত করা ট্রে, প্রতিটি খোপে একটা করে ডিম রাখা। মেঝেতে খড় বিছানো আছে, ঝাঁকি লেগে কোন ডিম পড়ে গেলেও যাতে না

ভাঙে।

ফুটপাথ থেকে নেমে এগোচ্ছে রানা, মল্লিকার মামাতো ভাই ঝুঁকে ক্যাবের দরজা খুলে দিল। রানা ইচ্ছে করেই থামল না, ট্রাকের পিছনে এসে খড়ের ভেতর গুঁজে রাখল পিস্তলটা। চারদিকে দ্রুত আরেকবার চোখ বোলাল। কেউ এদিকে তাকিয়ে নেই।

বিজয়সিংহ গলা চড়িয়ে জানতে চাইল, 'কোথায় গেলেন?'

ক্যাবে উঠে তার পাশে বসল রানা। 'আপনাদের ডিমের সাইজটা দেখলাম। সিঙ্গাপুরে আমরা এতবড় ডিম পাই না।' লক্ষ করল, বিজয়সিংহের মাথায়ও একটা সুতি ক্যাপ রয়েছে, তবে সেটা সাদা। 'লিফট দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ, মি. সিংহ।'

'আমার ওই ফুফাতো বোনটা!' হাসিমুখেই বলল বিজয়সিংহ। 'অন্যের সমস্যা নিজের কাঁধে তুলে নেয়াটা ওর একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। দেখুন, আমি আপনার নামও জানতে চাই না, কোত্থেকে এসেছেন তা-ও শুনতে চাই না। আমার কাজ একটাই, নিজের চরকায় তেল দেয়া।'

লোকটার বয়স হবে চল্লিশের কাছাকাছি। বেশ হাসিখুশি মানুষ, তবে চোখে-মুখে চতুর একটা ভাব আছে।

আধমাইল পেরিয়ে এসে দেখা গেল চেক পয়েন্টে যানবাহনের বেশ লম্বা লাইন তৈরি হয়েছে। বেশির ভাগই পণ্যবাহী ট্রাক, তবে পনেরো বিশটা প্রাইভেট কারও রানার চোখে পড়ল। একদল সৈন্য প্রচুর সময় নিয়ে কাগজ-পত্র পরীক্ষা করছে। আরেক দল বেছে বেছে কয়েকটা কার ও ট্রাক সার্চ করছে।

'এখানে এরা নেহাতই বাজে সময় নষ্ট করছে, বুঝলেন,' হঠাৎ মন্তব্য করল বিজয়সিংহ।

'কি রকম?' রানা কৌতূহলী।

'এখান থেকে জাফনা প্রায় একশো চল্লিশ মাইল দূরে,' ব্যাখ্যা

করল বিজয়সিংহ। 'মাঝখানের এই পুরো জায়গাটা কখনও সরকারী সৈন্যরা নিয়ন্ত্রণ করে, কখনও তামিল টাইগাররা। এই চেক পোস্টে কড়াকড়ি দেখলেই বুঝতে হবে, এলাকাটা টাইগারদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। সৈন্যরা কাউকে যদি তামিল বলে সন্দেহ করে, আটকে দেবে। কিন্তু তামিলরা এত বোকা নয় যে এই চেক পোস্ট দিয়ে নিজেরা পণ্য নিয়ে জাফনায় যাবে। তারা আমাদের মত অতামিলদেরকে কাজে লাগায়। আমরাও দুটো বেশি পয়সা পাবার আশায় ওদেরকে সাহায্য করি।'

স্বজাতির স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করা বেঈমানী নয় তো কি, রাষ্ট্রদ্রোহিতাও বটে, অথচ লোকটা নিজের অপরাধ নির্দ্বিধায় স্বীকার করছে। বোঝা গেল, রানা কি ভাবল না ভাবল তাতে তার কিছু আসে যায় না।

বিজয়সিংহকে তামিল বলে সন্দেহ করা হয়নি, কাজেই তার ট্রাক সার্চ করা হলো না। চেক পোস্ট পেরিয়ে এসে হাইওয়ে ধরে ফুল স্পীডে ছুটল ছোট ট্রাকটা। পথে আরও কয়েকটা চেক পোস্ট পড়ল, সবগুলোই টাইগারদের। বিজয়সিংহকে তারা চেনে, ফলে তার ট্রাক সার্চ করা হলো না। বেলা এগারোটার দিকে জাফনার উপকণ্ঠে পৌঁছে গেল ওরা। এবার থামতে হলো টাইগারদের সবচেয়ে বড় চেক পোস্টে।

'প্রভাকরণের অনুসারী এই শালারা আরও এক কাঠি সরেস,' যানবাহনের দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করার সময় আবার একটা মন্তব্য করল বিজয়সিংহ। 'যুদ্ধে এরা আসলে জিততে চায় না, সরকারের সঙ্গে আপস করে তামিলদের স্বাধীনতার স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিতে চায়।'

'কি রকম?' রানা অবাক।

'দেখুন না, কেমন সিভিল ড্রেসে ঘুরে বেড়াচ্ছে গেরিলারা। যেখানে রীতিমত একটা যুদ্ধ চলছে, সেখানে সাদা পোশাকে

থাকাটা বোকামি নয়? প্রায়ই তো টাইগাররা চিনতে না পেরে নিজেদের লোক গুলি করে মারছে। সরকারী কমান্ডোরাও এর সুযোগ নিয়ে সিভিল ড্রেসে জাফনায় ঢুকছে। বিরুপিল্লাই ভবনিয়া কিছু গেরিলাকে ইউনিফর্ম পরার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু শুনছি তাতে নাকি বেশ গোস্‌সা হয়েছে ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণ।'

'এ-কথা সত্যি নাকি যে ভবনিয়ার সঙ্গে প্রভাকরণের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, সত্যি,' বলল বিজয়সিংহ। 'তার কারণও আছে। ভবনিয়া হঠাৎ কোত্থেকে যেন সাত রাজার ধন পেয়ে গেছেন। বিপুল টাকা তাঁকে সাংঘাতিক উচ্চাভিলাষী করে তুলেছে। তিনি এখন দেখতে চান টাইগারেরা ইউনিফর্ম পরে, আধুনিক অস্ত্র হাতে লড়ছে। এ নিয়েই প্রভাকরণের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব। প্রভাকরণ পরিবর্তন পছন্দ করেন না। তাছাড়া, প্রভাকরণ আপস করার জন্যে গোপনে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।'

'আপনি তো মল্লিকা রত্নপ্রভার মামাতো ভাই,' বলল রানা। 'তার মানে তামিল নন। তা সত্ত্বেও তামিলদের ভাল-মন্দ নিয়ে এত কেন উদ্বেগ আপনার?'

বিজয়সিংহ হাসল। 'আমার অঙ্কটা সহজ। তামিলরা স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত শ্রীলঙ্কায় কোনদিন শান্তি ফিরবে না। আজ যদি আপস হয়, কাল আবার যুদ্ধ বাধবে। তাই আমি ওদের স্বাধীনতার পক্ষে। আর ওরা স্বাধীন হতে পারে শুধু ভবনিয়ার নেতৃত্বে যুদ্ধ করে, তাই আমি ভবনিয়ার পক্ষেও।'

গেরিলারা বিজয়সিংহকে চেনে, ওদের পালা আসতে সার্চ না করেই হাত তুলে সামনে এগোবার নির্দেশ দিল।

জাফনাকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে শহরটা গেরিলাদের দখলে। জীবনযাত্রা পুরোপুরি স্বাভাবিক। রাস্তার ট্র্যাফিক জ্যাম লেগে আছে, ঢাকার মতই ঝাঁক-ঝাঁক রিকশাই এজন্যে দায়ী।

লোকজন উপচে পড়ছে বাস ও টেম্পো থেকে। নতুন মডেলের দামী গাড়িও প্রচুর। চেক পোস্ট থেকে খানিক দূরে এসে ট্রাক থামাল বিজয়সিংহ। রানা জিজ্ঞেস করল, 'ফেরার জন্যে কোথায় আপনার সঙ্গে দেখা করব আমি?'

লোকটার অপ্রস্তুত ভাব দেখে বোঝা গেল, রানাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কথাটা একবারও ভাবেনি সে। তবে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে জবাব দিল, 'আমি চারটের দিকে ফিরব। আপনি ঠিক চারটের সময় এখানেই থাকবেন।'

'ঠিক আছে।' ক্যাব থেকে নামল রানা। 'আরেকবার ধন্যবাদ, মি. সিংহ। এক মিনিট, আপনার একটা ট্রে কাত হয়ে আছে।' ট্রাকের পিছনে এসে খড়ের ভেতর থেকে পিস্তলটা বের করে রুমালে জড়াল ও।

রানার দিকে না তাকিয়ে একবার মাথা ঝাঁকাল বিজয়সিংহ, তারপর ট্রাক নিয়ে যানবাহনের মিছিলে মিশে গেল।

রুমালসহ পিস্তলটা পকেটে ভরে হাত তুলে একটা খালি ট্যাক্সি থামাল রানা, ড্রাইভারকে বলল, 'এটিটিই হেডকোয়ার্টারে চলো।'

তিন মিনিটের মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছে গেল ট্যাক্সি। ভাড়া মিটিয়ে ড্রাইভারকে বিদায় করে দিল ও, পায়ে হেঁটে এগোচ্ছে। সোহেলের দেয়া পথ-নির্দেশ ভোলেনি, তিনটে বাঁক ঘুরে স্টেডিয়ামকে বাঁয়ে রেখে চলে এল শহরের উপকণ্ঠে। একদিকে বিশাল বস্তি দেখা গেল, আরেক দিকে ছোটখাট কল-কারখানা। রানার মনে হলো, ও যেন পুরানো ঢাকার ধোলাই খালে চলে এসেছে। রাস্তার নাম ঠিক আছে, ইস্ট কারগালা। এখন শুধু নম্বর মিলিয়ে লিয়াকতের গ্যারাজটা খুঁজে বের করতে হবে। একটা চারতলা বাড়ির সামনে থামল রানা, নিচে বিশাল গাড়ি মেরামতের ওঅর্কশপ, সাইনবোর্ডে বড় বড় হরফে লেখা–লিয়াকত'স

গ্যারাজ।

কালিঝুলি মাখা কয়েকজন কিশোর মেকানিক গাড়ি মেরামতের কাজ করছে, তাদের একজনকে ইঙ্গিতে ডাকল রানা, বলল, 'আমি একটা পুরানো গাড়ি কেনার জন্যে মালিকের সঙ্গে কথা বলতে চাই, তাঁকে একটু খবর দেবে?'

'ওই তো অফিস, ভেতরে বসে আছেন লিয়াকত সাহেব,' বলল ছেলেটা। 'সোজা ঢুকে পড়ুন।'

মাথায় কালো টুপি, মুখে চাপ দাড়ি, পরনে ধবধবে সাদা ফতুয়া ও সেলাইবিহীন লুঙ্গি, অথচ লিয়াকতের বয়স ত্রিশ কি বত্রিশের বেশি হবে না। একটা চেয়ারে বসে তামিল ভাষার দৈনিক পত্রিকায় চোখ বুলাচ্ছে, সেই সঙ্গে চপ্-চপ্ শব্দ করে পান চিবাচ্ছে। চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে সাত কি আট বছরের ছোট একটা মেয়ে, হাতে খোলা বই। চোখ ভরা পানি, দুলে-দুলে কি একটা পড়া মুখস্থ করছে সে।

হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল লিয়াকত। রানাকে দেখে স্থির হয়ে গেল সে। কোন প্রশ্ন না করে কাগজটা টেবিলে রেখে চেয়ার ছাড়ল। 'কাকে চাই?'

'আপনি মি. লিয়াকত?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ।' লিয়াকত নির্লিপ্ত ও ঠাণ্ডা। 'আপনি কে? আমাকে আপনার কি দরকার?'

'আমি মাসুদ রানা।'

লিয়াকত ঘাবড়ে গেল। 'আমি তো এই নামে কাউকে চিনি না।'

কোড বলল রানা, 'আমি এম আর নাইন। আপনি ওয়াইডেড।'

মেয়েটার দিকে ফিরল লিয়াকত। 'তোমার আম্মুকে গুদাম ঘরের দরজা খুলে রাখতে বলো। আমরা আসছি।' মেয়েটা বই

বুকে চেপে ধরে পিছনের দরজা দিয়ে ছুটল।

রানার দিকে তাকিয়ে এই প্রথম হাসল লিয়াকত। 'আপনি নিজে আসায় আমি সম্মানিত বোধ করছি, স্যার। কিন্তু আপনার আসা মানে ফয়সলের কিছু হয়েছে।'

'আমার সঙ্গে দেখা করার আগেই সে খুন হয়ে গেছে,' বলল রানা। 'আপনি তাকে যে তথ্যগুলো দিয়েছিলেন, সেগুলো এবার আমাকে দেবেন।'

লিয়াকত মাথা ঝাঁকাচ্ছে, এই সময় অকস্মাৎ ব্রেক কষায় রাস্তার সঙ্গে টায়ারের তীব্র ঘর্ষণের কর্কশ শব্দ শুনতে পেল ওরা। লিয়াকতের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল, রানার মুখে কি যেন খুঁজছে সে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে দরজার পাশে চলে এল রানা, উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখতে পেল ছাই রঙের ইউনিফর্ম পরা তিন জন লোক রাস্তা থেকে গ্যারাজের ভেতর ঢুকছে, দু'জনের হাতে রাইফেল, একজনের হাতে টমিগান। রানার পিছন থেকে ফিসফিস করল লিয়াকত, 'ভবনিয়া বাহিনী, স্যার!' থরথর করে কাঁপছে সে।

'দিস ইজ অ্যাবসার্ড!' বিস্ফোরিত হলো রানা, হাতে ওয়ালথারটা বেরিয়ে এসেছে। 'ওরা জানছে কিভাবে!'

'স্যার, আমার বাচ্চাদের কি হবে?' লিয়াকতের গলা বুজে এল।

'এই গ্যারাজ আর বাড়ি থেকে বেরুবার আর কোন পথ নেই?' দ্রুত জিজ্ঞেস করল রানা।

'কয়েকটাই আছে,' বলল লিয়াকত। 'আসুন, স্যার!'

পিছনের দরজা দিয়ে একটা পাকা উঠানে বেরিয়ে এল ওরা। লিয়াকতের বাচ্চা মেয়েটা দৌড়ে ফিরে আসছে, তাকে ধাওয়া করছে দু'জন গেরিলা। রানার হাতে দু'বার গর্জে উঠল ওয়ালথারটা। দশ-বারো গজ দূরে ঝাঁকি খেলো তারা, মুখ থুবড়ে

পড়ার আগেই তাদেরকে পাশ কাটিয়ে এল রানা। উঠানের ডান পাশের দরজাটা খোলা, বাইরের সরু রাস্তায় একটা জীপ দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার নামতে যাচ্ছে, উঠান থেকেই আরেকটা গুলি করল রানা।

পিছন থেকে লিয়াকত চিৎকার করল, 'এদিকে, স্যার!'

জীপের ড্রাইভারকে স্টিয়ারিং হুইলের ওপর কাত হতে দেখল রানা, মাথার অর্ধেক উড়ে গেছে। দিক বদলে বাম দিকে ছুটল ও। ওদিকে ইতিমধ্যে একটা ঘরের সামনে পৌঁছে গেছে লিয়াকত।

স্কার্ট ও ব্লাউজ পরা স্ত্রীর হাত থেকে একটা পিস্তল নিচ্ছে লিয়াকত, ওদের কাছে যাবার পথে উঠান থেকে ছোঁ দিয়ে কোমরে তুলে নিল রানা মেয়েটাকে। লিয়াকতের স্ত্রীর বুকে লেপ্টে রয়েছে তিন বছরের একটা ন্যাংটো ছেলে। ওদের পিছু নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল রানা, সবাই মরিয়া হয়ে দৌড়াচ্ছে। সবার আগে রয়েছে লিয়াকতের স্ত্রী। তার পিছন থেকে লিয়াকত চিৎকার করে রানাকে বলল, 'দরজাগুলো লাগিয়ে দিন, স্যার! আমরা বন্ধ একটা গ্যারাজ হয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড টানেলে নামব...'

'আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন না,' পিছন থেকে বলল রানা, পেরিয়ে আসা প্রতিটি ঘরের দরজা বন্ধ করছে। 'ওদেরকে নিয়ে আপনি পালান!' মেঝেতে নামিয়ে দিতে ছুটে মা-বাবার কাছে চলে গেল মেয়েটা।

পাঁচটা দরজা বন্ধ করে আরও একটা খোলা উঠানে বেরিয়ে এল রানা। পিছন থেকে গুলি করে দরজা ভাঙার শব্দ ভেসে আসছে।

উঠানটার দু'দিকে বহুতল ভবন। একটা ছাদের কিনারায় চোখ পড়তেই লোকটাকে দেখতে পেল রানা। এর পরনেও ছাই রঙের ইউনিফর্ম, হাতে রাইফেল তুলে লিয়াকতের ওপর লক্ষ্যস্থির

করছে। দুই বাচ্চাকে নিয়ে খোলা একটা দরজা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে লিয়াকতের স্ত্রী, কিন্তু উঠানের মাঝখানে অযথা একা রানার জন্যে অপেক্ষা করছে লিয়াকত। রানা জানে দেরি হয়ে গেছে, তারপরও ওয়ালথার তুলে গুলি করার সময় চিৎকার বেরিয়ে এল ওর গলা থেকে, 'লিয়াকত, ডাইভ দিন!'

তিনটে শব্দ একাকার হয়ে মিশে গেল—রাইফেল ও পিস্তলের গর্জনে চাপা পড়ে গেল রানার চিৎকার। ওর বুলেট লোকটার গলায় লেগেছে, ছাদের কিনারা থেকে অলস ভঙ্গিতে খসে পড়ছে সে; রাইফেলের বুলেট চরকির মত পাক খাওয়াল লিয়াকতকে, ডান বুকে বিশাল একটা গর্ত তৈরি হয়েছে।

ছুটে এসে লিয়াকতকে ধরে ফেলল রানা। কিছুটা টেনে, কিছুটা বয়ে আনল তাকে। খোলা দরজার বাইরে সরু একটা প্যাসেজ, প্যাসেজের শেষ মাথায় আরেকটা দরজা। ওটার ভেতরে বিশাল এক চত্বরে ভাঙাচোরা বাতিল গাড়ির চেসিস, এঞ্জিন, টায়ার-টিউব, লোহা-লক্কড় ইত্যাদির কয়েকটা স্তূপ। দুই বাচ্চাকে নিয়ে একটা স্তূপের আড়ালে লিয়াকতের স্ত্রীকে লুকিয়ে পড়তে দেখল রানা।

লিয়াকত নেতিয়ে পড়ছে। তার সময় শেষ, বুঝতে পেরে একটা চেসিসের গায়ে হেলান দিয়ে মাটিতে বসল রানা, লিয়াকতের মাথাটা কোলের ওপর রেখে ঝুঁকে পড়ল। 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

লিয়াকতের বন্ধ চোখের পাতা কেঁপে উঠল।

'ভবনিয়া এত টাকা পেল কোথায় যে এক হাজার টন সোনা কিনল?'

'র...জ,' বিড়বিড় করল লিয়াকত। 'র...জ...'

'র? জ? এর মানে কি?' জিজ্ঞেস করল রানা। ঠোঁট নাড়ল লিয়াকত, কিন্তু কোন শব্দ বেরুল না।

‘ফোরবলের একজন ভবনিয়া, আরেকজন কি কবীর চৌধুরী?’ লিয়াকতকে ধরে একটু ঝাঁকাল রানা।

মাথাটা সামান্য কাত করল লিয়াকত।

‘তৃতীয় পক্ষ মর্তে ল্যাম্পি, অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ মাফিয়া চীফ দ্যুভো দ্যেতা চেরোকি। কিন্তু চতুর্থ পক্ষ কে?’

লিয়াকত স্থির হয়ে থাকল। তার পালস দেখল রানা। প্রায় চলছে না বললেই হয়। তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে রানা বলল, ‘আপনার বউ আর বাচ্চা দুটোর দায়িত্ব আমি নিলাম। আমি বাঁচলে ওরাও বাঁচবে। এবার আমার শেষ প্রশ্নের জবাব দিন। চতুর্থ পক্ষ কে? আইএসআই?’

লিয়াকত নড়ছে না।

ছুটন্ত পায়ের শব্দ ভেসে এল। ভবনিয়া বাহিনীর সদস্যরা কাছে চলে আসছে। যে-কোন মুহূর্তে প্যাসেজ হয়ে চত্বরে ঢুকে পড়বে তারা। লিয়াকতের মাথা মাটিতে নামিয়ে রাখল রানা। লোকটা এক চুল নড়ছে না। এমনকি নিঃশ্বাস ফেলছে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। মেঝে থেকে তার পিস্তলটা নিয়ে সিধে হলো ও। গেরিলাদের উত্তেজিত গলা ভেসে এল। যে-কোন মুহূর্তে চত্বরে বেরিয়ে আসবে তারা। ছুটল রানা, বিশ গজ পেরিয়ে এসে দেখল মুখে হাত চাপা দিয়ে অদম্য কান্না চাপার চেষ্টা করছে বউটা, মেয়ের মুখেও একটা হাত চাপা দিয়ে রেখেছে। রানার অনুভূতি হলো, আকাশটা যেন ভেঙে পড়তে চাইছে ওর মাথায়। হায় খোদা, এদেরকে এখন ও বাঁচাবে কিভাবে! ‘টানেলটা কোন দিকে?’ জিজ্ঞেস করল ও। ‘বন্ধ গ্যারাজটা?’

হাত তুলে চত্বরের শেষ প্রান্তটা দেখাল লিয়াকতের বউ। ওদিকে একটা বন্ধ লোহার গেট দেখা যাচ্ছে, বিরাট একটা তালা ঝুলছে গায়ে। শুধু তাই নয়, গেটটা প্রায় ত্রিশ গজ দূরে, যেতেও হবে ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে। অত সময় কি পাওয়া যাবে? ‘চাবিটা

দিন!’ বউটার সামনে হাত পাতল রানা। শেষ চেষ্টা করে দেখতে চায় ও।

‘চাবি তো ওর কাছে!’ মুখ থেকে হাত সরিয়ে চাপা কান্নার সঙ্গে বলল বউটা।

সর্বনাশ! মাথায় হাত দেয়ার অবস্থা রানার। লিয়াকতের কাছে এখন আর ফিরে যাবার কোন উপায় নেই। এই মুহূর্তে হয়তো প্যাসেজ থেকে চত্বরে ঢুকছে গেরিলারা। কিন্তু রানা এখন মরিয়া। বাঁচতে হলে চাবিটা পেতে হবে। ক্রল করে, পড়ে থাকা ভাঙা গাড়ির আড়াল নিয়ে, আবার লিয়াকতের দিকে ফিরছে ও। এই সময় লোহা-লক্কড়ের ফাঁক দিয়ে লোকগুলোকে দেখা গেল। চত্বরে ঢুকে পড়েছে ওরা, নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

পাঁচ গজ এগিয়ে স্থির হলো রানা। ওর সামনে টায়ার থেকে আলাদা করা তিনটে টিউব দেখা যাচ্ছে, একটার ওপর আরেকটা সাজানো। ওগুলোর ভেতর লুকাতে গিয়ে গর্তটা দেখতে পেল ও। গর্ত নয়, একটা কুয়ার মুখ। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে দেখল উঁকি মেরে ওকেই দেখছে বউটা। হাতছানি দিয়ে ডাকল রানা, সেই সঙ্গে ঠোঁটে আঙুল রেখে শব্দ করতে নিষেধ করল।

মা ও মেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। মায়ের শরীরের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে ছেলেটা। সরু কুয়া, খানিক নিচে নেমে দু'দিকের দেয়ালে পা বাধিয়ে স্থির হলো রানা, বউটার হাত থেকে মেয়েটাকে নিয়ে কাঁধের ওপর বসাল। কুয়ার কিনারা থেকে নিচের দিকে পা ঝুলিয়ে দিল লিয়াকতের বউ। এবার তার হাত থেকে ছেলেটাকেও নিল রানা, একটা হাতের ভাঁজে আটকে রাখল তাকে; ধীরে-ধীরে নিচে নামছে।

নিচে এত অন্ধকার যে কুয়ার তলাটা দেখা যাচ্ছে না। হাত দশেক নামার পর স্থির হয়ে মুখ তুলল রানা। দেখাদেখি লিয়াকতের বউও থেমে গেল। তাকে পাশ কাটিয়ে নিচে নামার

ইঙ্গিত দিল রানা। সরু কুয়ার ভেতর কাজটা সহজ হলো না। রানার নিচে পৌঁছে ছেলেটাকে চেয়ে নিল লিয়াকতের বউ। আবার নামছে সে, তবে এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি করে। মেয়েটা এখনও রানার কাঁধে। ওর হাতে একটা পিস্তল বেরিয়ে এসেছে, তাকিয়ে আছে মাথার ওপর উজ্জ্বল আলোর বৃত্তটার দিকে।

কিছুই ঘটল না। লিয়াকতের বউ-এর পিছু নিয়ে আরও প্রায় পনেরো হাত নিচে নেমে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে রানা। সুযোগ পাওয়ায় এই প্রথম কয়েকটা প্রশ্ন করল ও। উত্তর শুনে হতাশ হলো, বউটা কিছুই জানে না।

পায়ের তলায় মাটি বা পানি নয়, লোহা-লক্কড়ের স্তূপ। মাথার ওপর আলোর বৃত্তটা উজ্জ্বল হলেও, ওখান থেকে উঁকি দিয়ে নিচে তাকালে গাঢ় অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখা যাবে না। এদিক ওদিক হাতড়ে ছোট বড় লোহার চওড়া পাত বা বাতিল যন্ত্রাংশ যা-ই পেয়েছে রানা, মাথা ঢাকার জন্যে হাতের কাছে রেখে দিয়েছে।

ভোঁতা, অস্পষ্ট একটা গুলির শব্দ ভেসে এল। লিয়াকতের বউয়ের ডুকরে ওঠা কান্নাটায় স্বামী হারানোর বেদনা করুণ অনুরণন তুলল; মোচড় দিয়ে উঠল রানার বুক, অবশ হয়ে গেল সারা শরীর। আর তারপরই মাথার ওপর আলোকিত বৃত্তে একটা মুখ দেখা গেল, নিচের দিকে তাকিয়ে আছে।

গুলি শুরু হবার পর বোঝা গেল ওটা টমিগান, পঞ্চাশ থেকে ষাটটা বুলেট বেরুবার পর থামল। প্রায় সব গুলিই কুয়ার দেয়ালে বিঁধেছে, দু'চারটে সরাসরি ওদের মাথার দিকে ছুটে এলেও লোহার আচ্ছাদনে লেগে চ্যাপ্টা হয়ে গেল। মাথার ওপর আলোর বৃত্তটা আবার রাহুমুক্ত হলো। রানা ধারণা করল, সন্দেহের বশে কুয়ার নিচে গুলি করা হয়েছে। ভবনিয়ার খুনীরা ধরে নিয়েছে পাঁচিল টপকে চত্বর থেকে পালিয়েছে ওরা।

সাত

এরকম একটা অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে সময়ের একটা হিসাব থাকে, সে হিসাবে ভুল করলে মাসুল গুনতে হয় পৈত্রিক প্রাণটা বিসর্জন দিয়ে। কুয়ার ভেতর গুলি করা যদি গেরিলাদের হতাশার বহিঃপ্রকাশ হয়, ধরে নিতে হবে চত্বর ছেড়ে চলে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে কাজটা করেছে তারা। অর্থাৎ এখুনি কুয়া থেকে উঠে লিয়াকতের পকেটে রাখা চাবিটা সংগ্রহ করতে হবে রানাকে। কারণ গেরিলারা চলে যাবার কিছুক্ষণ পরই কৌতূহলী লোকজন চত্বরে ভিড় করবে। তারা প্রায় সবাই হবে তামিল, অর্থাৎ গেরিলাদের সমর্থক।

পকেট থেকে কাগজ কলম বের করে বিসিআই মানকুলাম শাখার ঠিকানা লিখল রানা। ঠিকানার নিচে লিখল লিয়াকতের মৃত্যুসংবাদ, তার স্ত্রী ও বাচ্চা দুটোর নাম, এবং ওদের কি ধরনের সাহায্য দরকার তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এই মেসেজ মানকুলাম শাখার প্রধান বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকায় পাঠিয়ে দেবে। সব লেখার পর লিয়াকতের স্ত্রীকে বলল, 'শুনুন, লতিফা, যতক্ষণ সম্ভব একসঙ্গেই থাকব আমরা, তবে বাচ্চাদের নিয়ে জাফনা থেকে আপনি যদি নিজের চেষ্টায় বেরিয়ে যেতে পারেন, সেটাই সবদিক থেকে নিরাপদ হবে। পারবেন?'

মাথা ঝাঁকাল লতিফা। 'আমার এক ভাই জাফনার ঠিক

বাইরেই থাকে, আমরা প্রায়ই তার কাছে বেড়াতে যাই।'

'গুড।' কাগজটা তার হাতে গুঁজে দিল রানা। 'মানকুলামে গিয়ে এই ঠিকানাটা খুঁজে বের করবেন। ওরা আপনাদের সব ব্যবস্থা করবে। এখন আমি দেখতে যাচ্ছি চাবিটা পাই কিনা। মেয়েটা আমার কাঁধে থাকুক, আপনিও ধীরে ধীরে উঠতে থাকুন। পারবেন?'

আবার মাথা ঝাঁকাল লতিফা।

কুয়া থেকে উঠে এসে চত্বরে কাউকে দেখল না রানা। মেয়েটাকে একটা আড়ালে বসিয়ে রেখে ক্রল করে এগোল ও।

লিয়াকত সেই একই ভঙ্গিতে পড়ে আছে। তবে তার মাথার অর্ধেকটাই নেই। লাশের পকেট হাতড়াচ্ছে রানা, হঠাৎ মাটিতে কয়েকটা আঁচড় ওর দৃষ্টি কেড়ে নিল। নখ দিয়ে আঁচড়ে একটা পাঁচকোনা তারা এঁকে রেখে গেছে লিয়াকত। তার ডান হাতের নখের ভেতর মাটি দেখে নিশ্চিত হলো রানা, কাজটা আর কারও নয়। তারাটার দিকে তাকিয়ে আছে, এই সময় কাছাকাছি আরও একটা আকৃতি ধরা পড়ল চোখে। এটা একটা কাস্তে আকৃতির চাঁদ। তবে একটা প্রান্ত বুট জুতোর চাপে মুছে গেছে।

চাঁদ আর তারা। এর মানে কি?

চাবি নিয়ে কুয়ার কাছে ফিরে এল রানা। ইতিমধ্যে লতিফা উঠে এসেছে। সবাইকে নিয়ে ছুটল রানা লোহার গেটের দিকে। লতিফা ঘন-ঘন চোখ মুছছে আর বারবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাচ্ছে।

গেট খুলে একটা চওড়া গলিতে বেরিয়ে এল ওরা। রানাকে থামতে বলে একটা ম্যানহোলের ঢাকনি টান দিয়ে তুলে ফেলল লতিফা। লোহার ধাপ বেয়ে সে-ই আগে নামল। তার পিছু নিয়ে কয়েক ধাপ নিচে নেমে ঢাকনিটা ম্যানহোলের মুখে টেনে আনল রানা। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, মেয়েটা ভয় পেয়ে কেঁদে

উঠল। তাকে এক হাতে ধরে রেখে লাইটার জ্বালল রানা।

ধাপগুলোর নিচে সরু প্যাসেজ। সামনে থেকে লতিফা বলল, ‘এটা রাজা দ্বিতীয় চিতামবরাম-এর দুর্গ থেকে পালাবার রাস্তা–অসংখ্য টানেলের একটা। আপনার ভাই হঠাৎ একদিন দেখতে পায়। দুটো গ্যারাজ আমাদের, একটা তালা দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে। ধাপ বেয়ে সেটাতেই এখন উঠব আমরা।’

‘তারপর?’

‘গ্যারাজে একটা পুরানো গাড়ি আছে,’ বলল লতিফা। ‘কাগজ-পত্র, কিছু টাকা ইত্যাদি সবই পাওয়া যাবে একটা ব্যাগে। ওটা চালিয়ে ভাইয়ের কাছে চলে যাব আমি।’

‘মানকুলামে…’

‘কাল বা পরশু যাব।’

গ্যারাজে উঠে এসে প্রথমেই লিয়াকতের রেখে যাওয়া ব্যাগটা পরীক্ষা করল রানা। এক সেট ট্রাউজার ও শার্ট দেখে স্বস্তি বোধ করল ও। দু’জনের মাপ প্রায় একই, পরার পর অবশ্য সামান্য একটু ঢোলা লাগল। রক্ত মাখা প্যান্ট ও শার্ট গ্যারাজের এক কোণে ফেলে দিল।

গ্যারাজটা মেইন রোডে, দরজা খুলে গাড়িতে স্টার্ট দিল লতিফা। রাস্তায় বেরিয়ে যানবাহনের মিছিলে যোগ দিল তার গাড়ি। সেটার পিছু নিয়ে রানাও বেরুল, চোখের পলকে মিশে গেল লোকজনের ভিড়ে।

পার্ক, পাবলিক টয়লেট, ব্যস্ত বাজার, এই সব জায়গায় ঘোরাফেরা করে নিজেকে যতটা সম্ভব গেরিলাদের দৃষ্টি থেকে দূরে রাখল রানা। মনের ভেতর কয়েকটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। র ও জ, দুটো অক্ষর, না শব্দ? ঠিক কি বলতে চেয়েছে লিয়াকত?

ফোরবলের প্রথম পক্ষ বিরুপিল্লাই ভবনিয়া। দ্বিতীয় পক্ষ

কবীর চৌধুরী? হ্যাঁ, সে-ই, কারণ ওর প্রশ্নের উত্তরে মাথা কাত করেছে লিয়াকত। তৃতীয় পক্ষ দ্যাঁভা দ্যেতা চেরোকি। চতুর্থ পক্ষ? লিয়াকত বলে গেছে, চতুর্থ পক্ষ চাঁদ-তারা।

রানার চোখের সামনে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা ভেসে উঠল। সন্দেহ নেই, পাকিস্তানকেই চতুর্থ পক্ষ চিহ্নিত করে গেছে লিয়াকত। চাঁদ-তারার আর কোন অর্থ হতে পারে না।

বাকি থাকল র এবং জ।

একটা ইংরেজি দৈনিক কিনে হাতে রাখল রানা, হাঁটতে হাঁটতে চলে এল চেক পোস্টের কাছাকাছি, যেখানে বিজয়সিংহের জন্যে ওর অপেক্ষা করার কথা। তবে নির্দিষ্ট ফুটপাথের উল্টোদিকে দাঁড়াল। বিকেলের দিকে জাফনা থেকে প্রচুর লোকজন বেরিয়ে যাবে, চেক পোস্টে তাই যানবাহনের দীর্ঘ লাইন দেখা গেল। রানা উপলব্ধি করল, বিজয়সিংহের সকালের সময়জ্ঞান ও বিকালের সময়জ্ঞান এক নয়। চারটে বাজল। তিন টনী কোন ট্রাক এল না। আরও পাঁচ মিনিট পার হলো, তারপর দশ মিনিট। সাড়ে চারটের সময় কাগজটা ভাঁজ করে বগলে চেপে পায়চারি শুরু করল রানা।

পাঁচটা বাজল, ল্যাম্প পোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা। অনেক কারণেই পৌঁছাতে দেরি হতে পারে, তাই বলে এক ঘণ্টা?

তারপরও রানা দাঁড়িয়ে থাকল। বিজয়সিংহ ওকে নিতে আসবে, এই আশায় নয়। সে জাফনা থেকে ট্রাক নিয়ে বেরোয় কিনা দেখার জন্যে।

এক সময় ছ'টা বাজল। ট্রাক এল না। আসেনি, কারণ আসার কোন প্রয়োজন নেই। আজ বিকেল চারটের সময় এই নির্দিষ্ট জায়গায় রানা থাকবে না বলেই জানে বিজয়সিংহ। জানে ভবনিয়া বাহিনীর সদস্যরা ওকে খুন করবে।

চিন্তার এই ধারা কয়েকটা ঘটনাকে এক সুতোয় গেঁথে দিচ্ছে, আগে যেগুলোকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হচ্ছিল। বিরুপিল্লাই ভবনিয়ার অনুচর বা শিষ্যদের কথাই ধরা যাক। তারা জাদুও জানে না, অস্বাভাবিক দক্ষও নয়। কেউ আঙুল তুলে রানাকে দেখিয়ে দিয়েছে। সেই আঙুলটা মল্লিকা রত্নপ্রভার না হয়ে যায় না। একমাত্র সে-ই জানত আজ সকালে জাফনায় ঢুকবে ও। বিজয়সিংহকে ফোন করে ওর সামনেই ফাঁদটা পাতে সে।

গতকালও একই ঘটনা ঘটেছে, সোহেলের সঙ্গে দেখা করার জন্যে বিসিআই-এর গোপন আস্তানায় যাবার পথে আক্রান্ত হয় রানা। একমাত্র মল্লিকাই জানত যে পেড্রো পয়েন্ট থেকে মানকুলামে আসছে ও। জানা কথা, দুর্গ থেকে ফোন করে ভবনিয়ার লোকজনকে খবরটা জানিয়ে দেয় সে।

আজ ভবনিয়ার গুণ্ডারা ওর পিছু নিয়ে লিয়াকতের গ্যারাজ পর্যন্ত আসে, উদ্দেশ্য ছিল এক ঢিলে দুটো পাখি মারবে। কিন্তু দুটোর একটা পাখি বহাল তবিয়তে বেঁচে তো আছেই, রেগে একেবারে তাজা বোমা হয়েও আছে।

এখন এটারও ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে, কাল রাতে ওকে দেখে কেন অমন হাঁ করে তাকিয়ে ছিল মল্লিকা। ভবনিয়া নিজেই হয়তো ফোন করে তাকে জানিয়েছিল যে মাসুদ রানা গাড়ি সহ ট্রেনের তলায় চাপা পড়েছে।

তবে সব ঘটনাই খাপে খাপে মেলানো যাচ্ছে না। কাল রাতে ওকে দেখে মল্লিকা চমকে ছিল ঠিকই, কিন্তু তার আগে একা একা ফ্ল্যাটে বসে কাঁদছিল কেন সে? শুধু ওই কান্নাটাই নয়, মল্লিকার আরও অনেক আচরণে পরিষ্কার বোঝা গেছে কি যেন একটা প্রচণ্ড চাপের মধ্যে আছে সে।

তার প্রসঙ্গটা প্রথম থেকে ভাবছে রানা। ফয়সলের বোট বিস্ফোরিত হবার সময় ওখানে মল্লিকার উপস্থিত থাকাটা এখন

আর কাকতালীয় মনে করার কোন কারণ নেই। সে কি ভবনিয়ার ক্রুদের একজন হিসেবে ওই বোটেই ছিল?

বিস্ফোরণের পর রানা তাকে সাগর থেকে উদ্ধার করল, অথচ ওকে কিছু না বলে দুর্গে চলে গেল মল্লিকা। কেন? ইন্সপেক্টর সিঙ্গি পেরেরার কথা মনে পড়ল রানার। এখন পরিষ্কার, এই লোকটা ভবনিয়ার এজেন্ট। সে-ই ফোনে মল্লিকাকে নির্দেশ দেয়, রানাকে যেন অতিথি হিসেবে দুর্গে গ্রহণ করে সে।

হঠাৎ একটা ধাঁধার উত্তর পেয়ে গেল রানা। সিঙ্গি পেরেরাই ওকে প্রথম জানায়, দুর্গের মালিক হলো মল্লিকার কাকা–রত্নগিরি জয়শঙ্খ।

বিরুপিল্লাই ভবনিয়া কোত্থেকে এত টাকা পেল, এই প্রশ্নের উত্তরে লিয়াকত উচ্চারণ করেছে–র এবং জ। অর্থটা এখন পরিষ্কার। সে রত্নগিরি জয়শঙ্খের নাম বলে গেছে।

মল্লিকার কাকা রত্নগিরি জয়শঙ্খকে দীর্ঘদিন কেউ কোথাও দেখেনি। তিনি বিখ্যাত শিল্পপতি, বিভিন্ন ব্যবসায় তাঁর মূলধনের পরিমাণ কয়েক হাজার কোটি টাকা। তাঁকে গায়েব করে দিয়ে উচ্চাভিলাষী বিরুপিল্লাই ভবনিয়া সব যদি আত্মসাৎ করে থাকে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

খানিকটা হেঁটে এসে পঞ্চাশ গজ দূর থেকে চেক পোস্টটা পরীক্ষা করল রানা। সকালে ওখানে শুধু সাদা পোশাক পরা টাইগারদের দেখেছিল, এখন ছাই রঙা ইউনিফর্ম পরা বেশ কিছু গেরিলাকেও দেখা যাচ্ছে। জাফনা ছেড়ে ও যাতে পালাতে না পারে, সেজন্যেই হয়তো ভবনিয়ার এই অতিরিক্ত সাবধানতা।

চেক পোস্টের দু'পাশে কংক্রিটের পাঁচিল, পাঁচিলের ওপর ইলেকট্রিফায়েড কাঁটাতারের বেড়া; পালা করে সারাক্ষণ একদল টাইগার পাহারা দিচ্ছে, কাজেই পাঁচিল টপকে পালানো সম্ভব

নয়।

রানা যদি একটা কার বা ট্রাক চুরি করে, তাহলেও চেক পোস্ট ভেঙে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। সে চেষ্টা আগেও নিশ্চয় করা হয়েছে, সেজন্যেই সাবধানের মার নেই ভেবে রাস্তাটার মাঝখানে বিশ গজের ব্যবধানে দুটো লোহার গেট তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি গাড়ি প্রথমে সার্চ করছে টাইগাররা, তারপর শুধু প্রথম গেটটা খোলা হচ্ছে। গেট পেরিয়ে ভেতরে এক এক করে তিনটে গাড়ি ঢোকার পর আরেক দল টাইগার কাগজ-পত্র চেক করছে, এবং শুধু তারপরই খোলা হচ্ছে দ্বিতীয় গেট।

মানকুলামে পৌঁছাতে অনেক রাত হয়ে যাবে, ফলে তখন সেখানে কারফিউ থাকবে। রানা চিন্তা করছে রাতটা জাফনাতেই কাটাবে কিনা। হোটেলে ওঠা বোকামি হবে, ভবনিয়া বাহিনী ঠিকই খুঁজে নেবে ওকে। রেলস্টেশনও নিরাপদ নয়। তাহলে কোথায়?

এই সময় হঠাৎ গড়িয়ে গড়িয়ে সমাধানটা হাজির হলো ওর সামনে। এক লাইনে প্রকাণ্ড আকারের চারটে ট্র্যাক্টর-ট্রেইলর। শেষটা থামল রানা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, একটা অন্ধকার দোরগোড়ার ঠিক সামনে। প্রথমটার কাগজ-পত্র চেক করছে টাইগাররা, বাকি তিনটের ড্রাইভাররাও হাতে কাগজ-পত্র নিয়ে ক্যাব থেকে নেমে সেদিকে এগোল। রুটিন চেক চলছে, ওদেরকে টাইগাররা চেনে।

অন্ধকার দোরগোড়ায় বসে পড়ল রানা, উঁকি দিয়ে ট্রেইলরের নিচেটা পরীক্ষা করছে। ছোট একটা অ্যাকসল-এর নিচে একটা ক্রসবার আছে, ওই ক্রসবারই চাকা দুটোর অবলম্বন হিসেবে কাজ করছে। ক্রল করে ট্রেইলরটার তলায় পৌঁছে গেল রানা। একটু পরই স্টার্ট নিল কনভয়টা। ক্রসবার ধরে ঝুলে আন্ডারক্যারিজ হুইলের ওপরে উঠে এল ও, পা দুটো গুঁজে দিল ছোট অ্যাকসেল

ও ট্রেইলরের তলার ফাঁকটায়।

চেক পোস্ট পেরিয়ে এল কনভয়। দু'মাইল পর প্রথম পাহাড়ী ঢাল পড়ল। চূড়ায় ওঠার মুহূর্তে স্পীড কমে প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ার অবস্থা হলো, এই সুযোগে রাস্তায় নেমে ক্রল করে ট্রেইলরের তলা থেকে বেরিয়ে এল রানা। হাতে ওয়ালথার, ছুটে ক্যাবের পাশে চলে এল ও, হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে এক লাফে উঠে বসল ড্রাইভারের পাশে। 'কোন ভয় নেই,' লোকটাকে আশ্বস্ত করল ও। 'কোনরকম গোলমাল না করে একটা লিফট দাও, তোমার কোন ক্ষতি করব না। তোমরা যাচ্ছ কোথায়?'

পিস্তলের দিকে তাকিয়ে একটা ঢোক গিলল ড্রাইভার। 'অনুরাধাপুরা।'

'নিশ্চয়ই মানকুলাম হয়ে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল ড্রাইভার।

'কিন্তু শহরগুলোয় তো ভোর পর্যন্ত কারফিউ থাকবে, তোমরা যাবে কিভাবে?'

'আমাদের কাছে পাস আছে।'

'গুড।' হাসল রানা। 'আমাকে তুমি মানকুলামে নামিয়ে দেবে।'

বাহনের ব্যবস্থা করতে পারলেও, সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র না থাকায় সামনের চেক পোস্ট বা রোড ব্লকে মারাত্মক বিপদের মুখে পড়তে হতে পারে রানাকে।

প্রথম বিশ মাইল কিছুই ঘটল না। বারবার ঘাড় ফিরিয়ে রানাকে দেখছিল ড্রাইভার, এক সময় ফ্লাস্ক থেকে একটা কাপে গরম চা ঢেলে খুক করে কাশল সে, তারপর কাপটা বাড়িয়ে ধরে বলল, 'নিন, একটু চা খান।'

'আহা, এ-সবের কি দরকার ছিল!' প্রতিটি মানুষের ভেতরই একটা রসিক সত্তা আছে, এই মুহূর্তে রানার সেই সত্তা পরিস্থিতির

অদ্ভুত বৈপরীত্য লক্ষ করে হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

তবে এ-ও নির্মম সত্য যে ট্রেনিং ওকে মানুষকে অবিশ্বাস করতে শিখিয়েছে। এই রাস্তায় প্রায়ই ডাকাতি হয়, আর ডাকাতকে খাওয়াবার জন্যে চায়ে বিষ মিশিয়ে রাখা হয়েছে, এই চিন্তাটাও উঁকি দিল মনে। 'ধন্যবাদ, ভাই,' বলল ও। 'তবে কাপ যখন একটাই, আপনিই আগে শেষ করুন।'

কাপে চুমুক দিয়ে ড্রাইভার বলল, 'অভয় দিলে একটা কথা বলি।'

অমায়িক হেসে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'আপনি একজন সাংবাদিক, গোপনে যুদ্ধের খবর নিতে জাফনায় ঢুকেছিলেন, আর পিস্তলটা খেলনা–তাই না?'

'যাহ্, ধরে ফেলেছেন!' এক গাল হেসে পিস্তলটা পকেটে ভরে রাখল রানা।

'একটা অনুরোধ, স্যার,' বলল ড্রাইভার। 'শ্রীলঙ্কায় আমরা সাধারণ মানুষ খুব বিপদের মধ্যে আছি। দুনিয়ার মানুষকে এই কথাটা জানিয়ে দিন।'

এরপর আর কোন সমস্যা হবার কথা নয়, হলোও না; সামনে দুটো রোডব্লক পড়ল, ড্রাইভার রানাকে নিজের হেলপার বলে চালিয়ে দিল। মানকুলামে ঢোকার আগে সরকারী সৈন্যরা চেক পোস্টে থামালেও, শুধু কারফিউ পাস দেখে কনভয় ছেড়ে দিল।

ড্রাইভার ওকে নামিয়ে দিল শহরের শেষ প্রান্তে, ওখান থেকে মল্লিকার ফ্ল্যাট মাত্র দুশো গজ দূরে। নিতে চায়নি, তবু জোর করে তার হাতে একশো রুপির দুটো নোট গুঁজে দিল রানা।

রাত বারোটায় মল্লিকার আটতলার ফ্ল্যাটে চুপিসারে ঢুকতে এবার খুব কাজে লেগে গেল পকেটের চাবিটা। অন্য কোন প্রয়োজন না থাকলেও, সুটকেস ও ব্রীফকেসটা নিতে এখানে একবার আসতেই

হত রানাকে।

তালা খুলে নিঃশব্দে ড্রয়িংরুমে ঢুকল ও, বেডরুমে আলো জ্বলতে দেখে বিস্মিত। উঁকি দিয়ে তাকাতেই দেখতে পেল মল্লিকাকে। ড্রেসিংটেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে, কানের কাছে তোলা রিসিভার ধরা হাতটার কাঁপুনি থামাতে পারছে না।

দরজার দিকে পিছন ফিরে থাকলেও, রানা ঘরে ঢুকতেই আয়নায় দেখতে পেল সে। সঙ্গে সঙ্গে ক্রেডলে রিসিভার রেখে এক টানে খুলেই একটা দেরাজের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল। স্যাৎ করে এগিয়ে এসে তার কব্জি চেপে ধরল রানা, জোরে মোচড় দিতে ব্যথায় ককিয়ে উঠে আঙুল থেকে পিস্তলটা ছেড়ে দিল মল্লিকা। দেরাজ থেকে সেটা তুলে পকেটে ভরল রানা।

ভাব দেখে মনে হলো না যে ওকে দেখে বিস্মিত হয়েছে মল্লিকা। পিস্তলটা কেড়ে নেয়ায় সে রাগছে না বা ভয়ও পাচ্ছে না। মাথার চুল এলোমেলো, চোখ দুটো লালচে, দৃষ্টি দেখে কেমন যেন উদভ্রান্ত মনে হচ্ছে। স্লীপিং গাউনের কর্ডটা ঢিলে হয়ে আছে কোমরে। 'ফোনে বিরুপিল্লাই ভবনিয়ার সঙ্গে কথা হলো, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'জানাল, আমাকে খুন করা সম্ভব হয়নি?'

চোখ বড় বড় করে কামরার চারদিকে তাকাচ্ছে মল্লিকা, যেন দৌড়ে পালাবার সুযোগ খুঁজছে। কথা বলছে না।

'ভবনিয়া জানে জাফনা থেকে বেরুতে পারলে তোমার কাছেই আসব আমি,' আবার বলল রানা। 'কাজেই আমার ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে বলে নির্দেশ দিল, তাই না?'

'হ্যাঁ, তাই,' এই প্রথম মুখ খুলল মল্লিকা। 'কিন্তু তাকে আমি আগেও বলেছি, এখনও বলে দিলাম–আর আমি কাউকে খুন করতে পারব না।'

‘তাহলে বোধহয় পিস্তলটা আমাকে দান করতে যাচ্ছিলে?’ হাসল রানা।

‘বিশ্বাস করা না করা তোমার ব্যাপার, কিন্তু আমি তোমাকে গুলি করার জন্যে পিস্তল হাতে নিইনি।’

ব্যঙ্গ করে কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল রানা, তার বদলে নরম সুরে বলল, ‘আত্মহত্যা করাটা সমাধান নয়, মল্লিকা।’

‘তোমার উপদেশ বা সহানুভূতি, এ-সব কিছুই আমার দরকার নেই,’ বলল মল্লিকা। ‘আমি চাই এখুনি তুমি চলে যাও, রানা।’

‘তার আগে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর পেতে হবে আমাকে,’ বলল রানা। ‘ভবনিয়াকে বলে দিয়েছ, আর তুমি কাউকে খুন করতে পারবে না। এর মানে দাঁড়ায় তার নির্দেশে আগেও তুমি খুন করেছ। কাকে, মল্লিকা? ফয়সলকে?’

মল্লিকা যেন নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল। ‘তোমার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই। তুমি চলে যাও।’

‘উত্তর না দিলেও কেন তুমি কি করছ আন্দাজ করতে পারছি আমি,’ বলল রানা। ‘বিরুপিল্লাই ভবনিয়া হঠাৎ করে এক হাজার টন সোনা কেনার টাকা কোথায় পেল, এ-ও আমি জানি। তোমার কাকা রত্নগিরি জয়শঙ্খকে খুন করে তাঁর ব্যবসা ও সয়-সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে সে।’

হঠাৎ রানাকে চমকে দিয়ে উন্মাদিনীর মত খিলখিল করে হেসে উঠল মল্লিকা। নিজেকে সামলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল সে, ফলে হাসিটা হয়ে উঠল কান্নারই নামান্তর। ‘এরপর তুমি বলবে, আমার মা-বাবা ও ভাই-বোন ক্রসফায়ারে মারা যায়নি, ভবনিয়া তাদেরকে জাফনায় বন্দী করে রেখেছে। বলবে, তার প্রতিটি নির্দেশ পালন করতে বাধ্য আমি, কারণ তা না হলে ভবনিয়া ওদেরকে খুন করবে।’

'হ্যাঁ, বলব। এবং কথাটা মিথ্যেও নয়।'

'না, মিথ্যে নয়।' হেসে উঠে ইঙ্গিতে একটা দেরাজ দেখাল মল্লিকা। 'তার প্রমাণ ওখানে পাবে তুমি, একটা এনভেলাপে।'

দেরাজটা খুলতে সত্যি একটা এনভেলাপ দেখা গেল। 'কি আছে এতে?'

মল্লিকা পাগলের মত আচরণ করছে। চোখ দুটো আবার বড় বড় হয়ে উঠেছে তার, দৃষ্টিতে চকচকে ভাব, অস্থির মণি ঘুরিয়ে সিলিঙে কি যেন খুঁজছে। রানার কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না।

এনভেলাপটা খুলে একটা ফটো বের করল রানা। তারিখ ও সময় সহ এটা একটা রঙিন গ্রুপ ফটো। লোহার গরাদের ভেতর মেঝেতে বসে কাগজের ঠোঙা বানাচ্ছে প্রৌঢ় একটি দম্পতি, তাদেরকে সাহায্য করছে বারো-তেরো বছরের এক কিশোরী ও দশ-এগারো বছরের এক কিশোর। ছবিটা কাল সকাল দশটায় তোলা হয়েছে। 'ওদেরকে এখনও বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, তার প্রমাণ হিসেবে এরকম ফটো প্রায়ই তোমার কাছে পাঠানো হয়, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তা না পাঠালে কি ওদের কথামত চলব আমি? কত কিছু জানি, সব ফাঁস করে দেব না!' বলেই আবার হেসে উঠল মল্লিকা। হঠাৎ হাতচাপা দিল মুখে। 'ছি, এভাবে কেউ হাসে নাকি! তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছি, না?'

'ফাঁস করে দেয়ার মত কি জানো তুমি, মল্লিকা?'

'প্রভাকরণকে ল্যাঙ মেরে ফেলে দেয়ার মতলবে আছে ভবনিয়া। ক্ষমতা দখলের জন্যে নিজের বাহিনী গড়ে তুলছে সে। গেরিলা নেতাদের দলে টানছে মোটা টাকা ভেট দিয়ে। চোরাই তেল বিক্রির টাকা, খরচ করতে গায়ে লাগছে না।'

'তেল চুরি সম্পর্কে কি জানো তুমি?'

‘ওটা বাংলাদেশী তেল। কোত্থেকে আনছে বা কিভাবে তুলছে তা বলতে পারব না। তবে এই চুরির বুদ্ধিটা তোমাদেরই একজন বিজ্ঞানী কবীর চৌধুরীর মাথা থেকে বেরিয়েছে। আর বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণে তেল আছে, এটা খিজির হায়াৎ খান নামে এক লোক পুরানো জরিপ রিপোর্ট দেখিয়ে ভবনিয়াকে বিশ্বাস করায়। ভবনিয়া জানায় তার বিজনেস পার্টনার কবীর চৌধুরীকে...’

‘খিজির হায়াৎ খান কে?’ জিজ্ঞেস করল রানা। ‘বাংলাদেশের তেল সংক্রান্ত পুরানো রিপোর্ট সে পেল কিভাবে?’

‘সে আইএসআই অফিসার...’ ড্রেসিং টেবিলের গায়ে হেলান দিয়ে গড়গড় করে অনেক কথাই বলে গেল মল্লিকা। তার বেশিরভাগ কথাই অসংলগ্ন, গুছিয়ে নিলে এরকম দাঁড়ায়: বাংলাদেশে গ্যাস ও তেল প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের গোপন কিছু রিপোর্ট কিভাবে যেন খিজির হায়াৎ খানের হাতে চলে আসে। ম্যাপসহ ওই রিপোর্ট আইএসআই-এর ডেপুটি ডিরেক্টরকে দেখায় সে। ডেপুটি ডিরেক্টর ব্রিগেডিয়ার মহব্বতজান খাস্তগীর গোটা ব্যাপারটা চেপে যেতে বলে খিজির হায়াৎকে, সেই সঙ্গে ম্যাপ ও রিপোর্ট বিক্রি করার জন্যে সম্ভাব্য ক্রেতার খোঁজ করতে পরামর্শ দেয়। খিজির হায়াতের সঙ্গে বিরুপিল্লাই ভবনিয়ার পরিচয় ছিল, জানত রত্নগিরি জয়শঙ্ককে খুন করে তাঁর বিপুল ধন-সম্পদের মালিক হয়েছে সে। খিজির হায়াৎ এ-ও জানত যে ভবনিয়া এক হাজার টন সোনা কিনে পয়েন্ট পেড্রোর দুর্গে মজুদ করছে। গোপন রিপোর্ট ও ম্যাপ-এর সম্ভাব্য ক্রেতা হিসেবে ভবনিয়াকেই পছন্দ হয় তার। ভবনিয়া ওগুলো খিজির হায়াতের কাছ থেকে নিয়ে তার বিজনেস পার্টনার কবীর চৌধুরীকে দেখায়।

এরপর ওরা একটা গোপন মীটিং করে। আইএসআই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর ব্রিগেডিয়ার মহব্বতজান খাস্তগীর প্রথম থেকেই

নেপথ্যে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়, তার প্রতিনিধি হিসেবে মীটিঙে যোগ দেয় খিজির হায়াৎ। মীটিঙে কবীর চৌধুরীর সঙ্গে ছিল মার্কিন তেল কোম্পানি এনরন-এর দু'জন তেলখনি বিশেষজ্ঞ—ডেভিড বুচার ও কেনেথ মরিসন। আর ছিল ভবনিয়া। ডেভিড বুচার ও কেনেথ মরিসন রিপোর্ট ও ম্যাপ পরীক্ষা করে জানায়, তেল তো আছেই, আছে বিপুল পরিমাণে, কিন্তু তা উত্তোলন করতে খরচ পড়বে কয়েক হাজার কোটি টাকা। তারা আরও জানায়, কাজটা গোপনে করতে হলে খরচ আরও অনেক বাড়বে। দ্বিতীয় আরও দুটো কঠিন সমস্যা নিয়ে ওই মীটিঙে আলোচনা হয়, তা হলো, তেল উত্তোলনের পর কিভাবে তা পরিবহন করা হবে, এবং কোথায় তা বিক্রি করা হবে।

পরবর্তী বৈঠকে বুচার ও মরিসন প্রস্তাব দেয়, যে পরিমাণ তেলই উঠুক, সবই এনরন কিনতে রাজি আছে, এমনকি তেল উত্তোলনের খরচও দেবে তারা। কিন্তু তাদের দর অত্যন্ত কম হওয়ায় প্রস্তাবটা কবীর চৌধুরী ও ভবনিয়া গ্রহণ করেনি। বুচার ও মরিসনকে নির্দিষ্ট ফী-র বিনিময়ে তেল উত্তোলনের কারিগরি সহায়তা দিতে বলা হয়। তাদেরকে বা এনরনকে ব্যবসার অংশীদার করতে রাজি হয়নি কবীর চৌধুরী। অসন্তুষ্ট হলেও, বুচার ও মরিসন মাথাপিছু এক কোটি মার্কিন ডলার ফী-র বিনিময়ে কাজ করতে রাজি হয়।

পরবর্তী কয়েকটা মীটিঙে সিদ্ধান্ত হয়, গোটা প্রকল্পের যাবতীয় খরচ একা ভবনিয়া বহন করবে; সে পাবে লাভের শতকরা চল্লিশ ভাগ। বিভিন্ন দেশের বন্দর এলাকার মাফিয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে কবীর চৌধুরীর, উত্তোলিত তেল তাদের কাছে বিক্রির ব্যবস্থা করবে সে; সে পাবে লাভের শতকরা পঁচিশ ভাগ। তেল আছে, এটা প্রমাণ করেছে খিজির হায়াৎ, সে পাবে লাভের শতকরা বিশ ভাগ; তবে তার লাভের অর্ধেক টাকা চলে

যাবে আইএসআই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর ব্রিগেডিয়ার মহব্বতজান খাস্তগীরের পকেটে। লাভের বাকি শতকরা পনেরো ভাগ পাবে লা মর্তে ল্যাম্পি শিপিং কোম্পানির মালিক, ফ্রেঞ্চ মাফিয়া চীফ দ্যুঁভো দ্যেতা চেরোকি। এই কোম্পানির সুপার ট্যাংকারগুলো তেল পরিবহনের কাজে প্রধান ভূমিকা রাখবে।

এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলে হাঁপিয়ে উঠল মল্লিকা। গরমে ঘামছে সে, এ-কথা বলে ঝুল-বারান্দার দিকে দরজাটা খুলে দেয়ার অনুরোধ করল রানাকে।

দরজা খোলা পেয়ে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকল বেডরূমে। নিচের রাস্ত া দিয়ে সামরিক বাহিনীর কয়েকটা ট্রাক বা ভ্যান ছুটে গেল, ওগুলোর পিছু নিয়ে একটা অ্যামবুলেন্স।

মল্লিকা বলল তার গলা শুকিয়ে গেছে, পানি খাবে। রানা ইতস্তত করছে দেখে তিক্ত হাসিতে তার ঠোঁটের কোণ বেঁকে গেল। বলল, 'জানি, তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না। বিশ্বাস করা উচিতও নয়। আমার কাছে আরও একটা পিস্তল থাকতেও তো পারে।'

'চলো, কিচেনে বসে কফি খাই আমরা,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, চলো।' মাথা ঝাঁকাল মল্লিকা। 'তবে বিশ্বাস করে কফিটা আবার আমাকে বানাতে বোলো না। নিজেকেই আমি বিশ্বাস করি না, রানা—তোমার কফিতে যদি বিষ মিশিয়ে দিই!' রানাকে পাশ কাটিয়ে বেডরূম থেকে বেরিয়ে এল সে, অনুভব করল রানা ঠিক ওর পিছনেই রয়েছে।

কিচেনে ঢুকে চুলোয় কফির পানি চড়াল রানা।

'তুমি কিছু বলছ না কেন?' একটা চেয়ারে বসে রানার দিকে তাকাল মল্লিকা। 'তুমি সাগর থেকে তুলে এনে আমার প্রাণ বাঁচালে, অথচ তোমাকে কিছু না বলে দুর্গে পালিয়ে এলাম আমি। জিজ্ঞেস করবে না কেন?'

'এ-সব নিয়ে পরে আমরা কথা বলব, মল্লিকা,' বলল রানা। 'তার আগে বলো ফোরবল ও তাদের তেল চুরি সম্পর্কে আর কি জানো তুমি।'

'তুমি যেন মনে হচ্ছে আমাকে পাপমোচনের সুযোগ করে দিতে চাইছ?' শিরদাঁড়া খাড়া করে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল মল্লিকা। 'জীবহত্যা মহাপাপ, রানা। এই শিক্ষা আমি জ্ঞান হবার আগে থেকে মুখস্থ করেছি। ওই পাপের কোন ক্ষমা নেই।'

'তুমি যদি কোন পাপ করে থাকো, তার বোঝা তোমাকেই বইতে হবে, মল্লিকা,' বলল রানা। 'তবে, হ্যাঁ, আমি চাই এই বোঝাটা তুমি যাতে হালকা করার একটা সুযোগ পাও।'

'মিথ্যে সান্ত্বনা বা প্রবোধ দিচ্ছ না, সেজন্যে ধন্যবাদ,' বলল মল্লিকা। 'তবে তোমাকে সব বলে দিচ্ছি পাপের বোঝা হালকা করার জন্যে নয়। বলতে পারো সময় কাটাবার জন্যে তোমার সঙ্গে বকবক করছি। আমার দরকার মুক্তি, কিন্তু আমাকে মুক্তি দেয়ার ক্ষমতা তোমার নেই।'

রানার কফি বানানো শেষ হতে মল্লিকা জানাল, কিচেনে তার দম আটকে আসছে, কফিটা বেডরূমে বসেই খাবে। হাতে কাপ নিয়ে আবার তাই ফিরে এল ওরা। মল্লিকা সেই আগের জায়গায়, ড্রেসিং টেবিলের এক কোণে বসল; রানা বসল বেডরূমের একমাত্র ইজিচেয়ারটায়। 'নাও, শুরু করো,' ধূমায়িত কাপে চুমুক দিয়ে তাগাদা দিল ও। 'প্রথমে বলো, এত সব গোপন খবর তুমি জানলে কিভাবে?'

আগের চেয়ে এখন অনেকটা শান্ত মল্লিকা। বসার ভঙ্গি বা হাত নাড়ার মধ্যে কোন রকম অস্বাভাবিকতা নেই। চোখের দৃষ্টি অস্থির নয়, বা চকচক করছে না। কথাগুলোও বেশ গুছিয়ে বলে গেল।

বাংলাদেশের ঠিক কোন এলাকা থেকে তেল তোলা হচ্ছে, এটা মল্লিকা জানে না, অবশ্য জানার কোন চেষ্টাও করেনি সে। ফোরবল-এর মীটিং প্রায় সবগুলোই পয়েন্ট পেড্রোর সেই দুর্গে বসত। ভবনিয়ার নির্দেশে ওখানেই তখন থাকতে হত মল্লিকাকে।

রত্নগিরি জয়শঙ্খকে খুন করার পর প্রচুর জাল দলিল তৈরি করার দরকার হয় ভবনিয়ার, তা না হলে জয়শঙ্খের ব্যবসাবাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে দখলে আনতে পারছিল না। জাল দলিল দেখিয়ে সে প্রমাণ করে জয়শঙ্খর তাঁর সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব, অর্থকড়ি লেন-দেন করার অধিকার ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা ক্ষমতা পাওয়ার অভ অ্যাটর্নির মাধ্যমে মল্লিকাকে দিয়ে গেছেন। সেই পাওয়ার অভ অ্যাটর্নির ক্ষমতা বলে মল্লিকা বিভিন্ন দলিলে সই করে কাকার ধন-সম্পদ ভবনিয়ার হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়। এই সই করানোর জন্যেই দুর্গে মল্লিকাকে রাখতে হয়েছিল। ওখানে আর কোন মেয়ে না থাকায় লাঞ্চ ও ডিনার পরিবেশনের কাজটা মল্লিকাকেই সুপারভাইজ করতে হয়েছে। অতিথিদের সঙ্গে ভবনিয়া মল্লিকার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে প্রেমিকা বলে, ফলে ওর সামনে তারা ব্যবসা ও অপারেশন প্রসঙ্গে কথা বলতে কোনরকম বাধা অনুভব করেনি। এভাবেই মল্লিকা ওদের গোপন সব বিষয়গুলো জানার সুযোগ পায়।

প্রায় দু'বছর ধরে তেল উত্তোলনের আয়োজন চলে। কোত্থেকে তেল আসছে তা না জানলেও, ওদেরকে হেলিকপ্টার নিয়ে ঘন ঘন আসা-যাওয়া করতে দেখে এবং বিভিন্ন ওশেনগোয়িং ভেসেলের নাম শুনে মল্লিকার ধারণা হয় বাংলাদেশের উপকূল বা জলসীমার ভেতর কোথাও থেকে তেলটা চুরি করা হচ্ছে।

যাই হোক, এক সময় তেল পাওয়া গেল, এবং তা তুলে

বিক্রির একটা ব্যবস্থা চালু করা হলো। দু'মাস পর থেকেই লাভের টাকা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল ওরা। ভবনিয়া যে বিপুল টাকা বিনিয়োগ করেছিল তা তিন মাসের মধ্যেই উঠে আসে। লাভের ভাগ সবাই পেলেও, ব্রিগেডিয়ার মহব্বতজানের নির্দেশে খিজির হায়াৎ কোন পেমেন্ট নেয়নি। এর কারণ, খিজির হায়াৎ জানায়, ব্রিগেডিয়ারের খুব ইচ্ছে মাননীয় বিজনেস পার্টনারদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে পয়েন্ট পেড্রো সফর করবে সে, লাভের ভাগ তখনই তারা নিতে চায়। ভবনিয়া এই সুযোগে জানিয়ে দেয়, লাভের অংশ নগদ টাকায় নয়, সমপরিমাণ সোনায় পরিশোধ করা হবে।

মহব্বতজান খাস্তগীরের এ-সব কথা শুনে ও খিজির হায়াতের মন খারাপ দেখে কবীর চৌধুরী ও ভবনিয়া যা বোঝার বুঝে নিল। এটা তো দিবালোকের মতই পরিষ্কার যে খিজির হায়াৎকে বঞ্চিত করার বুদ্ধি আঁটছে ব্রিগেডিয়ার। ওরা ধারণা করল, পাকিস্তান থেকে যে-কোন দিন একটা দুর্ঘটনার সংবাদ আসবে।

বেশি দিন অপেক্ষা করতে হলো না। একটা ফ্লাইং ক্লাবের সদস্য হিসেবে ট্রেনিং নিতে আকাশে উঠেছিল খিজির হায়াৎ, ফুটো ট্যাংক খালি হয়ে যাওয়ায় অ্যাক্সিডেন্ট করে তার প্লেন। দশ হাজার ফুট ওপর থেকে পড়ে মারা যায় সে। এটা গত মাসের ঘটনা।

খিজির মারা যাবার পর ফ্যাক্স পাঠিয়ে ব্রিগেডিয়ার খাস্তগীর জানিয়েছে, বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে সে তার প্রাইভেট সেক্রেটারি সাজনীনকে নিয়ে সম্ভবত এগারো তারিখে জাহাজে চড়ে পয়েন্ট পেড্রোতে আসছে। নিরাপত্তার কারণে, তাছাড়া সাবধানের মারও নেই, তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে জেলে জেটিতে বন্ধুদের উপস্থিত থাকতে নিষেধ করে দিয়েছে সে। জেটিতে তার জন্যে একটা গাড়ি রাখলেই হবে। কথা প্রসঙ্গে সে

জানিয়েছে, তার সঙ্গে বন্ধু আর তাদের স্ত্রীর জন্যে প্রচুর উপহারসামগ্রী থাকবে, দুটো বড় সুটকেসে ভর্তি। কাজেই বন্ধুরা যেন যার-যার স্ত্রীকে দুর্গে নিয়ে আসেন।

এদিকে কবীর চৌধুরী ও ভবনিয়া নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির করল, ব্রিগেডিয়ারকে তারা চেনে না, চিনত খিজির হায়াৎকে। হায়াতেরই যখন হায়াত ফুরিয়েছে, তখন স্বভাবতই আইএসআই-এর সঙ্গেও তাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। ব্রিগেয়িার মহব্বতজান খাস্তগীর? সে আবার কে! তাকে তো ওরা চেনে না, জীবনে দেখেনি পর্যন্ত।

ওরা ঠিক করল, প্রাইভেট সেক্রেটারি সাজনীনকে নিয়ে ব্রিগেডিয়ারকে পয়েন্ট পেড্রোতে আসতে দেয়া হবে ঠিকই, কিন্তু ফিরে যেতে দেয়া হবে না।

ও, মল্লিকা আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছে। সেটা হলো, এনার্জি কোম্পানি এনরন-এর ওই তেল বিশেষজ্ঞ বুচার ও মরিসনের কারিগরি সহায়তার কারণেই পাইপ দিয়ে তেল তোলার জটিল অপারেশনটা সফল হয়। এই কাজের জন্যে মোটা টাকা ফী পেলেও তারা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। উইলস ও ফরচুনা নামে দুই তেল কোম্পানিকে গোটা ব্যাপারটা তারা একটা মূল্যবান ইনফরমেশন হিসেবে বিক্রি করে দেয়। যেভাবেই হোক এই খবর জানতে পারে কবীর চৌধুরী, ভবনিয়ার সঙ্গে পরামর্শ করে বুচার ও মরিসনকে জাফনায় ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করে তারা।

এই পর্যায়ে রানা জানতে চাইল, ব্রিগেডিয়ার মহব্বতজান চৌধুরী পয়েন্ট পেড্রোতে ঠিক কবে আসছে। মল্লিকা পাঁচ দিন পরের একটা তারিখ বলল, তবে এই তারিখ সম্পর্কে সে পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। তারপর বলল, গোপন তথ্য বলতে এইটুকুই জানে সে। অন্য বিষয়ে আরও কিছু তথ্য তার জানা থাকলেও, সে-সব রানার বা বাংলাদেশের কোন কাজে লাগবে না,

তাই বলার প্রয়োজন বোধ করছে না। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই, কাজেই এখন সে রানাকে বিদায় দেবে। রানা চলে গেলে জরুরী একটা কাজে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যেতে হবে তাকে।

রানা বলল, 'এটা মানকুলাম। আর মানকুলাম সরকারী সৈন্যদের দখলে। কেন তুমি ভাবছ, তোমাদের কোন ব্যবস্থা না করে বিদায় নেব আমি? আমি সরকারী অনুমতি নিয়েই শ্রীলঙ্কায় এসেছি, পরিচয় দিলে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স আমাকে চিনবে। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে আমি যদি তাদেরকে বলি তুমি ভবনিয়ার এজেন্ট, ওরা তোমাকে গ্রেফতার করে ফায়ারিঙ স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করাবে।

মল্লিকা ক্ষীণ একটু হাসল। 'জানতাম এ-কথাই বলবে তুমি। তবে নিশ্চিত থাকো, আমাকে ওদের হাতে তুলে দেয়ার সুযোগ তোমাকে আমি দিচ্ছি না।'

কথা না বলে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা।

খোলা দরজা দিয়ে ঝুল-বারান্দার দিকে তাকাল মল্লিকা। ভোরের আলো পাহাড় চূড়াগুলোকে ফুটিয়ে তুলছে। কারফিউ-এর মেয়াদ একটু পরই শেষ হয়ে যাবে। 'তোমার মনে আরও কিছু প্রশ্ন আছে, আমি জানি,' বলল মল্লিকা। 'উচ্চারণ করার দরকার নেই, এখন আমি যা বলব তা থেকেই উত্তরগুলো পেয়ে যাবে তুমি।'

রানা অপেক্ষা করছে।

'ফয়সলের বোটে আমিই বোমাটা ফিট করেছিলাম,' শান্ত, ম্লান গলায় বলল মল্লিকা। 'ভবনিয়ার নির্দেশ ছিল, এমন ভাবে টাইম ফিক্স করতে হবে, বোমাটা যাতে তুমি বোটে ওঠার পর ফাটে। কিন্তু তোমার ভাগ্যই বলতে হবে, নির্দিষ্ট সময়ের আড়াই মিনিট আগে বিস্ফোরিত হয় ওটা। ওই মুহূর্তে ডাইভ দেয়ার জন্যে স্টার্ন রেইল টপকাচ্ছিলাম আমি, সেজন্যেই ওদের সঙ্গে

আমিও মারা যাইনি। বিস্ফোরণের ধাক্কায় ছিটকে পানিতে পড়ে যাই আমি।'

'তুমি আমাকে কিছু না বলে দুর্গে ফিরে গিয়েছিলে,' বলল রানা। 'কেন?'

'আমার ওপর নির্দেশ ছিল একা ফয়সলকে নয়, তোমাকেও খুন করতে হবে,' বলল মল্লিকা। 'কিন্তু তুমি আমাকে বাঁচালে, তারপর বললে তুমি আমার দৌড়ের ভক্ত, তাই পালিয়ে না গিয়ে উপায় দেখিনি আমি। কিন্তু দুর্গে ফিরতেই প্রথমে পুলিস ইন্সপেক্টর সিঙ্গি পেরেরার ফোন পেলাম, তারপর ভবনিয়ার। ভবনিয়াকে আমি বললাম, যা করার করেছি, আমার পক্ষে আর কাউকে খুন করা সম্ভব নয়। ভবনিয়া তখন বলল, খুন করতে হবে না, তবে তোমাকে যেন আমি দুর্গে অতিথি হিসেবে গ্রহণ করি, এবং ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে জেনে নিই এরপর কি করতে চাও বা কোথায় যেতে চাও তুমি। ভবনিয়া বলল, তথ্যগুলো তাকে ফোনে জানালেই তোমার ব্যবস্থা করতে পারবে সে। এরপর কি ঘটেছে তুমি জানো। একবার নয়, দুই-দুইবার তোমাকে আমি খুনীদের কাছে পাঠিয়েছি।'

ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল, ভোরের ম্লান আলো পরিবেশটাকে আরও যেন বিষাদময় করে তুলছে। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে এক সময় রানা জিজ্ঞেস করল, 'এখন তুমি কি করতে চাও, মল্লিকা?'

'জানি উদ্ভট শোনাবে,' বলল মল্লিকা, 'তবে সত্যি এটাই এখন চাই আমি। এটা আমার স্পর্ধা বলেও মনে হতে পারে তোমার, তবু বলি। আমি চাই তুমি আমাকে চুমো খাবে, অন্তত কয়েক মিনিট ভালবাসবে আমাকে, তারপর...'

'তারপর কি?'

'তারপর আমাকে না দেখিয়ে মাথায় মাজল ঠেকিয়ে ট্রিগার

টেনে দেবে তুমি।'

রানার বলতে ইচ্ছে করল, দুঃখিত, ও খুনী বা স্যাডিস্ট নয়। এক মুহূর্ত চিন্তা করল ও, তারপর বলল, 'মা-বাবা ও ভাই-বোনকে খুন করার হুমকি দিয়ে জঘন্য অপরাধগুলো ভবনিয়াই তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছে। তারমানে এই নয় যে তোমার অপরাধকে আমি হালকা দৃষ্টিতে দেখছি। তুমি আমাকে নিজের হাতে খুন করতে রাজি হওনি ঠিকই, কিন্তু অন্যেরা যাতে খুন করতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিয়েছ। তা না করে তখন যদি আমাকে তুমি সব কথা খুলে বলতে, আমি হয়তো তোমার ফ্যামিলিকে জাফনা থেকে উদ্ধার করে আনতে পারতাম।'

'এখনও কি পারো না?'

'এখন সম্ভব কিনা জানি না, তবে সুযোগ পেলে অবশ্যই চেষ্টা করব।'

'কেন যেন মনে হচ্ছিল এরকম একটা কিছু তুমি বলতেও পারো, তাই শোনার আশায় অপেক্ষা করছিলাম।' হাসল মল্লিকা। 'ধন্যবাদ, রানা।' ড্রেসিং টেবিল ছেড়ে দাঁড়াল সে, কোমরের কর্ড খুলে কাঁধ ঝাঁকাল, অমনি গা থেকে খসে পড়ল স্লিপিং গাউনটা। পরনে থাকল শুধু প্যান্টি আর ব্লাউজ। পা দিয়ে গাউনটা খাটের তলায় সরিয়ে দিয়ে জগিং শুরু করল সে—দৌড়াচ্ছে, তবে জায়গা পরিবর্তন না করে। 'কিছু মনে কোরো না, এখন আমার এক্সারসাইজ করার সময়। আগামী শীতে জাতীয় প্রতিযোগিতায় হানড্রেড মিটার স্প্রিন্টারে সোনা আমাকে পেতেই হবে...'

মল্লিকার হাসিটার মধ্যে এমন কিছু রয়েছে, রানা প্রায় সম্মোহিত হয়ে পড়ল। তার কথাগুলোও বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করল। ওর চোখে চোখ রেখে দৌড়ানোর গতি বাড়াতে শুরু করল মল্লিকা, ঠোঁটের কোণে সেই এক চিলতে রহস্যময় হাসি। তারপর সে যখন জায়গা বদল করল, ভঙ্গিটা

এত স্বাভাবিক যে রানা টেরই পেল না কি ঘটতে যাচ্ছে। মাত্র তিন পা দৌড়ে ঝুল-বারান্দায় যাওয়া যায়; গিয়ে ফিরে এল মল্লিকা। 'বাইরে এখনও লোক চলাচল শুরু হয়নি,' বলল সে। 'তবে এখনই তোমার তৈরি হওয়া উচিত। সুটকেস আর ব্রীফকেস ড্রয়িংরুমে পাবে, বড় সোফাটার পিছনে।' আবার এক ছুটে ঝুল-বারান্দায় বেরুল সে, সাবলীল ভঙ্গিতে ছোট একটা লাফ দিয়ে অনায়াসে পার হয়ে গেল নিচু রেইলিং।

'না! মল্লিকা, না!' রানার চিৎকার কোনও কাজে এল না। মল্লিকা এইমাত্র ছিল, কিন্তু এখন নেই।

রানা যখন বেরিয়ে এসে রেইলিঙের ওপর ঝুঁকে নিচে তাকাল, মল্লিকা তখন এই পৃথিবীতেই নেই। নির্জন রাস্তার ওপর শুধু পড়ে আছে তার প্রাণহীন দেহটা।

আট

সদ্য খোলা একটা রেস্তোরাঁয় বসে পর-পর দু'কাপ কফি খাবার ফাঁকে পরবর্তী কর্তব্য স্থির করল রানা। আইএসআই-এর ডেপুটি

ডিরেক্টর ব্রিগেডিয়ার মহব্বতজান খাস্তগীর পয়েন্ট পেড্রোতে আসছে আসুক, তার ব্যবস্থা যা করার কবীর চৌধুরী আর ভবনিয়াই করবে। মল্লিকা অনেক তথ্যই দিয়েছে, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটা দিতে পারেনি—বাংলাদেশের কোন এলাকা থেকে চুরি হচ্ছে তেলটা। সেটা ডাঙায় হোক বা জলসীমার ভেতর সাগরে কোথাও, যেভাবেই হোক একবার দেখে আসতে হবে ওকে।

তেলের উৎস দেখতে চাওয়ার পিছনে শুধু কৌতূহল নয়, আরও অনেক জরুরী একটা কারণ আছে। কবীর চৌধুরীকে রানা চেনে, এই উন্মাদ লোকটার স্বভাবই হলো নিজের নাক কেটে হলেও পরের যাত্রা ভঙ্গ করা। তেল চুরির সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলে অবশ্যই প্রতিশোধ নিতে চাইবে সে। তার সেই প্রতিশোধের ভয়াবহ রূপ কি হবে আগে থেকে বলা মুশকিল, তবে রানার ধারণা বাংলাদেশকে বঞ্চিত করার জন্যে ওই তেলের উৎসমুখ ধ্বংসও করে দিতে পারে সে। সেটা ঠেকাতে হলে আগে জানতে হবে তেলখনিটা কোথায়।

কিন্তু জানার উপায়টা কি?

পয়েন্ট পেড্রোর প্রাচীন ওই দুর্গ ফোরবল-এর অন্যতম একটা আস্তানা, ওখানে আরেকবার ঢুকতে পারলে কিছু ক্লু পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া, মল্লিকা বলেছে, ওই দুর্গেই এক হাজার টন সোনা লুকিয়ে রেখেছে ভবনিয়া—চুরি যাওয়া তেলের আংশিক ক্ষতিপূরণ হিসেবে বাংলাদেশেরই ওটা পাওয়া উচিত। ভাগ্য সহয়তা করলে এক ঢিলে একাধিক পাখি মারার সুযোগও হয়তো পেয়ে যাবে ও। বিশেষ করে আইএসআই-এর ডেপুটি ডিরেক্টরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে কবীর চৌধুরী ও ভবনিয়া ওই দুর্গে যখন আসছেই।

তবে পয়েন্ট পেড্রোতে যাবার আগে আরেকটা রহস্যের

মুখোমুখি হবার তাগিদ অনুভব করছে রানা। সেই রহস্যের নাম যমুনা।

পয়েন্ট পেড্রো অনেক দূরের পথ, যেতে হলে ভাল একটা গাড়ি দরকার। কিন্তু এখন কোন রেন্ট-আ-কার কোম্পানির ধারেকাছে যাওয়াটা নেহাতই বোকামি হবে, কারণ এতক্ষণে নিশ্চয়ই মল্লিকার মৃত্যুসংবাদ ভবনিয়ার কানে পৌঁছে গেছে। সন্দেহ নেই, তার লোকজন এরই মধ্যে খুঁজছে ওকে।

ভাল একটা গাড়ি কোথায় পাওয়া যাবে জানে রানা।

তেইশ বন্দরনায়েক রোড। পাঁচতলা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের দুতলার ফ্ল্যাট। কলিংবেল বাজাতে যমুনাই দরজা খুলে দিল। এ মেয়ে শুধু আচার-আচরণেই সপ্রতিভ নয়, বেশভূষাতেও বুঝিয়ে দিতে চায় সে স্মার্ট, এবং বৈচিত্র্য পছন্দ করে। আঁটসাঁট যে জার্সি ব্লাউজটা পরেছে, তাতে রঙধনুর সাতটা রঙই খুঁজে পাওয়া যাবে; হালকা নীলের ওপর একই রঙের গাঢ় ডোরা কাটা স্ল্যাকস, দক্ষ হাতে তৈরি হওয়ায় দ্বিতীয় আরেক প্রস্থ ত্বকের মতই সেঁটে আছে গায়ে। বুকের সুডৌল গড়নটা এত আকর্ষণীয়, না তাকানোর জন্যে ব্রতচারী সন্ন্যাসী বা ধ্যানমগ্ন দরবেশ হওয়া চাই। তা না হলে মাসুদ রানা। না তাকিয়ে পারল ও, তবে নিজের এই কৃতিত্বে মোটেও বিস্মিত হলো না। কারণ সুগঠিত স্তন যতই আকর্ষণীয় হোক, তারচেয়ে অনেক বেশি মুগ্ধ করতে পারছে ওকে সূর্যমুখীর আদল ও সজীবতা নিয়ে যমুনার অবয়বটি, সেখানে বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটোয় সকৌতুক প্রশ্রয় যেমন আছে, তেমনি আছে রহস্য ভেদের নিরব আহ্বান।

'এটা কি তোমার একটা বদ-অভ্যাস? এই অসময়ে হাজির হওয়া?' জিজ্ঞেস করল যমুনা।

'এই যে তুমি বাংলায় কথা বলছ, শুনে আমি আশ্চর্য হচ্ছি

না,’ বলল রানা। ‘এটা আমার সাবধানতা। কারণ আশ্চর্য হলে এত ঘন-ঘন হতে হবে, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ব।’

‘খবর রাখো না, তাই জানো না,’ বলল যমুনা। ‘আমাদের এনজিও-র শাখা বাংলাদেশেও আছে, সেখানে আমি কয়েক বছর কাজও করেছি।’

‘আমি বাংলাদেশী, বাংলা আমার মাতৃভাষা, এ-সব তুমি কিভাবে জানলে জিজ্ঞেস করছি না–বিস্মিত হবার ভয়ে।’

‘ঘরে ঢোকো,’ পথ ছেড়ে দিয়ে বলল যমুনা। ‘তারপর দেখছি।’ সুরটা রীতিমত হুমকির মত শোনাল।

ভয়ে ভয়েই ড্রয়িংরূমে ঢুকল রানা। দরজা বন্ধ করে ঝপ করে কার্পেটে বসে পড়ল যমুনা, তারপর টুক করে রানার পায়ে হাত বুলিয়ে সেই হাত নিজের কপালে ঠেকাল। নেই, তবু কাল্পনিক ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকার ভঙ্গি করল, বলল, ‘আমাকে দোয়া করো, মাসুদ ভাই।’

রানা হাঁ হয়ে গেছে। বাকশক্তি ফিরে পেয়ে চাপা গলায় প্রায় গর্জে উঠল, ‘এই মেয়ে, কে তুমি?’

সুরেলা হাসি শুরু হবার পর তা যেন আর থামতেই চায় না। ‘কেমন মজা? কি, আশ্চর্য হওনি?’

আঙুল দিয়ে পিস্তল বানিয়ে যমুনার বুকের মাঝখানে তাক করল রানা। ‘সত্যি কথা বলো। কে?’

‘বস্, মানে, রাহাত খানের ভাষায়, বিসিআই-এর একটা অ্যাসেট,’ বলল যমুনা। ‘তিনি যখন তেল চুরির অ্যাসাইনমেন্টটা দেন তোমাকে, আমার পরিচয় ফাঁস হবার ঝুঁকি নিতে চাননি। তবে আমাকে নির্দেশ দেন, জরুরী প্রয়োজন দেখা দিলে আমি তোমাকে নিজের পরিচয় জানাতে পারব।’

‘সেদিন তাহলে রাস্তায় তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা কাকতালীয় ব্যাপার ছিল না?’

'না। আমি আসলে গোপনে তোমার ব্যাকআপ হিসেবে ওখানে ছিলাম।' যমুনা হাসছে।

যমুনার অস্বাভাবিক শান্ত আচরণের কারণটা এতক্ষণে রানার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। 'তোমার স্ট্যাটাস?'

'তার আগে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ যেটা সৃষ্টি হয়েছে, সেটা দূর করি,' বলল যমুনা। 'পায়ে হাত দেয়ার ব্যাপারটা স্রেফ কৌতুক ও অভিনয় ছিল, মাসুদ ভাই বলাটাও। আমি নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্যে বিশ্বাস করি না। ছোট বড় যদি আলাদা করতেই হয়, তার একমাত্র মাপকাঠি হতে হবে যোগ্যতা। যে মাপকাঠিতে তুমি আর আমি অফিশিয়ালি সমান–বিসিআই-এর অন্যতম দুর্ধর্ষ দশজন এজেন্টের মধ্যে আমিও একজন।'

'সেজন্যেই কি তুমি আমাকে বসতে বলছ না?'

'সত্যি দুঃখিত,' বলে রানার হাত থেকে ব্রীফকেসটা নিয়ে একটা সোফার ওপর রাখল যমুনা, সুটকেসটাও মেঝে থেকে তুলে সরিয়ে রাখল একপাশে, তারপর রানার বাহু ধরে টেনে এনে একটা সোফায় বসাল। 'কি খাবে, রানা? মানে, এত সকালে নিশ্চয়ই তোমার ব্রেকফাস্ট করা হয়নি?'

'তা তো হয়ইনি, রাতেও কিছু খাইনি আমি,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, জানি। মল্লিকা নিজেকে নিয়ে এতটাই অস্থির ছিল যে জিজ্ঞেসও করেনি তুমি কিছু খেয়েছ কিনা।'

'মানে?' এরকম অনেকদিন চমকায়নি রানা। 'তুমি জানলে কিভাবে?'

প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে যমুনা বলল, 'ওকে কিন্তু তুমি ইচ্ছা করলে বাঁচাতে পারতে, রানা।'

'তারমানে তুমি জানো, মল্লিকা আত্মহত্যা করেছে?' রানার বিস্ময় বাধ মানছে না। 'কিভাবে, যমুনা?'

‘ওখানে আমি ছিলাম না, কাজেই তাকে আমি আত্মহত্যা করতে দেখিনি,’ বলল যমুনা। ‘তবে তোমার চিৎকার শুনে বুঝে নিয়েছি কি ঘটল।’

‘ও, তারমানে মল্লিকার ঘরে মাইক্রোফোন রেখে এসেছ তুমি।’ এতক্ষণে ব্যাপারটা রানার বোধগম্য হলো।

‘পয়েন্ট পেড্রো থেকে তোমার সঙ্গে মানকুলামে আসার পর থেকেই মল্লিকার ওপর নজর রাখছিলাম আমি,’ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল যমুনা। ‘সে যাক, মেয়েটার জন্যে সত্যি আমার দুঃখ হচ্ছে।’

‘এ-কথা কেন বললে যে ইচ্ছা করলে ওকে আমি বাঁচাতে পারতাম?’ জিজ্ঞেস করল রানা, গম্ভীর।

‘ও যখন বলল যে গরমে ঘেমে যাচ্ছে, ঝুল-বারান্দার দিকের দরজাটা খুলে দাও, তখনই আমি বুঝতে পারি আটতলা থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করার কথা ভাবছে। তুমি বোঝোনি, এ আমি বিশ্বাস করি না।’

‘তুমি বলতে চাইছ, আমি ওকে আত্মহত্যার সুযোগ করে দিয়েছি?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

উত্তরে যমুনা বলল, ‘তোমার চিৎকার–“না! মল্লিকা, না!”–যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে বাজেনি আমার কানে।’

‘এ-ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই।’

‘এ-কথা বলে প্রসঙ্গটার ইতি টানা যায়–শুনতে ও বুঝতে আমার ভুলও হয়ে থাকতে পারে। আবার, আরেক দৃষ্টিতে, এটাই হয়তো সবদিক থেকে ভাল হয়েছে।’

‘বস্ তোমাকে বলেছেন, জরুরী প্রয়োজন দেখা দিলে নিজের পরিচয় আমাকে জানাতে পারবে, সেই জরুরী প্রয়োজনটা কি বলো এবার,’ জানতে চাইল রানা।

‘তার আগে তুমি বলো, আমার কাছে কি মনে করে এসেছ?’

‘মল্লিকা কি বলল, সবই তো শুনেছ। পয়েন্ট পেড্রোতে যাবার জন্যে আমার একটা গাড়ি দরকার।’

‘কিন্তু আমার ধারণা, গাড়ি নয়, আমাদের একটা হেলিকপ্টার দরকার।’

‘অন সেকেন্ড থট, ইয়েস,’ বলল রানা। ‘সেক্ষেত্রে আমরা পয়েন্ট পেড্রোতে যাচ্ছি পরে, তার আগে সাগরের ওপর চক্কর দিয়ে ব্রিগেডিয়ার মহব্বতজানের জাহাজ খুঁজে নিতে হবে।’

‘হেলিকপ্টারে যথেষ্ট ফায়ার পাওয়ার থাকতে হবে,’ বলল যমুনা। ‘হেলিকপ্টার ভাড়া করা বা ফায়ার পাওয়ার সংগ্রহ করা আমার জন্যে কোন সমস্যা নয়। বিশেষ কেমিকেল কমপাউন্ড মাখিয়ে নিতে হবে, রাডারে যাতে ধরা না পড়ে।’

‘ছদ্মবেশের কি হবে? ব্রিগেডিয়ার কেমন দেখতে আমরা জানি না। সাজনীন সম্পর্কেও একই কথা।’

‘ছদ্মবেশের কি কোন দরকার আছে?’ জিজ্ঞেস করল যমুনা। ‘ওরাও তো ব্রিগেডিয়ার বা তার প্রাইভেট সেক্রেটারিকে আগে কখনও দেখেনি।’

‘কিন্তু দুর্গে কবীর চৌধুরী অবশ্যই আসবে বলে আমার ধারণা,’ বলল রানা। ‘তোমাকে সে না চিনলেও, আমাকে চেনে।’

‘সেক্ষেত্রে যে-কোন ছদ্মবেশ নিলেই চলবে, হুবহু মহব্বতজান হবার দরকার নেই তোমার। আমার কাছে রাবারের তৈরি মুখোশ আছে, জেনুইন চুল-দাড়িসহ, রক্ত-মাংসের আসল মুখ বলেই মনে হবে।’

‘ব্রিগেডিয়ার আর তার সেক্রেটারি, দু’জনকেই খুন করবে ওরা।’

‘তার আগে একটু খেলিয়ে নেবে।’ হাসল যমুনা। ‘খুনটা করবে তেলখনি দেখিয়ে আনার পর।’

রানা দ্বিধাগ্রস্ত। ‘এটা মল্লিকার ধারণা ছিল।’

‘গিফট ভরা একজোড়া সুটকেস,’ বলল যমুনা। ‘ওগুলো ফেলে দিয়ে আমাদের সুটকেসে গিফটগুলো রাখব আমরা। আমাদের সুটকেসে জেলিগনাইট, ডিটোনেটর ও টাইম মেকানিজমও থাকবে। রিমোট কন্ট্রোল থাকবে একজোড়া, একটা তোমার কাছে, একটা আমার কাছে।’

‘সার্চ করে যদি কেড়ে নেয়?’

‘সার্চ করার সময় তোমার ঘড়ি কেড়ে নিতে পারে,’ বলল যমুনা। ‘কিন্তু কোমরের বেল্ট কেড়ে নেবে না। আমারটা হাত ব্যাগে। দুর্গে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে যদি ওরা মেরে ফেলতে চায়, সুটকেস দুটো ফাটিয়ে দেব। মাপ মতই বিস্ফোরক রাখা হবে, দুর্গটার যাতে কোন অস্তিত্বই না থাকে।’

‘কিন্তু তখনও তো আমরা দুর্গের ভেতরই থাকব, তাই না?’

‘হয়তো থাকব।’ যমুনা নির্লিপ্ত। ‘এরকম ঝুঁকি নিতে পারি বলেই তো আমরা বিসিআই এজেন্ট।’

‘এগারো তারিখে পয়েন্ট পেড্রোয় নোঙর ফেলার কথা ব্রিগেডিয়ারের,’ বলল রানা। ‘আমরা রওনা হব দশ তারিখে?’

একটু চিন্তা করল যমুনা, তারপর মাথা ঝাঁকাল। ‘হ্যাঁ।’

‘মাঝসাগরে জাহাজের ওপর ইন্টারপোল লেখা হেলিকপ্টার ঝুলতে দেখলে থামতে ওরা বাধ্য, কি বলো?’

যমুনার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ‘ভাল বুদ্ধি।’

‘লেখাটা?’

‘আমরা যাকে পাইলট হিসেবে নেব, তাকে ভাল একজন পেইন্টার হতে হবে,’ বলল যমুনা। ‘নির্জন সৈকতের অভাব নেই, হেলিকপ্টার নামিয়ে লেখার কাজটা সেরে নেবে সে। এরকম একজন পাইলটকে চিনি আমি।’

‘বন্দী খাস্তগীর আর সাজনীনকে নিয়ে তোমার ওই পাইলট কোথায় যাবে?’ জিজ্ঞেস করল রানা। ‘জাহাজের নাবিক ও ক্রুদের

কথাও ভুলো না। ওদেরকে নিয়েই বা কি করা হবে?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল যমুনা। 'দুর্গের আশপাশেই কোন পাহাড়ের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে হেলিকপ্টার, ব্যাকআপ হিসেবে। ক্রু আর নাবিক? সময় পাওয়া গেলে পাইলট ওদেরকে সেফ হাউসে রেখে আসবে।'

'দারুণ,' বলল রানা। 'কিন্তু পাইলট একা ওদেরকে সামলাবে, তারপর আবার ব্যাকআপ হিসেবে ভূমিকা রাখবে, সম্ভব?'

'অন্য কেউ হলে সম্ভব হত না, কিন্তু আমি যে পাইলটের কথা বলছি সে একাই একশো, একটা হাত না থাকা সত্ত্বেও!'

'হোয়াট!' চমকে উঠল রানা। 'তুমি...' আর কিছু বলতে পারছে না।

'হ্যাঁ, আমি আবার তোমাকে অবাক করে দিচ্ছি!' যমুনার সুরেলা হাসিটা এবার শুরু হতে না হতে থেমে গেল। 'পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে সোহেল ভাই কলম্বো থেকে মানকুলামে আবার ফিরে এসেছে। খালি হাতে নয়, ছোট্ট কিন্তু শক্তিশালী একটা রেডিও নিয়ে। ওটার সাহায্যে সরাসরি বসের সঙ্গে কথা বলতে পারবে, আবার কেউ যদি আমাকে প্রেম নিবেদন করে তা-ও শুনতে পাবে—দরকার হবে শুধু ছোট্ট একটা মাইক্রোফোন।'

'গুড গড!'

'ব্রেকফাস্টে কি তোমার পছন্দ, বলছ না কেন?'

'যা খুশি দাও,' বলল রানা। 'আমি ভাবছি হাতে যে চারদিন সময় আছে, সেটা কোথায় কিভাবে কাটাব।'

'আমি সারপ্রাইজ লেডি, ভুলে গেছ?' মিটিমিটি হাসল যমুনা। 'কথা দিচ্ছি, আমার এখানে থাকলে সময় কাটানো তোমার জন্যে কোন সমস্যা হবে না।'

এতক্ষণে রানা নিজেকে অনুমতি দিল। এবং তাকাল ও।

চেহারা লালচে হয়ে ওঠার আগেই ঘুরল যমুনা, 'আসছি,' বলে নিতম্বে ঢেউ তুলে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

নয়

ব্রিগেডিয়ার মহব্বতজান খাস্তগীর ঘাস খেয়ে আইএসআই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর হয়নি, সে খুব ভাল করেই জানে যে গোপনে লাভের টাকা আনতে গেলে পয়েন্ট পেড্রো থেকে তাকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে হবে না। সুযোগের অপেক্ষায় ছিল সে, কিভাবে শ্রীলঙ্কা ভ্রমণটাকে প্রকাশ্যে ঘোষিত সফরে পরিণত করা যায়। অপ্রত্যাশিত সুযোগটা তাকে এনে দিলেন লিবারেশন টাইগারস অভ তামিল ইলম-এর প্রধান বিরুপিল্লাই প্রভাকরণ। জানুয়ারি মাসের এক তারিখে নরওয়ের প্রাইম মিনিস্টার বন্ডেভিককে চিঠি লিখে তিনি জানালেন, উদ্যোগ যখন নিয়েছেই, শ্রীলঙ্কায় শান্তি আলোচনা শুরু করার স্বার্থে অসলোর উচিত সরকার ও টাইগার, দুই পক্ষকেই আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো। ওই চিঠি পেয়ে অসলো লন্ডনে একটা ডেলিগেশন পাঠাল, ওখানে প্রথমে তারা টাইগারদের প্রতিনিধি বালাসিঙ্গমের সঙ্গে আলোচনা করবে, তারপর শ্রীলঙ্কায় এসে সরকারী প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসবে–উদ্দেশ্য, আলোচনা শুরুর আগে উভয় পক্ষের শর্ত সম্পর্কে অবগত হওয়া। ইতিমধ্যে নয়া দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ করে অসলো জেনে নিয়েছে, শান্তি আলোচনায়

ভারতের সম্মতি আছে, এবং তারা পক্ষাবলম্বন থেকে বিরত থাকবে।

আইএসআই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে ব্রিগেডিয়ার খাস্তগীর বিরাট ক্ষমতার অধিকারী, মন্ত্রী মিনিস্টাররা পর্যন্ত তাকে সমীহ করেন, এমনকি রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণেও তার খানিকটা ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে। শ্রীলঙ্কায় সরকার ও গেরিলারা আলোচনায় বসতে যাচ্ছে, স্বভাবতই এ-ব্যাপারে ভারতেরও একটা বড় ভূমিকা থাকবে, এই যুক্তি দেখিয়ে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে উত্তেজিত করে তুলল ব্রিগেডিয়ার খাস্তগীর। শেষ পর্যন্ত তার উদ্দেশ্য পূরণ হলো, পাকিস্তান সরকার টাইগারদের প্রধান প্রভাকরণকে একটি বিশেষ বার্তা পাঠিয়ে জানাল, শান্তি আলোচনায় বসার স্থান এবং টাইগার প্রতিনিধিদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ দেয়ার জন্যে তারা তাদের গোয়েন্দা সংস্থার ডেপুটি ডিরেক্টর ব্রিগেডিয়ার খাস্তগীরকে পয়েন্ট পেড্রো হয়ে জাফনায় পাঠাতে চায়। এই প্রস্তাব যে প্রভাকরণ গ্রহণ করতে পারবেন না, ব্রিগেডিয়ার তা জানত। বিশেষ বার্তার উত্তরে প্রভাকরণ জানালেন, আপাতত বেশ কিছু দিন গোপন সফরে শ্রীলঙ্কার বাইরে থাকবেন তিনি, তাই আইএসআই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর যেন তাঁর সেকেন্ড-ইন-কমান্ড বিরুপিল্লাই ভবনিয়ার সঙ্গে পয়েন্ট পেড্রোতে দেখা করে যা বলার বলেন। এই বার্তা বিনিময় ও ব্রিগেডিয়ারের সফরের তারিখ কৌশলে মিডিয়াকেও জানিয়ে দেয়া হলো, ফলে ব্রিগেডিয়ারের আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফর আর গোপন কোন বিষয় থাকল না। তার ধারণা, সফরটা প্রকাশ্যে হওয়ায় ফোরবল-এর অন্যান্য পার্টনাররা তাকে খুন করার পরিকল্পনা বাতিল করতে বাধ্য হবে।

পয়েন্ট পেড্রোতে কোন এয়ারপোর্ট নেই, করাচী থেকে সরাসরি ওখানে পৌঁছাতে হলে সমুদ্রগামী জাহাজ দরকার হবে।

সেটা কোন সমস্যা হলো না, কারণ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তৎপরতা চালাবার জন্যে ছোট-বড় জাহাজের একটা বহর ভারত মহাসাগরে অনেক আগে থেকেই ব্যবহার করছে আইএসআই। চিরকুমার ব্রিগেডিয়ার খাস্তগীর তার সুন্দরী প্রাইভেট সেক্রেটারি সাজনীনকে নিয়ে শ্রীলঙ্কা সফরের জন্যে ছোট একটা জাহাজ বেছে নিল। জাহাজটায় কেবিন মাত্র দুটো, আর সব মিলিয়ে নাবিক ও ক্রুর সংখ্যা মাত্র তিনজন।

ব্রিগেডিয়ারের মনে খুন হয়ে যাবার ভয় ছিল, তাই তাকে অনেক কলকাঠি নেড়ে একটা অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হয়েছে; কিন্তু বিরুপিল্লাই ভবনিয়ার মনে কি ছিল বলা মুশকিল, ব্রিগেডিয়ারের আগমন উপলক্ষে পয়েন্ট পেড্রোর একটা অংশে কারফিউ জারি করল সে। শুধু তাই নয়, ব্রিগেডিয়ার নিষেধ করা সত্ত্বেও পাশে কবীর চৌধুরীকে নিয়ে জেটিতে সশরীরে উপস্থিতও থাকল।

চিরকুমার হলেও, ব্রিগেডিয়ার খাস্তগীর রোমান্টিকতার ভারী ভক্ত। তাই সাজনীন যখন বলল যে তার ইচ্ছা সাগরটা তারা রাতের অন্ধকারে পাড়ি দেবে, খুশি মনে সঙ্গে সঙ্গে তাতে সম্মতি জানাল সে। রওনা হবার পর ক্যাপটেন জানাল, ঝড়-টড় না উঠলে সকাল ঠিক আটটায় পয়েন্ট পেড্রোয় পৌঁছাবে তারা।

আইএসআই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর আসছেন, তাই দুর্গের কাছাকাছি জেলেদের নড়বড়ে জেটির পাশে নতুন একটা কাঠের জেটি বানানো হয়েছে। টাইগাররা কারফিউ জারি করায় সৈকতে সরকারী প্রশাসনের লোকজন, পুলিস বা জেলেরা আজ অনুপস্থিত। চারদিকে টহলরত সশস্ত্র টাইগারদেরই শুধু দেখা যাচ্ছে। বলাই বাহুল্য, এরা টাইগার হলেও সবাই ইউনিফর্ম পরা ভবনিয়া বাহিনীর সদস্য।

সকাল আটটার বদলে নতুন জেটিতে জাহাজটা ভিড়ল এক ঘণ্টা পর, ন'টায়। উত্তাল সাগর পাড়ি দিয়ে আসছে, কাজেই এরকম দেরি হতেই পারে, এনিয়ে কবীর চৌধুরী ও ভবনিয়া নিজেদের মধ্যে কোন আলোচনা করল না।

ব্রিগেডিয়ারকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে সৈকতে সংক্ষিপ্ত অথচ আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। জাহাজ জেটিতে ভিড়তে তোপধ্বনির মাধ্যমে সম্মানীয় মেহমানের আগমন বার্তা ঘোষিত হলো। ভবনিয়া বাহিনীর চীফ প্রটোকল অফিসার জাহাজে উঠে ব্রিগেডিয়ারকে এসকর্ট করে জেটিতে নামিয়ে আনল। ছোট্ট মঞ্চে কবীর চৌধুরীকে পাশে নিয়ে অপেক্ষা করছিল ভবনিয়া, চীফ প্রটোকল অফিসার বঙ্কিম মুরালি তাদের সঙ্গে ব্রিগেডিয়ার খাস্তগীরের পরিচয় করিয়ে দিল।

বিরুপিল্লাই ভবনিয়া পুরোদস্তুর সামরিক ইউনিফর্ম পরেছে, হাতে একটা ব্যাটন। কবীর চৌধুরী পরেছে অফ-হোয়াইট দামী কাপড়ের সুট, মাথায় সাদা-হ্যাট ও চোখে সানগ্লাস।

তোপধ্বনির পর পালা করে বাজানো হলো টাইগার ও ভবনিয়া বাহিনীর নিজস্ব দলীয় সঙ্গীত, সবশেষে পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত। ব্রিগেডিয়ার খাস্তগীর এমন কি ভবনিয়া বাহিনীর চৌকশ একটা কনটিনজেন্ট-এর দেয়া গার্ড-অভ-অনারও পরিদর্শন করল।

ব্রিগেডিয়ারকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত ঠিকই, তবে তারমানে এই নয় যে তার প্রাইভেট সেক্রেটারি সালেহা সাজনীনকে অবহেলা করা হচ্ছে। কবীর চৌধুরী আত্মভোলা বিজ্ঞানী, নারীর সৌন্দর্য তার মধ্যে বিশেষ কোন আবেদন সৃষ্টি করে না; কিন্তু বিরুপিল্লাই ভবনিয়া ভোগী পুরুষ, সুন্দরী মেয়েদের প্রতি তার বিশেষ লোলুপতা আছে। তার প্রমাণ পাওয়া গেল পরিচয় পর্বে–হ্যান্ডশেক করার সময় ইউরোপীয় কায়দায় সাজনীনের

হস্তচুম্বন করল সে, ধরার পর সেই কোমল হাত ছাড়তেও চাইছে না। মঞ্চেও সারাক্ষণ সাজনীনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মিষ্টি-মিষ্টি বুলিতে তার রূপমাধুর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হয়ে থাকল সে। সামরিক ইউনিফর্ম পরা একজন গেরিলা নেতাকে এই ভূমিকায় একদমই মানাল না।

মঞ্চ থেকে নেমে গাড়ির দিকে এগোল ওরা। গাড়ির বহরে একটা রোলসরয়েস ও দুটো মার্সিডিজ রয়েছে। রোলসরয়েসে ব্রিগেডিয়ার খাস্তগীর আর কবীর চৌধুরী উঠবে, পিছনের মার্সিডিজে উঠবে সাজনীন আর ভবনিয়া। তৃতীয় গাড়িটায় উপহারসামগ্রী ভরা প্রকাণ্ড একজোড়া চামড়ার সুটকেস ও মেহমানদের ব্যক্তিগত লাগেজ তোলা হবে।

গাড়ির দিকে এগোবার সময় ব্রিগেডিয়ার খাস্তগীর হঠাৎ থেমে জেটি ও সাগরের দিকে একবার তাকাল। জেটি থেকে বেশ খানিক দূরে বিরাট একটা কার্গো ভেসেল নোঙর ফেলেছে। মোটর বোটের একটা ঝাঁক ভারী চটের বস্তা নিয়ে জেলেদের জেটি থেকে ওই জাহাজে ঘন-ঘন আসা-যাওয়া করছে। সেদিকে ভবনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ব্রিগেডিয়ার জানতে চাইল, 'জাহাজটায় কি এত লোড করা হচ্ছে বলুন তো?'

'আর বলবেন না,' অসহায় একটা ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকাল ভবনিয়া। 'সে এক লম্বা কাহিনী...'

'ব্যাপারটা আমি ব্যাখ্যা করছি,' ব্রিগেডিয়ারের পাশ থেকে বলল কবীর চৌধুরী। 'আপনি আইএসআই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর, কাজেই ওই শালাকে খুব ভাল করেই চেনেন, নাম শুনলেই চমকে উঠবেন...'

ব্রিগেডিয়ার ভুরু কোঁচকাল। 'কি নাম? তার সঙ্গে জাহাজে ওই কার্গো লোড করার কি সম্পর্ক?' বিরাট গোঁফ জোড়াও ঝুলে পড়ল তার।

'সম্পর্ক আছে, ভাই, সম্পর্ক আছে,' বলল কবীর চৌধুরী। 'আমার পরম শত্রু, আপনাদেরও জানি দুশমন, তার নাম মাসুদ রানা। আমার ধারণা, আশপাশেই কোথাও আছে সে।'

ব্রিগেডিয়ার খাস্তগীর চমকেই উঠল। 'মাসুদ রানা!' চারদিকে দ্রুত একবার চোখ বুলাল সে। তারপর হেসে উঠে বলল, 'দূর, আপনি ঠাট্টা করছেন। এখানে ওই আপদ আসবে কোত্থেকে?'

'হাসবেন না, মিস্টার খাস্তগীর, হাসবেন না!' কবীর চৌধুরী সিরিয়াস। 'মাসুদ রানাকে তো আপনি চেনেন, তার পক্ষে অসম্ভব বলে কিছু নেই। বাংলাদেশের তেল চুরি হচ্ছে, এরকম একটা গুজব শুনে গন্ধ শুঁকে শুঁকে ওই ব্যাটা পয়েন্ট পেড্রোয় চলে এসেছিল। বললে বিশ্বাস করবেন, মি. ভবনিয়ার দুর্গে একটা রাত কাটিয়েও গেছে সে!'

ভবনিয়া মাঝখান থেকে বলল, 'আমার এক লেডি এজেন্টের গাফিলতির কারণে দুর্গে তাকে আমরা খতম করতে পারিনি। পরে মানকুলাম ও জাফনায় আমাদের বেশ কয়েকজন এজেন্টকে আহত ও খুন করেছে সে। এমনকি সেই লেডি এজেন্টকেও আটতলা ফ্ল্যাট থেকে নিচের রাস্তায় ফেলে দিয়ে খুন করেছে...'

'বলেন কি!' ব্রিগেডিয়ারের দীর্ঘ গোঁফ আরও একটু ঝুলে পড়ল।

'দুর্গে যখন রাত কাটিয়েছে, তখন আর তার জানতে বাকি নেই যে ওখানে মি. ভবনিয়ার কয়েকশো টন সোনা আছে,' বলল কবীর চৌধুরী। 'তাই সব সোনা সরিয়ে ফেলছেন উনি... '

'ও, আচ্ছা। তা ভালই করছেন, সাবধানের মার নেই,' বলল ব্রিগেডিয়ার। 'কিন্তু মিস্টার ভবনিয়া, আপনি জানিয়েছিলেন লাভের অংশ নগদে নয়, সোনায় দেয়া হবে আমাকে। সব সোনা যদি...'

'এ নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না,' আশ্বস্ত করল ভবনিয়া।

‘জাহাজ লোড করতে আরও চব্বিশ ঘণ্টা সময় লাগবে। কাল সকালে যখন দেশে ফিরবেন, আপনাদের জাহাজে আপনার ভাগের সোনা তুলে দেয়া হবে।’

‘অসংখ্য ধন্যবাদ।’ ব্রিগেডিয়ার তৃপ্তির হাসি হাসল। ‘এরকম আনন্দঘন মুহূর্তে স্বভাবতই আইএসআই অফিসার খিজির হায়াতের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার। আমরা, ফোরবলের সদস্যরা, এই যে দুটো পয়সার মুখ দেখছি, এর পিছনে তার অবদানই সবচেয়ে বেশি। আমার নির্দেশে সে যদি পুরানো জরিপ রিপোর্ট খুঁজে বের না করত, বাংলাদেশের এই তরল সোনা আরও কতকাল অনাবিষ্কৃতই থেকে যেত কে জানে...’

এ-প্রসঙ্গে কবীর চৌধুরী ও ভবনিয়া কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকল।

গাড়ির বহর রওনা হলো। সামনে ও পিছনে একঝাঁক করে মোটরসাইকেল, আরোহীদের সবার কাঁধে অটোমেটিক রাইফেল ঝুলছে, কোমরে জড়ানো হোলস্টারে একটা করে পিস্তলও আছে।

রোলসরয়েসে আরোহী মাত্র দু’জন, কবীর চৌধুরী ও ব্রিগেডিয়ার। দুর্গে যাবার পথে কবীর চৌধুরী আজ সারাদিনের প্রোগ্রাম সম্পর্কে একটা ধারণা দিল ব্রিগেডিয়ারকে। দুর্গের সবচেয়ে বিলাসবহুল একজোড়া বেডরূম মেহমানদের জন্যে বরাদ্দ করা হয়েছে—পাশাপাশি কামরা হলেও মাঝখানে একটা দরজা আছে, আসা-যাওয়া করতে কোন অসুবিধে নেই। বিশ্রাম, গোসল ও দুর্গ পরিদর্শনের জন্যে দেড় ঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে। ঠিক বারোটার সময় লাঞ্চ। দুর্গের ছাদে বড় একটা হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছে, ঠিক সাড়ে বারোটার সময় কবীর চৌধুরী ও বিরুপিল্লাই ভবনিয়া মেহমানদের নিয়ে বাংলাদেশ অভিমুখে রওনা হবে তেলখনি দেখার জন্যে। অনেকদূরের পথ, পৌঁছাবার পর দেখারও অনেক কিছু আছে, কাজেই দুর্গে ফিরে আসতে রাত হয়ে

যাবে। ফেরার পর ডিনার। ডিনারের পর, ব্রিগেডিয়ার খাস্তগীর যদি ইচ্ছা করেন, তার জাহাজে সোনা লোড করার কাজ কতটুকু এগোল দেখার জন্যে জেটিতে একবার যেতে পারেন। রাতে আর কোন অনুষ্ঠান নেই। পরদিন সকালে মেহমানদের বিদায় জানানো হবে।

পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টার কর্মসূচি বর্ণনা করার পর কবীর চৌধুরী সবিনয়ে জানতে চাইল, ব্রিগেডিয়ার কি এর মধ্যে কোন পরিবর্তন আনতে চান। মহব্বতজান খাস্তগীর, অর্থাৎ ছদ্মবেশী এমআরনাইন হাসিমুখে মাথা নাড়ল।

হাসলেও, রানা জানে, ব্রিগেডিয়ার খাস্তগীর ও তার সেক্রেটারি সাজনীনকে খুন করা হবে। তবে সেটা কোথায় বা কখন ঘটবে, এখনও আন্দাজ করতে পারছে না ও। কবীর চৌধুরী যে কর্মসূচির কথা বলছে তা আদৌ অনুসরণ করা হবে কি না তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে ওর। খুন যদি করা হয়ই, ব্রিগেডিয়ার আর তার সেক্রেটারিকে তেলখনি দেখাতে নিয়ে যাবার ঝামেলার কি দরকার?

মনটা খুঁত-খুঁত করছে রানার। এমন কি হতে পারে, ওদের পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে? এ প্রশ্ন ওঠার কারণ আছে। মাঝ সাগরে মাথার ওপর ইন্টারপোল লেখা হেলিকপ্টার দেখে ব্রিগেডিয়ার খাস্তগীর ক্যাপটেনকে জাহাজ থামাবার নির্দেশ দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তারপর হুইলহাউসে তার আচরণ ছিল রহস্যময় ও সন্দেহজনক। ইন্টারপোল অফিসাররা একজন আন্তর্জাতিক স্মাগলারকে খুঁজছে, কাজেই জাহাজটা তারা সার্চ করতে চায়, হেলিকপ্টার থেকে হ্যান্ডমাইকে সোহেলের এ-কথা শোনার পর জাহাজের নাবিক ও ক্রুরা সহযোগিতা করতে রাজি হয়। দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে রানা যখন রশির মই বেয়ে জাহাজের ডেকে নামতে শুরু করল, দেখা গেল হুইলহাউসে দাঁড়িয়ে রেডিও অন করে কার

সঙ্গে যেন যোগাযোগের চেষ্টা করছে ব্রিগেডিয়ার খাস্তগীর। খুব বেশি সময় পায়নি সে, কারণ এক মিনিট পরই পিস্তল দেখিয়ে ডেকে বের করে আনা হয় তাকে। কিন্তু এক মিনিটও কম সময় নয়, অন্তত কাউকে সতর্ক করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

ব্রিগেডিয়ার, তার সেক্রেটারি সাজনীন, নাবিক ও ক্রুদের বন্দী করে হেলিকপ্টারে তুলে দেয়া হয়; রানা এজেন্সির তিনজন এজেন্ট ও সোহেল তাদেরকে নিয়ে রওনা হয়ে যায় ক্যান্ডি-র উদ্দেশে—ওখানে রানা এজেন্সির একটা সেফহাউস আছে, বন্দীদেরকে সেখানেই আটকে রাখা হবে।

বন্দী হবার আগে ব্রিগেডিয়ার খাস্তগীরের সন্দেহজনক আচরণ সোহেলও দেখেছে, কাজেই সেফহাউসে নিয়ে যাবার পর অবশ্যই তাকে ইন্টারোগেট করবে সে, কিন্তু তার ফলাফল তো আর রানা জানতে পারছে না। ব্যাকআপ হিসেবে হেলিকপ্টার নিয়ে আজই পয়েন্ট পেড্রোয় ফিরে আসবে সোহেল, কাছাকাছি কোন পাহাড়ের চূড়া থেকে লক্ষ রাখবে দুর্গের ওপর।

সোহেল জানে, কবীর চৌধুরী ও বিরুপিল্লাই ভবনিয়া ব্রিগেডিয়ার খাস্তগীর অর্থাৎ রানাকে তেলখনি দেখাতে বঙ্গোপসাগরের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এ-কাজে হেলিকপ্টার ব্যবহার করার সম্ভাবনাই বেশি। দুর্গ থেকে কোন হেলিকপ্টারকে উড়তে দেখলে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে সেটাকে অনুসরণ করবে সোহেল। ওর হেলিকপ্টারটা ভাড়া করা হলেও, কলম্বো থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হলে একটা রকেট লঞ্চার বসিয়ে নেবে। আরও একটা কাজ করবে সোহেল। ঢাকা থেকে বিশেষ একটা কেমিকেল কম্পাউন্ড পাঠাবার কথা, সেটা যদি ওর হাতে সময়মত পৌঁছায়, ওই কম্পাউন্ড দিয়ে কপ্টারটা ভিজিয়ে নেবে। তাহলে আর ওই হেলিকপ্টার কোন রাডারে ধরা পড়বে না।

শার্টের বোতামে মাইক্রোফোন থাকায় যার সঙ্গেই কথা বলুক

রানা, হেলিকপ্টারে বসে সবই শুনতে পাবে সোহেল, এবং পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থাও নিতে পারবে।

এই তেল খনি দেখতে নিয়ে যাবার ব্যাপারটা ছাড়া কবীর চৌধুরী বা বিরুপিল্লাই ভবনিয়ার আচরণে এখন পর্যন্ত এমন কিছু দেখেনি রানা যাতে সন্দেহ করা যায় যে ওদের পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে। মনের খুঁতখুঁতে ভাবটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল ও।

প্রবল একটা কৌতূহল আবার রানাকে অস্থির করে তুলল। এখুনি যদি জানা যেত তেলখনিটা বাংলাদেশের ঠিক কোথায়!

কিন্তু না, এ-ব্যাপারে কবীর চৌধুরীকে কোন প্রশ্ন করা যাবে না। কারণ ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের সার্ভে রিপোর্ট ও মানচিত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে বাংলাদেশের ঠিক কোথায় তেল পাওয়া যেতে পারে, এবং এ সংক্রান্ত কাগজ-পত্র সবই ব্রিগেডিয়ার খাস্তগীরের খুঁটিয়ে দেখা আছে। অর্থাৎ প্রশ্ন করাটা নেহাতই একটা বে-আক্কেলে ব্যাপার হবে। তবে কৌতূহল দমন করাও অসম্ভব মনে হচ্ছে। প্রসঙ্গটা রানা অন্যভাবে তুলল, 'আচ্ছা, বলুন তো মিস্টার চৌধুরী। বাংলাদেশকে ফাঁকি দিয়ে কতদিন আমরা এই তেল চুরি করতে পারব?'

'কি বললেন? চুরি?' রাগে লালচে ও ডিমের মত বড় হয়ে উঠল চৌধুরীর চোখ দুটো। 'কি আশ্চর্য, এই ভাষা তো একজন বাংলাদেশী ব্যবহার করবে, কিন্তু আপনি তো একজন পাকিস্তানী!'

মুচকি একটু হাসল রানা। 'প্রসঙ্গটা যখন উঠলই, সবিনয়ে স্মরণ করছি—আপনাকে কিন্তু আমি একজন বাংলাদেশী বলেই জানি।'

'আপনার জানাটা অর্ধেক সত্য,' বলল কবীর চৌধুরী। 'বাংলাদেশে আমার জন্ম, এ-কথা ঠিক। তবে মানবকল্যাণে নিবেদিত একজন বিজ্ঞানী হিসেবে আমার কোন দেশ নেই। নিজেকে আমি বিশ্ব-নাগরিক বলে মনে করি।'

‘তাহলে বলুন, একজন বিশ্ব-নাগরিক এই ব্যাপারটাকে কি ভাষায় অভিহিত করবে?’

‘আহরণ, ব্রিগেডিয়ার, আহরণ,’ বলল কবীর চৌধুরী। ‘প্রকৃতির ভাণ্ডারে অফুরন্ত সম্পদ লুকিয়ে আছে, একমাত্র যার যোগ্যতা আছে সে-ই তা আহরণ করতে পারে। প্রাকৃতিক কোন সম্পদের গায়ে লেখা থাকে না যে এটা অমুক দেশের। কাজেই চুরির প্রশ্ন তো উঠতেই পারে না। তাছাড়া, তেলটা বাংলাদেশের হলেও, আমরা বাংলাদেশের জলসীমার বাইরে থেকে তা আহরণ করছি। ওদের তো এ-কথা বলারই অধিকার নেই যে ওই তেল ওদের।’

রানা জোর করে হাসল। ‘শুনে খুশি হলাম, মিস্টার চৌধুরী। তাহলে আশা করতে দোষ নেই যে এই তরল সোনা আরও বহু বছর...কি বলে...আহরণ করতে পারব আমরা?’

‘এ-ব্যাপারে আমার অন্তত কোন সন্দেহ নেই।’

‘তবে শুধু ওই মাসুদ রানার ব্যাপারে একটু সাবধান থাকতে হবে, কি বলেন?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘হ্যাঁ, সে খুব শক্ত প্রতিপক্ষ,’ সায় দিল কবীর চৌধুরী। ‘তবে চিন্তা করবেন না, তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে।’

‘ভেরি গুড!’ রানা উৎফুল্ল। ‘তা একটু যদি আভাস দেন কি ব্যবস্থা করা হচ্ছে, মনে খানিকটা শান্তি পাই।’

ড্রব্রিজ পার হয়ে দুর্গের ভেতর ঢুকছে গাড়ির বহর।

কবীর চৌধুরী হাসল। ‘নিজের চোখেই তো দেখলেন মিস্টার ভবনিয়া দুর্গ থেকে সমস্ত সোনা সরিয়ে নিচ্ছেন। কারণ হলো, আমরা ধারণা করছি, ছদ্মবেশ নিয়ে দুর্গে হানা দেবে মাসুদ রানা। আমরা চাইছিও তাই। সব ব্যবস্থা করা আছে, দুর্গেই তাকে কবর দেয়া হবে। জ্যান্ত।’

খেদ প্রকাশের সুরে রানা বলল, ‘আমার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে

যে এরকম একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা আমি দেখতে পাব না।'

'কে বলল দেখতে পাবেন না?' কবীর চৌধুরী হাসছে।

'না, মানে, কাল সকালেই তো চলে যাব আমি, তাই না?'

'আপনাকে চলে যেতে দিচ্ছেটা কে?' কবীর চৌধুরীর ঠোঁটে রহস্যময় হাসি। 'আমি বা বন্ধুবর মি. ভবনিয়া, কেউ আমরা আপনাকে ছাড়ছি না। একবার যখন দুর্গটা দেখে গেছে, এ-ও জেনেছে যে ফোরবল-এর এটা একটা ঘাঁটি, হাজার হাজার পিপে ভর্তি সোনা আছে এখানে, কাজেই খুব তাড়াতাড়ি হানা দেবে রানা। আমার তো ধারণা, দু'একদিনের মধ্যেই। আসুক, আমরা তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছি। আপনিও বিদায় নেবেন ওই দৃশ্যটা দেখার পর।'

'এরকম একটা সুযোগ আমিও হাতছাড়া করতে চাই না,' বলল রানা। 'তবে রানাকে চিনি তো, তাই খানিকটা শঙ্কিতও বোধ না করে পারছি না। যদি সে আসেই, নিজেকে রক্ষা করার প্রস্তুতি না নিয়ে কি আসবে? কিংবা ব্যাকআপ না নিয়ে?'

কবীর চৌধুরী গম্ভীর হয়ে গেল। জবাব দিতে কয়েক সেকেন্ড দেরি করল সে। 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন আপনি, মিস্টার খাস্তগীর। রানার প্রস্তুতি ও ব্যাকআপ সম্পর্কে অবশ্যই পরিষ্কার একটা ধারণা পেতে হবে আমাদের।'

'কিভাবে তা সম্ভব?' জানতে চাইল রানা।

রোলসরয়েস উঠানের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু ওরা নামছে না।

'ধরা পড়লেই সম্ভব। টরচার করলে বাপ বাপ করে বলে দেবে সব।' কি যেন চিন্তা করল কবীর চৌধুরী। তারপর আবার বলল, 'সবচেয়ে ভাল হত, ধরার পর ওকে যদি তেলখনিটা দেখিয়ে আনতে পারতাম।'

'বুঝলাম না,' বলল রানা।

'বুঝলেন না? আরে ভাই, আমি বলতে চাইছি, হেলিকপ্টারে তুলে আমরা তাকে বঙ্গোপসাগরে নিয়ে যেতাম। তারপর গিরিখাদের ভেতর তেলের উৎসমুখ, আন্ডারওয়াটার প্লাটফর্ম, পাইপিং অ্যারেঞ্জমেন্ট ইত্যাদি সব ঘুরিয়ে দেখাতাম। সারাটা দিন আমাদের সঙ্গে রাখলে তার প্রস্তুতি আর ব্যাকআপ সম্পর্কে নিশ্চয়ই একটা ধারণা পেতাম আমরা।'

রানা কিছু বলতে যাচ্ছিল, ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে কবীর চৌধুরীকে স্যালুট করল। ভবনিয়াকে দেখতে পেল রানা; সাজনীন, অর্থাৎ যমুনাকে পাশে নিয়ে রোলসরয়েসের দিকে হেঁটে আসছে। ভবনিয়ার কি একটা রসিকতায় হেসে গড়িয়ে পড়ার অবস্থা হলো যমুনার। রানাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে একটা হাত তুলে আঙুলগুলো নাচাল সে। এ সঙ্কেতের অর্থ একমাত্র রানাই জানে। যমুনা বলতে চাইছে, সে তার রূপ-যৌবনের টোপ দিয়ে বিরুপিল্লাই ভবনিয়াকে গেঁথে ফেলেছে।

দশ

চীফ প্রটোকল অফিসার দু'জন সশস্ত্র গেরিলাকে সঙ্গে নিয়ে রানা ও যমুনাকে ওদের বেডরূমে পৌঁছে দিল। দুটো আলাদা দরজা দিয়ে যে যার কামরায় ঢুকে প্রথমেই ওরা বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল, চারদিকে চোখ বুলিয়ে ক্যামেরার লেন্স খুঁজছে।

প্রতিটি কামরার সবগুলো কোণে একটা করে লেন্স দেখল ওরা। এরপর আর মাইক্রোফোন খুঁজতে যাবার কোন মানে হয় না, ধরে নিতে হয় প্রতিটি ফার্নিচারের ফাঁক-ফোকরে একটা করে গুঁজে রাখা হয়েছে।

দশ মিনিট পর দুই বেডরূমের মাঝখানের দরজা খুলে রানার কামরায় ঢুকল যমুনা। সে সতর্ক, বেফাঁস কিছু বলবে না; রানাও তাই।

'স্যার,' বলল যমুনা, 'ওরা তো দেখছি আমাদের লাগেজ এখনও দিয়ে যায়নি। গোসল করে তৈরি হতে হবে না?' সে আসলে উপঢৌকন ভর্তি চামড়ার সুটকেস দুটোর কথা ভেবে চিন্তিত।

'একটু ধৈর্য ধরো, সাজনীন,' গলায় বস্‌সুলভ খানিকটা গাম্ভীর্য এনে বলল রানা। 'চাকরবাকররা একটু ঢিলেমি করেই। আরেকটু দেখো, তারপর নাহয় টেলিফোন করে চীফ প্রটোকল অফিসারকে জানাও ব্যাপারটা।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে যমুনা বলল, 'স্যার...ইয়ে, মানে, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই...'

'কি ব্যাপার, সাজনীন?'

'স্যার, আপনি যদি অনুমতি দেন, দুপুরে আমি লম্বা একটা ঘুম দিতে চাই,' বলল যমুনা। 'আসলে শরীরটা তেমন ভাল নেই। শুনে মিস্টার ভবনিয়া বললেন, হেলিকপ্টারে চড়ে অত দূরে আসা-যাওয়া করাটা আমার উচিত হবে না।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। 'কিন্তু এত বড় দুর্গে একা থাকবে তুমি, ভয় লাগবে না?'

'জ্বী-না, একা থাকব না,' বলল যমুনা। 'মিস্টার ভবনিয়া বলেছেন আমাকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে তিনিও থাকবেন।'

'ও, আচ্ছা। মিস্টার ভবনিয়াকে পারফেক্ট ভদ্রলোক বলেই

মনে হয়েছে আমার, কাজেই তাঁর দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হবে বলে মনে করি না। তবু, সাবধানের মার নেই, একটু সাবধানেই থেকো।'

টেলিফোন করতে হলো না, ওদের লাগেজ ও চামড়ার বিরাট সুটকেস দুটো পৌঁছে দিয়ে গেল চারজন গার্ড। ওদের সঙ্গে চীফ প্রটোকল অফিসার বঙ্কিম মুরালিও রয়েছে।

'কয়েকটা প্রসঙ্গ, স্যার,' হাসিমুখে রানাকে বলল সে। 'সবগুলোই স্পর্শকাতর। অনুমতি দেন তো বলি।'

'নো পারমিশন! গেট লস্ট!' কৌতুক করল রানা।

'আই অ্যাপ্রিশিয়েট ইওর উইটিসিজম, স্যার।' বঙ্কিম মুরালির মুখে আরও চওড়া হলো হাসিটা। 'মে আই?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'অফকোর্স।'

'প্রথমে জানতে চাইছি, আপনাদের সঙ্গে কি কোন স্মল আর্মস আছে?' জিজ্ঞেস করল মুরালি। 'আপনি একটা এসপিওনাজ এজেন্সির ডেপুটি ডিরেক্টর, সঙ্গে আর্মস থাকাটা স্বাভাবিক। ধরে নিচ্ছি, মিস সাজনীন শুধু প্রাইভেট সেক্রেটারি নন, তিনি আপনার বডিগার্ডও, কাজেই তাঁর কাছেও পিস্তল থাকার কথা।'

'থাকার কথা, আছেও,' বলল রানা। 'তাতে অসুবিধে কি?'

'কোন অসুবিধে নেই, স্যার,' বলল মুরালি। 'তবে একটা নিয়ম আছে। নিয়ম না বলে এটাকে আসলে ঐতিহ্য বলাই ঠিক। সেটা হলো, এই দুর্গে যাঁরা মেহমান হয়ে আসেন তাঁদের নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন দুর্গের মালিক স্বয়ং। কাজেই, তারপরও যদি কোন মেহমান নিজের কাছে অস্ত্র রাখেন, মেজবানকে এক ধরনের অপমান করা হয়। আপনারা নিশ্চয়ই চাইবেন না যে মি. বিরুপিল্লাই ভবনিয়া অপমানিত বোধ করেন?'

পকেট থেকে একসেট চাবি বের করে একটা ব্রীফকেসের ওপর রাখল রানা। 'দুটো পিস্তলই এই ব্রীফকেসে পাবেন। নিয়ে যান।'

একজন গার্ডকে ইঙ্গিত করল বঙ্কিম মুরালি। সে এগিয়ে এসে ব্রীফকেসটা খুলছে।

'দ্বিতীয় স্পর্শকাতর বিষয়টি হলো, স্যার,' বলল প্রটোকল প্রধান, 'চামড়ার ওই বিরাট দুই সুটকেস। আমাদের জানা মতে, ওগুলোয় উপহার সামগ্রী আছে, বিজনেস পার্টনারদের প্রেজেন্ট করবেন।'

'হ্যাঁ, প্রেজেন্ট করব বলেই তো এত কষ্ট করে বয়ে নিয়ে আসা,' বলল রানা। 'তবে আপনাদের নিয়ম বা ঐতিহ্য যদি বলে কাউকে কিছু উপহার দেয়া যাবে না, তাহলে সুটকেসগুলো আবার আমার জাহাজে রেখে আসতে বলুন।'

'না-না, মিস্টার খাস্তগীর, না–উপহার অবশ্যই দেয়া যাবে,' তাড়াতাড়ি বলল বঙ্কিম মুরালি, 'তবে নিয়ম হলো, আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করার আগে প্রতিটি আইটেম পরীক্ষা করা হবে।'

'সেজন্যেই কি ওগুলো এখানে পৌঁছাতে এত দেরি হলো?' রানা নয়, ওর পাশ থেকে প্রশ্ন করল যমুনা।

'সত্যি কথা বলতে কি, হ্যাঁ,' অম্লান হেসে বলল মুরালি। 'সুটকেস দুটো খোলার চেষ্টা করা হচ্ছিল, কিন্তু পারা গেল না। আসলে চাবি ছাড়া ওই পাকিস্তানী তালা খোলা সম্ভব নয়।'

'এক মিনিট,' বলে নিজের বেডরূমে চলে গেল যমুনা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাতব্যাগ নিয়ে ফিরে এল সে। হাতব্যাগ থেকে চাবির একটা গোছা বের করে বাড়িয়ে দিল মুরালির দিকে। 'নিন, সুটকেস খুলে আমাদের সামনেই সব পরীক্ষা করুন।'

একটা সুটকেস খুলে উপহারগুলো বের করা হলো, প্রতিটি

আইটেম খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হবে। গিফট হিসেবে এমন সব আইটেম নিয়ে আসা হয়েছে, পরীক্ষা করতে যাওয়াটাই হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। বাক্স ভর্তি রেশমি রুমাল বা টাই বিপজ্জনক হয় কি করে? তবে বঙ্কিম মুরালির নির্দেশে গার্ডরা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করল। মুক্তোর হার, স্বর্ণালঙ্কার, পার্কার ও শেফার্স কলম, চুলের কাঁটা, আতরের শিশি, কৌটা ভর্তি জাফরান, নকশাদার নাগরা জুতো, কাশ্মীরী শাল ইত্যাদি প্রতিটি আইটেম ধৈর্য ধরে পরীক্ষা করল তারা। তারপর দ্বিতীয় সুটকেসটা খোলা হলো। বলাই বাহুল্য, এটাতেও ক্ষতিকর বা আপত্তিকর কিছু পাওয়া গেল না।

বঙ্কিম মুরালি দুঃখ প্রকাশ করে বলল, 'বিশ্বাস করুন, স্যার ও ম্যাডাম, আপনাদেরকে এভাবে বিব্রত করার জন্যে ব্যক্তিগতভাবে আমি সত্যি মর্মাহত...'

'এভাবে অপমান করা হবে জানলে আমি অন্তত মি. ভবনিয়ার অতিথি হতে এখানে আসতাম না,' চোখ গরম করে বলল যমুনা, তাকিয়ে আছে রানার বেডরূমের সিলিঙের এক কোণে, সরাসরি একটা লেন্সের দিকে। 'কথাগুলো আপনাকেই বলছি, মিস্টার ভবনিয়া। দুটো ঘরেই আপনি ক্যামেরা লুকিয়ে রেখেছেন, খুঁজলে ডজন ডজন মাইক্রোফোনও পাওয়া যাবে। এ-সব যখন আছে, জানা কথা মনিটরে চোখ রেখে আমাদেরকে দেখেছেনও আপনি। আমার শুধু একটাই প্রশ্ন। সিকিউরিটির প্রয়োজন আছে, এ আমিও স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলে একটা মেয়ে তার প্রাইভেসী রক্ষা করতে পারবে না—বেডরূমে নয়, এমনকি বাথরূমেও নয়?'

যমুনা থামতে রানা নরম গলায় বলল, 'শান্ত হও, সাজনীন। আসলে মিস্টার ভবনিয়াকে দোষ দেয়াটা তোমার উচিত হচ্ছে না। সিকিউরিটির এই অ্যারেঞ্জমেন্ট তো আর বিশেষভাবে আমাদের জন্যে করা হয়নি, এ-সব অনেক আগে থেকে ফিট করা

আছে...'

'ঠিক আছে, আপনার যুক্তি মানলাম, স্যার–আগে থেকে ফিট করা আছে,' বলল যমুনা। 'কিন্তু এখন কি হবে? মনিটরে একা শুধু মিস্টার ভবনিয়া তাকিয়ে আছেন, এ আমি বিশ্বাস করব কিভাবে? আমি কাপড় পাল্টাব, গোসল করব–এ-সব একদল লোক স্ক্রীনে চোখ রেখে দেখবে? স্যার, আপনি থাকতে চান থাকুন, কিন্তু আমি এখানে আর এক মুহূর্তও থাকতে রাজি নই।' মুখ তুলে আবার লেন্সের দিকে তাকাল সে। 'মিস্টার ভবনিয়া, দয়া করে আপনি আমাকে জাহাজে দিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন, প্লীজ।'

যমুনা থামতেই পিপ্ পিপ্ করে শব্দ হলো। ব্যস্ত ভঙ্গিতে ট্রাউজারের পকেটে হাত ভরে একটা সেল ফোন বের করল বঙ্কিম মুরালি। ইনকামিং কলটা মনোযোগ দিয়ে মিনিটখানেক শুনল সে, তারপর সেট অফ করে পকেটে রেখে দিল আবার। এক পা এগিয়ে যমুনার সামনে চলে এল সে। 'ম্যাডাম, মিস্টার বিরুপিল্লাই ভবনিয়া তাঁর পক্ষ থেকে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বললেন আমাকে। মি. খাস্তগীরের কথাই ঠিক, অ্যারেঞ্জমেন্টটা আসলে অনেক আগের, সময়ের অভাবে আপনাদের বেডরূম থেকে ক্যামেরাগুলো সরানো হয়নি। আমাদের নেতা আরও জানালেন, বাথরূমগুলোয় ক্যামেরা বা মাইক্রোফোন কিছুই নেই। খুব ঝামেলার কাজ, তাই শুধু একটা বেডরূমের ক্যামেরা সরিয়ে নেয়া হচ্ছে–আপনারটার।'

'ধন্যবাদ,' নরম সুরে বলল যমুনা, লেন্সের দিকে তাকিয়ে। 'এখন আমি সারাটা দুপুর শান্তিতে ঘুমাতে পারব।'

মনে মনে হাসল রানা, যমুনা যেভাবে প্ররোচিত করছে, ও কবীর চৌধুরীর সঙ্গে হেলিকপ্টারে চড়তে যা দেরি, সঙ্গে সঙ্গে পাশের বেডরূমে নক করবে ভবনিয়া। প্রথমে তাকে বলা হয়েছে,

গোসল করার বা কাপড় পাল্টাবার দৃশ্য ভবনিয়া একা দেখলে যমুনা তেমন কিছু মনে করবে না। তারপর আভাসে জানিয়ে দেয়া হলো, তেলখনি দেখতে সত্যি সে যাচ্ছে না।

তিনজন গার্ড ইতিমধ্যে পাশের কামরায় চলে গেছে।

'তিক্ত হলেও, এখানে আরও একটা দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হবে,' অমায়িক হেসে বলল বঙ্কিম মুরালি, পকেট থেকে একটা মেটাল ডিটেকটর বের করল। 'সুটকেস দুটো চামড়ার হলেও, ফলস বটম থাকতে পারে, আর ফলস বটম থাকলে তাতে অস্ত্র বা বিস্ফোরক থাকাও বিচিত্র কিছু নয়।' রেগেমেগে কিছু বলতে যাচ্ছিল যমুনা, হেসে উঠে তাকে থামিয়ে দিল সে। 'প্লীজ, ম্যাডাম, ব্যাপারটাকে পারসোনালি নেবেন না। অস্ত্র বা বিস্ফোরক যদি পাওয়া যায়, সেজন্যে আমরা আপনাদেরকে দায়ী করব না। এ তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে ফোরবলের অনেক শত্রু আছে, তাই না? কৌশলে হয়তো তাদেরই কেউ এই সুটকেস দুটো আপনাদেরকে গছিয়ে দিয়েছে। ফলস বটমে টাইম বোমা থাকাও বিচিত্র নয়। যদি ফাটে, আপনারাও মারা যাবেন। কাজেই একটু সরে দাঁড়ান, আমার কাজ আমাকে করতে দিন।'

'গো অ্যাহেড,' বলে যমুনার হাত ধরে এক পা পিছিয়ে এল রানা। 'সাজনীন, ফলস বটমের খোঁজে বঙ্কিম ভায়া নাকাল হবেন, আর আমরা তামাশা দেখব? তারচেয়ে পাশের ঘরে গিয়ে দেখলে হয় না গার্ডরা ক'টা লেন্স খুলতে পারল?'

'আপনি যান, স্যার,' বলল যমুনা। 'আমি এদের স্পর্ধা আর বোকামির সবটুকুই দেখতে চাই।'

সুটকেস দুটো ফেলে যেতে না চাওয়ার কারণ আছে যমুনার। এটা আসলে ওরই পরীক্ষা। জেলিগনাইট, ডেটোনেটর, সিগনাল রিসিভিং ডিভাইস ও সুটকেস, এগুলো সংগ্রহ করার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে নিয়েছিল সে। কিছু জিনিস ব্ল্যাক মার্কেটে

থেকে কিনতে হয়েছে ওকে, কিছু আগেই সংগ্রহ করা ছিল, শুধু সুটকেস দুটো নিজের হাতে তৈরি করতে হয়েছে। চামড়ার কাজে খুব একটা দক্ষ না হলেও, ওর তৈরি সুটকেস দুটোয় কোন ক্রটি খুঁজে পাওয়া যাবে না। এর কারণ হলো, প্রচলিত অর্থে সুটকেসগুলো ওকে বানাতে হয়নি, স্রেফ সুপার গ্লু দিয়ে জোড়া লাগাতে হয়েছে। প্রতিটি সুটকেস ছয় ভাগে ভাগ করা যায়—তলা, ঢাকনি, ও চার পাশ। প্রতিটি অংশ ফাঁপা, তবে টোকা বা বাড়ি দিলে নিরেট মনে হবে, কারণ ফাঁপা জায়গার প্রতিটি ইঞ্চিতে পুডিংসদৃশ জেলিগনাইট ঠাসা। শুধু জেলিগনাইট নয়, প্রতিটি আলাদা অংশে একটা করে ডেটোনেটর ও এক সেট করে সিগনাল রিসিভিং ডিভাইস আছে, দুটো সুটকেসে সব মিলিয়ে বারো জোড়া। ডেটোনেটর ও সিগনাল রিসিভিং ডিভাইস ইস্পাত ও লোহা দিয়ে তৈরি, কাজেই মেটাল ডিটেকটরে ধরা পড়তে বাধ্য। তবে যমুনা কাঁচা কাজ করার মেয়ে নয়। ওর জানা ছিল বিসিআই-এর গবেষক কেমিস্টরা মেটাল ডিটেকটরকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে একটা তরল কেমিকেল কমপাউন্ড আবিষ্কার করেছে, যে-কোন ধাতব বস্তুকে ওই কমপাউন্ডে ভেজানো কাপড় দিয়ে মুড়লে মেটাল ডিটেকটরে তা ধরা পড়বে না। ওই তরল পদার্থ গত বছর ঢাকা থেকে এক বোতল আনিয়ে রেখেছিল, সেটা কাজে লেগে গেছে। সুটকেসের নকশাও বিসিআই-এর টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টের করা, ওকে শুধু মাপ মত চামড়া কেটে গ্লু দিয়ে জোড়া লাগাতে হয়েছে। মজার হবি হিসেবে অবসর সময়ে নানা রকম ইলেকট্রনিক যন্ত্র বানায় যমুনা, কাজেই ডেটোনেটর, এস.আর. ডিভাইস ও রিমোট কন্ট্রোল তৈরি করতে ওকে কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি। ওর হাতব্যাগের হাতলটাই রিমোট কন্ট্রোল, হাতলে বসানো আর্টিফিশিয়াল ডায়মন্ডগুলো বোতাম, সব মিলিয়ে বারোটা। দ্বিতীয় আরেকটা রিমোট কন্ট্রোল হলো

রানার কোমরের বেল্ট, বোতামগুলো থাকবে শিরদাঁড়ার কাছে।

এ-সব নিজের হাতে তৈরি বা জোড়া লাগানো, এবং এই প্রথম কোন প্রতিপক্ষ পরীক্ষা করতে যাচ্ছে, কাজেই খুব নার্ভাস ফীল করছে যমুনা। রানাকে পাশের ঘরে পাঠিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য হলো, বঙ্কিম মুরালি যদি বিস্ফোরকের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে ফেলে, আড়াল থেকে ওকে কাভার দিতে পারবে ও, পাশের ঘরের গার্ডদেরও সামলাতে পারবে। তবে মুরালির সফল হবার সম্ভাবনা খুবই কম, মেটাল ডিটেকটরে কিছুই ধরা পড়বে না। সুটকেসের চামড়া দেখতে খুব মোটা, ভেতরে সিকি ইঞ্চিরও কম পুরু জেলিগনাইটের পাত ভরা আছে, একমাত্র ছুরি দিয়ে চিরে পরীক্ষা করলে ওটার অস্তিত্ব ধরা পড়বে। সেটাই দেখতে চায় যমুনা—মুরালি কি ছুরি দিয়ে সুটকেস কাটবে?

কাজটা যে মুরালি খুব উৎসাহ বা জেদের ভাব নিয়ে করছে, যমুনার তা মনে হলো না। একটা সুটকেসের গায়ে মেটাল ডিটেকটর বুলিয়ে হাসল সে, দ্বিতীয় সুটকেসটা পরীক্ষা না করেই যন্ত্রটা পকেটে ভরে রাখল। যমুনার দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল সে, 'সত্যি আমি...'

'জানি, মর্মাহত,' তার মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে বলল যমুনা। 'এখন দয়া করে গিফটগুলো সুটকেসে ভরে দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করুন।'

একজন গার্ড ও মুরালি দ্রুত সুটকেসে ভরল সব। কোমরে হাত দিয়ে দেখছিল যমুনা, কাজটা শেষ হতে বলল, 'ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই আপনি জেনেছেন যে আমি ক্লান্ত? তাই ডিনারের পর কোথাও যাচ্ছি না। দয়া করে সুটকেস দুটো আমার ঘরে নিয়ে যেতে বলুন। আপনার বস্ আমাকে সঙ্গ দিতে এলে আমি যদি তাঁকে গিফটগুলো দেখাতে চাই, তাহলে আর কষ্ট করে এ-ঘরে আসতে হবে না।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

পাশের ঘরে গার্ডরা চারটে লেন্সের কথা বললেও, একটু খুঁজতে আরও দুটো পেয়ে গেল রানা। সব মিলিয়ে মাইক্রোফোনও বেরুল ছ'টা।

গার্ডদের নিয়ে বঙ্কিম মুরালি চলে যাবার পর যমুনার বাথরূমটা পরীক্ষা করল ওরা। কিছু পাওয়া গেল না। যমুনার বেডরূম আরেকবার সার্চ না করে কথা বলা নিরাপদ নয়, তাই শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে বাথরূমেই জরুরী কয়েকটা বিষয়ে কথা বলে নিল।

যমুনা জানাল, ভবনিয়া ওদের আসল পরিচয় আঁচ করতে পেরেছে বলে মনে হয়নি ওর। তবে ওর প্রতি তার লোভটা এতই বেশি, নির্লজ্জের মত প্রকাশ করতে বাধেনি। তবে এ নিয়ে রানাকে উদ্বিগ্ন হতে নিষেধ করল, বলল, নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করার কৌশল জানা আছে ওর।

রানা স্বীকার করল, কবীর চৌধুরীর আচরণ ওর ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। খাস্তগীরকে খুন করাই যে ওদের উদ্দেশ্য, এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাকে তেলখনি দেখাতে নিয়ে যাবে কেন? যমুনা উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন তুলল, এমন কি হতে পারে যে রানাকে দুর্গ থেকে বের করে নিয়ে যাবে, কিন্তু ফিরিয়ে আনবে না? গুলি করে হেলিকপ্টার থেকে সাগরে ফেলে দেবে? উত্তরে রানা বলল, মরতে হয় মরবে, কিন্তু কবীর চৌধুরীকে না নিয়ে নয়। আরও বলল, সুটকেসের ছোট একটা অংশ যমুনা যেন আলাদা করে রাখে। ভাল হয় যদি রানার জ্যাকেটের ভেতর দিকে টুকরোটা আঠা দিয়ে আটকে দেয় যমুনা। হেলিকপ্টারে চড়ার সময় ওই জ্যাকেটটা পরে থাকবে রানা। ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়ল যমুনা, অর্থাৎ কবীর চৌধুরীর সঙ্গে রানাকেও মরতে দিতে রাজি নয় সে। বলল, রানাকে সে সুটকেসের কোন অংশ দেবে

না। কিন্তু রানার জেদের কাছে এক সময় হার মানতে হলো তাকে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো।

সেই পুরনো প্রসঙ্গটাও উঠল। বন্দী হবার আগে রেডিও অন করে কাকে মেসেজ পাঠাচ্ছিল ব্রিগেডিয়ার খাস্তগীর? যমুনা প্রায় নিশ্চিত, সে পয়েন্ট পেড্রো অর্থাৎ দুর্গের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। করলে কবীর চৌধুরী বা ভবনিয়ার আচরণে তা বোঝা যেত। রানা বলল, তাহলে ধরে নিতে হয় ব্যাক আপ নিয়েই পয়েন্ট পেড্রোতে আসছিল খাস্তগীর। কিন্তু ব্যাক আপ থাকলে মেসেজ পাবার পর সে বা তারা খাস্তগীরের সাহায্যে ছুটে আসেনি কেন? না, রহস্যটার কোন সমাধান পাওয়া গেল না।

দুর্গের ছাদে রকেট লঞ্চার ও মেশিন গান ফিট করা মার্কিন গানশিপ হেলিকপ্টার টমাহক দেখে রানার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। ওকে এভাবে বিস্মিত হতে দেখে কবীর চৌধুরী হাসল, বলল, 'চোরেদের একটা দুর্ভাগ্য কি জানেন? চুরি করা জিনিস ভোগ করা তো দূরের কথা, নিজেদের কাছে রাখতেও পারে না।'

'তারমানে এই মার্কিন গানশিপ হেলিকপ্টার কেউ চুরি করেছিল, আপনি তার কাছ থেকে কিনেছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

পাইলট ছাড়াও টমাহকে আরও দু'জন লোক উঠল। একজন বসল দরজার কাছে, মেশিন গানের পিছনে। আরেকজন পাইলটের পাশে, ছোট একটা কন্ট্রোল প্যানেল সামনে নিয়ে। কন্ট্রোল প্যানেলে মনিটর আছে, হেলিকপ্টারের চারধারে অন্য কোন এয়ারক্রাফট থাকলে তার ইমেজ ফুটবে তাতে, রেঞ্জ-এর সঠিক হিসাব সহ। রকেট বা মিসাইলগুলো তাপ-অনুসন্ধানী, রওনা হবার পর হিট-সোর্স খুঁজে নিয়ে টার্গেটে আঘাত করবে। সব মিলিয়ে বারোটা রকেট, কন্ট্রোল প্যানেলে সুইচও বারোটা।

পাইলটের পিছনের সীটটা রানার। কবীর চৌধুরী বসল ওর বাঁ পাশে, একটু পিছনে। রোটর ও এঞ্জিনের শব্দে কেউ কারও কথা শুনতে পাবে না, তাই প্রত্যেককে একটা করে হেড সেট পরতে দেয়া হলো। হেডসেটের সঙ্গে মাইক্রোফোন ও ইলেকট্রনিক মাউথপীস আছে, পরস্পরের সঙ্গে আলাপ তো করা যাবেই, হেলিকপ্টারের রেডিওর সঙ্গেও সংযোগ দেয়ার ব্যবস্থা আছে—পাইলট বা আরোহীরা ইনকামিং কল-এর উত্তর দিতে চাইলে মাউথপীসে কথা বললেই হবে, রেডিওর মাধ্যমে কথাগুলো আউটগোয়িং মেসেজ হয়ে যাবে।

'চুরি করেছিল কেজিবি, আফগানিস্তানে মার্কিনিদের সঙ্গে রাশিয়া যখন যুদ্ধ করছিল,' রানার প্রশ্নের জবাব দিল কবীর চৌধুরী। 'তবে না, কিনতে হয়নি আমাকে। ওদের একটা সায়েন্টিফিক সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিলাম, তার বিনিময়ে এই গানশিপ আমাকে উপহার দেয় ওরা। ওদের সমস্যা হলো, কমিউনিজমের পতন ঘটার পর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে—বন্ধুর চুরি করা জিনিস এখন আর তাই ব্যবহার করে কি করে!'

'ও।' রানা হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। যমুনার কথা ভাবছে ও। দুর্গে একা একটা মেয়ে, কোন বিপদে পড়লে সাহায্য করার কেউ নেই। আর বিপদে পড়ার আশঙ্কাও ষোলো আনা, কারণ দুর্গে সে রয়েই গেছে কঠিন ও বিপজ্জনক একটা দায়িত্ব পালন করার জন্যে। বিচ্ছিন্ন সুটকেসের বিস্ফোরক ভরা এগারোটা অংশ দুর্গের বিভিন্ন অংশে লুকিয়ে রাখতে হবে। যতই সাবধান হোক, লুকিয়ে রাখার সময় ধরা পড়ে যেতে পারে যমুনা। ভবনিয়া ওকে কতক্ষণ একা থাকতে দেবে, সেটাও একটা প্রশ্ন। ডাইনিংরুমে খেতে আসেনি যমুনা, একজন গার্ডকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিল, সে খুব ক্লান্ত বোধ করছে, তাই নিজের ঘরেই খাবে।

এ-কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে তাকে দেখতে চলে গেল ভবনিয়া। এ থেকেই আন্দাজ করা যায়, গোপনে কিছু করার মত সময় খুব কমই পাবে যমুনা। ভবনিয়া ওর প্রতি যতই মুগ্ধ হোক, তাকে অসতর্ক মনে করার কোন কারণ নেই–সুটকেসগুলোর অনুপস্থিতি তার চোখে পড়বে। প্রশ্ন করলে যমুনা কোন উত্তরই দিতে পারবে না।

শ্রীলঙ্কান এয়ারফোর্সের রাডারে ধরা পড়ার ভয়ে ওদের পাইলট সাগরের খুব কাছাকাছি থাকল। পয়েন্ট পেড্রো থেকে সরাসরি উত্তর দিকে বঙ্গোপসাগর, তবে ভারতীয় এয়ারফোর্সের রাডার ও নৌ-বাহিনীর যুদ্ধজাহাজগুলোকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে একটু পুবদিক ঘেঁষে ছুটছে টমাহক।

'এত দূরের পথ, রিফুয়েলিঙের কি ব্যবস্থা?'

রানা পাইলটকে প্রশ্ন করলেও, উত্তর দিল কবীর চৌধুরী। 'এ-ব্যাপারে আমার প্রিয় বন্ধু দ্যুঁভো চেরোকির প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত। তার কল্যাণে ভারত মহাসাগরের…শুধু ভারত মহাসাগর কেন, পৃথিবীর যে-কোন সাগরের বুকে নামতে পারব আমরা রিফুয়েলিঙের জন্যে।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'সুপারট্যাংকারের একটা বহর আছে চেরোকির,' বলল কবীর চৌধুরী। 'বাংলাদেশের তেল নিয়ে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি সাগর পাড়ি দিচ্ছে ওগুলো। বলাই আছে, যে-কোন একটায় নেমে রিফুয়েলিঙের কাজটা সেরে নিতে পারব আমরা।'

'সুপারট্যাংকারের পুরো একটা বহর তেল পরিবহনের কাজ করছে?' শুকনো গলায় বলল রানা। 'তারমানে আমরা যে খনিটা আবিষ্কার করেছি সেটা বিশাল, তাই না?'

'বিশাল মানে!' হাসল কবীর চৌধুরী। 'পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রিজার্ভ, ব্রিগেডিয়ার খাস্তগীর! সত্যি কথা বলতে কি, সার্ভে করে

এই তেলখনির বিশালত্বের সঠিক হিসাব পাওয়া অসম্ভব। একটু ব্যাখ্যা করলে বুঝবেন, কিন্তু আপনি কি এ-সব তথ্য সম্পর্কে সত্যি আগ্রহ বোধ করছেন?'

'বিশেষ কোন আগ্রহ নেই,' নির্লিপ্ত একটা ভাব দেখিয়ে বলল রানা। 'তবে সময় কাটানোর জন্যে শুনতেও আপত্তি নেই।'

'উপকূল রেখা থেকে অগভীর বঙ্গোপসাগর কতটা অগভীর, আপনার কোন ধারণা আছে, মিস্টার খাস্তগীর? আচ্ছা, থাক, এ-সব জটিল হিসাবের প্রশ্ন তুলে আপনাকে বিরক্ত করার কোন মানে হয় না। সোজা করে সংক্ষেপে বলি। কন্টিনেন্টাল শেলফ বলতে বোঝায় সাগরের প্রায় একশো ফ্যাদম গভীর তলদেশ। বাংলাদেশের বেলায় এটা দুশো মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত–চওড়ায় নয়, লম্বায়–অর্থাৎ খোলা সাগরের দিকে। আপনাদের দেয়া সার্ভে রিপোর্ট ও ম্যাপে বলা হয়েছে কন্টিনেন্টাল শেলফের নিচেই তেল আছে। কিন্তু বাংলাদেশের জলসীমার ভেতর থেকে তো আর তেল চুরি করা সম্ভব নয়। তাই আমরা কন্টিনেন্টাল শেলফ ছাড়িয়ে এসে কন্টিনেন্টাল স্লোপ-এ অনুসন্ধান চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সার্ভে করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা জানাল, কন্টিনেন্টাল শেলফ-এর পর সাগরের তলদেশ যেখানে খাড়া ভাবে ঢালু হবার কথা, বাংলাদেশের বেলায় তা না হয়ে হিমালয়ের মত ব্যাপ্তি নিয়ে সেখানে একটা জলমগ্ন পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। শুনে আমরা প্রথমে খুব হতাশই হই। কিন্তু তারপর জানা গেল, ওই পাহাড়ে একটা বিশাল ফল্ট আছে।

'ফল্ট মানে একটা ফাটল আর কি। সেই ফাটল তিন মাইল গভীর। বিশেজ্ঞষদের বলা হলো, ওই ফল্টের নিচে নামা যায় কিনা দেখো। সাবমেরিন নিয়ে নামল তারা। পরীক্ষা চালিয়ে দেখল, বাংলাদেশের তেলখনি ওই পাহাড়ের ভেতর পর্যন্ত বিস্তৃ ত। কি বলছি বুঝতে পারছেন? তেল খনিটা যদি গোটা

বঙ্গোপসাগর জুড়ে বিস্তৃত হয়, তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমার তো ধারণা, গোটা ভারত মহাসাগরের নিচে শুধু তেল আর তেল রয়েছে, কয়েক হাজার বছর ধরে তুললেও শেষ হবে না।

'আপনার একটা প্রশ্নের উত্তরে আমি কিন্তু দুটো প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি, ব্রিগেডিয়ার খাস্তগীর। ওই ফল্ট বা ফাটলটা, স্যার! ওটা মাত্র পঞ্চাশ গজ চওড়া। আমরা তিন মাইল নিচে নেমে খনন করে তেল তুলছি। আপনি যে প্রশ্নটা করেননি, সেটা আমি করছি—বাংলাদেশ যদি কোন দিন আমাদের চুরি ধরে ফেলে বাধা দিতে আসে, আমরা তখন কি করব?

'আমরা বিস্ফোরক ফাটিয়ে ওই ফল্ট বা ফাটলটা বন্ধ করে দেব। একে যদি আপনি নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা বলেন, আমার আপত্তি নেই। ফল্ট জোড়া লেগে গেলে বাংলাদেশ কোনদিনই ওই খনি থেকে তেল তুলতে পারবে না।'

'কেন, কন্টিনেন্টাল শেলফ খুঁড়লে?'

হাসল কবীর চৌধুরী। 'এতক্ষণ তাহলে কি বললাম! ফল্টটা তিন মাইল গভীর! তারপরও কয়েকশো মিটার খুঁড়তে হয়েছে, তারপর পাওয়া গেছে তেল। এর মানে বুঝতে পারছেন না? কন্টিনেন্টাল শেলফ খুঁড়ে তেল পেতে হলে কত গভীরে যেতে হবে বাংলাদেশকে, ভেবে দেখুন না।'

রানার মন খারাপ হয়ে গেল। 'সত্যি কি আমরা বিস্ফোরক ফাটিয়ে ফল্টটা বন্ধ করে দেব?' জিজ্ঞেস করল ও। 'বাংলাদেশের সঙ্গে একটা আপস রফায় আসার চেষ্টা করব না?'

'বলে দেখতে পারি আধাআধি বখরায় রাজি আছে কিনা,' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল কবীর চৌধুরী। 'তবে মানবে বলে মনে হয় না। যাই হোক, আমরা সব রকম প্রস্তুতি নিয়েই রেখেছি। যখন খুশি একটা বোতামে চাপ দিলেই কয়েক টন বিস্ফোরক ফেটে যাবে, কয়েক কোটি টন পাথর আর মাটি ধসে পড়ে বন্ধ করে

দেবে ফাটলটা। এবার বলুন, ব্রিগেডিয়ার খাস্তগীর, আইডিয়া ও আয়োজনটা খাসা কিনা?'

'ওয়ান্ডারফুল!' বলতে হলো রানাকে, অবশ্য মনে মনে গাল দিয়ে চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করছে।

দুশো মাইল এগোবার পর সাগরে একটা সুপারট্যাংকারের দেখা পাওয়া গেল। ফুয়েল ট্যাংক খালি হতে এখনও দেরি আছে, তাই রিফুয়েলিঙের সুযোগটা নিল না ওরা। তবে সুপারট্যাংকারের ক্যাপটেনের সঙ্গে রেডিওর সাহায্যে কথা বলে কবীর চৌধুরী নিশ্চিত হয়ে নিল দেড়শো মাইল সামনে আরও একটা সুপারট্যাংকার পাওয়া যাবে।

খানিক পর কবীর চৌধুরী রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'জার্নিটা আশা করি আপনি উপভোগ করছেন, ব্রিগেডিয়ার? নাকি মন পড়ে আছে মিস নাজনীনের কাছে?'

'আসলে উপভোগ করছি বললে মিথ্যে বলা হবে,' বলল রানা। 'কি জানেন, সাগর আমার একঘেয়ে লাগে। ভাবছি, আমি এলাম কেন। আপনিই বা আমাকে তেলখনি দেখাবার প্রস্তাবটা কেন দিলেন।'

কবীর চৌধুরী চুপ করে থাকল, ভাব দেখে মনে হলো প্রশ্নটা সে এড়িয়ে যেতে চায়। কিছুক্ষণ পর বলল, 'মানুষের একটা স্বভাব হলো, নিজের কৃতিত্ব লোকজনকে ডেকে দেখানো। সাগরের গভীর তলা থেকে কিভাবে আমি তেল তোলার ব্যবস্থা করেছি, আপনাকে দেখাবার লোভটা আমি আসলে সামলাতে পারিনি।'

রানার মনে হলো, আসল কথাটা চেপে যাচ্ছে কবীর চৌধুরী। জিজ্ঞেস করল, 'গোটা আয়োজনটা আপনি তাহলে নিজের কৃতিত্ব বলে দাবি করেন?'

'অবশ্যই!' বলল পাগল বিজ্ঞানী। 'খনি বিশেষজ্ঞদের সাহায্য

নিয়েছি ঠিকই, কিন্তু প্ল্যানটা তো পুরোপুরি আমার নিজের তৈরি। প্ল্যানটা না বলে বলা উচিত প্ল্যানগুলো। শুধু তো তেল আবিষ্কার করার ব্যাপার ছিল না। পানির তলায় বিশাল ফ্যাসিলিটি তৈরি করতে হয়েছে। মোবাইল প্লাটফর্ম, কার আইডিয়া? ফাটলের কিনারায় খনি বিশেষজ্ঞ আর তেল শ্রমিকদের কলোনি, কার বুদ্ধি? তারপর ধরুন তেল পরিবহন, ক্রেতা নির্বাচন, দর নির্ধারণ, বিল আদায়–আরে ভাই, সবই তো এই অধমকে করতে হয়েছে।'

রানা কিছু বলল না। আবার যমুনার কথা ভাবছে ও। ভাবছে সোহেলের কথাও। ওর সীট থেকে রকেটম্যানের মনিটরস্ক্রীন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কোন এয়ারক্রাফট থাকলে ওটায় তার ইমেজ ফুটবে। তবে কি ওর ব্যাক আপ হিসেবে টমাহকের পিছু নেয়নি সোহেল?

খানিক পর কবীর চৌধুরী বলল, 'আপনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন, ব্রিগেডিয়ার। জানি কার কথা ভাবছেন। আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারি অসাধারণ রূপসী, একটু চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক।'

'আমি ওর অসুস্থতার কথা ভাবছি, মিস্টার চৌধুরী,' বলল রানা। 'ওর নিরাপত্তা সম্পর্কে নয়। মিস্টার ভবনিয়া নিজে যখন দুর্গে রয়েছেন, ওর কোন বিপদ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

হঠাৎ হেসে উঠল কবীর চৌধুরী, যেন মজার কি একটা মনে পড়ে গেছে তার। 'আপনার ধারণা ভুল, ব্রিগেডিয়ার। বিপদ একটা হবে।'

উত্তেজিত বা অস্থির হতে রাজি নয় রানা। হাসিমুখে জানতে চাইল, 'আপনি ঠাট্টা করছেন, রাইট?'

'বিপদটা আসবেও মিস্টার ভবনিয়ার তরফ থেকে,' বলল কবীর চৌধুরী। 'তবে সেটা মিস সাজনীনের নয়, আপনার বলেই মনে করি।'

'আমার বিপদ?' রানা ভাব দেখাল কৌতুক বোধ করছে।

'মিস সাজনীনকে হারাতে হলে সেটাকে আপনি নিজের বিপদ বলে গণ্য করবেন না?' জিজ্ঞেস করল কবীর চৌধুরী, এখনও হাসছে।

'আমি তাহলে সাজনীনকে হারাচ্ছি?'

'ওকে সম্ভবত শ্রীলঙ্কায় রেখেই দেশে ফিরে যেতে হবে আপনাকে,' বলল কবীর চৌধুরী। 'কারণটা আমাকে ব্যাখ্যা করতে দিন, প্লীজ। দুর্গে ফিরেই দেখতে পাবেন, সাজনীন আপনাকে এড়িয়ে চলছে। সে যদি আপনার সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার করে তাতেও আমি আশ্চর্য হব না।'

'কিন্তু কেন? এরকম আচরণের কারণটা কি হবে?'

'কারণ বিরুপিল্লাই ভবনিয়ার জাদু। পয়েন্ট পেড্রোর ওই দুর্গে ঘন-ঘন আসতে হয় আমাকে, আমি দেখেছি। সাবেক ব্রিটিশ মন্ত্রীর কন্যা বা নেপালের রাজকুমারীকেও ছাড়েননি তিনি। মেয়ে পটাতে তাঁর মত ওস্তাদ লোক দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ। আর একবার যদি কোন মেয়ের ওপর চোখ পড়ে, সেই মেয়ে তাঁর ক্রীতদাসী না হয়ে পার পাবে না। একে আপনি জাদু ছাড়া আর কি বলবেন?'

রানার কিছু বলা হলো না, কারণ হেডসেট হয়ে সবার কানে রকেটম্যানের কথাটা বোমার মতই বিস্ফোরিত হলো, 'পিছনে আপদ জুটেছে। সম্ভবত একটা হেলিকপ্টার। বিশ মাইল দূরে।'

মনিটর স্ক্রীনে তাকিয়ে রানাও দেখতে পেল ইমেজটা। অস্পষ্ট, প্লেন না হেলিকপ্টার বোঝা যাচ্ছে না। ওর পালস রেট বেড়ে গেল। হেলিকপ্টার হলে নিশ্চয়ই ওটায় সোহেল আছে।

পাইলট বলল, 'আমরা রওনা হবার সময়ও রাডারে ছিল ওটা। পিছিয়ে পড়েছিল, এখন আবার কাছে চলে আসায় রাডারে দেখতে পাচ্ছি। ছোট, স্যার। সম্ভবত টু-সিটার।'

কবীর চৌধুরী সরাসরি রানার দিকে তাকাল। 'আপনার ব্যাকআপ নয় তো, ব্রিগেডিয়ার খাস্তগীর? আইএসআই-এর কোন হেলিকপ্টার? ওটায় হয়তো আপনার বডিগার্ডরা আছে।'

'হাসালেন দেখছি। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, ব্যাকআপ বা বডিগার্ড দরকার হবে কেন?' টু-সিটার হলে ওটায় সোহেল নেই, জানে রানা।

রকেটম্যান ও পাইলট, দু'জনকেই প্রশ্ন করল কবীর চৌধুরী, 'হাবভাব কেমন বুঝছ? কোন খারাপ মতলব আছে বলে মনে হচ্ছে?'

'মনিটরে দেখে কিছুই বোঝা যাবে না,' পাইলট জবাব দিল। 'কাছে আসুক, খালি চোখে দেখি, তখন বলতে পারব।'

'উটকো ঝামেলা পছন্দ করি না,' বিরক্ত হয়ে বলল কবীর চৌধুরী। 'মেসেজ পাঠিয়ে সাবধান করে দাও, তারপরও যদি পিছু না ছাড়ে, রেঞ্জের মধ্যে আসা মাত্র রকেট ছুঁড়ে ফেলে দাও পানিতে।'

'ইয়েস, স্যার!' রকেটম্যান তার উল্লাস চেপে রাখতে পারল না।

পরবর্তী আধ ঘণ্টায় পরিস্থিতি নাটকীয় মোড় নিল। দুটো হেলিকপ্টারের দূরত্ব কমে পাঁচ মাইলে এসে দাঁড়াল। পাইলট রেডিও মেসেজ পাঠিয়ে জানতে চাইল কোত্থেকে আসছে ওটা, উদ্দেশ্যই বা কি। পিছনের টু-সিটার থেকে কোন সাড়া-শব্দ নেই। পাইলট তৃতীয়বার মেসেজ পাঠিয়ে বলল, 'সাড়া না দিলে তোমাদেরকে শত্রু বলে গণ্য করা হবে। এরপর কোন আলটিমেটাম দেয়া হবে না, রকেট ছুঁড়ে আঘাত করা হবে তোমাদের।'

টু-সিটার থেকে পাইলট এবার রানাকে বিপদে ফেলে দিয়ে বলল, 'কাল ভোরে ব্রিগেডিয়ার মহব্বতজান খাস্তগীরের রেডিও

মেসেজ পেয়ে করাচী থেকে রওনা হয় তারা। যান্ত্রিক ক্রটির কারণে রওনা হতে দেরি হয়ে যায় তাদের। আজ দুপুরে পয়েন্ট পেড্রোয় পৌঁছে দেখে দুর্গের ছাদ থেকে একটা হেলিকপ্টার বঙ্গোপসাগরের দিকে রওনা হচ্ছে। 'আমরা ব্রিগেডিয়ারের বডিগার্ড, কাজেই আপনাদের হেলিকপ্টারে ব্রিগেডিয়ার আছে কি না জানতে চাই আমরা।'

'উনি আমাদের সঙ্গে আছেন, এবং বহাল তবিয়তে,' জবাব দিল পাইলট। 'আমরা একটা গোপন মিশনে যাচ্ছি, কাজেই দয়া করে অনুসরণ করবেন না।'

টু-সিটারের পাইলট বলল, 'ব্রিগেডিয়ার আপনাদের সঙ্গে আছেন, আছেন নিরাপদেই, এর প্রমাণ পেতে হবে আমাদের। ব্রিগেডিয়ার কোড করা সঙ্কেত দিলেই বুঝতে পারব তিনি হেলিকপ্টারে আছেন, এবং ভাল আছেন। তিনি কোন বিপদের মধ্যে নেই, এটা জানতে পারলেই দুর্গে ফিরে গিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করব আমরা।'

রানার দিকে চোখ গরম করে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'এটা আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন, মিস্টার খাস্তগীর। একবার তো অস্বীকার করে বলেছেন আপনার কোন ব্যাকআপ নেই, বডিগার্ডও নিয়ে আসেননি। তাহলে?'

'আমি সত্যি কথাই বলছি, মিস্টার চৌধুরী। ওদের কোথাও ভুল হচ্ছে। কোড? কিসের কোড? আমি কাউকে কোন রেডিও মেসেজ পাঠাইনি, মিস্টার চৌধুরী। ওদেরকে আমি চিনিও না।'

'ঠিক বলছেন, কোথাও কোন ভুল হচ্ছে না?' কবীর চৌধুরীকে সিরিয়াস দেখাল।

রানা ভাবছে, টমাহক থেকে রকেট ছুঁড়ে আইএসআই-এর একটা হেলিকপ্টার ফেলে দিলে ওর কি? 'আমার ধারণা, মিছে কথা বলছে ওরা, উদ্দেশ্য কাছাকাছি থেকে দেখা আমরা কোথায়

যাই, কি করি। আমার আরও ধারণা, ওই হেলিকপ্টারে আমাদের কমন শত্রু মাসুদ রানা আছে।'

'আপনার কথায় যুক্তি আছে,' সায় দিল কবীর চৌধুরী। 'তাহলে ওটাকে আকাশ থেকে ফেলে দেয়াই ভাল, কি বলেন?'

'অযথা খুন-খারাবি আমি পছন্দ করি না,' বলল রানা। 'তবে আপনি যে সিদ্ধান্তই নেন না কেন, আমি আপত্তি করব না।'

'ভেরি গুড,' বলে রকেট অপারেটরকে জিজ্ঞেস করল কবীর চৌধুরী, 'সুপারট্যাংকারটা আর কত দূরে?'

'একদম কাছে চলে এসেছে, স্যার। খুব বেশি হলে ত্রিশ মাইল দূরে।'

'ওটার ডেকে নেমে ফুয়েল নেব আমরা, টু-সিটারকে এটা দেখতে দেয়া যাবে না। তার আগেই আকাশ খালি করো তুমি।'

'ইয়েস, স্যার!' কনসোলের ওপর ঝুঁকে যান্ত্রিক ফড়িং শিকারের প্রস্তুতি নিচ্ছে রকেট অপারেটর।

কথায় আছে, পিপীলিকার পাখা গজে মরিবার তরে, আইএসআই-এর টু-সিটারেরও যেন তাই গজিয়েছে। মারাত্মক হুমকি শোনার পরও টমাহকের আরও কাছে চলে এল পাকিস্তানী পাইলট। পরপর দুটো রকেট ছুঁড়ে ককপিট আর রোটর উড়িয়ে দিল টমাহকের অপারেটর। এক মুহূর্তের ঘটনা, কিন্তু তার পরিণতি হলো ভয়ানক। রকেটের আঘাত টু-সিটারকে ভাল ভাবে টুকরো করার সময়ও পেল না, বিস্ফোরিত ফুয়েল ট্যাংক ওটাকে একটা কমলা রঙের প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করল। সাগরে পড়ার পর কিছুই তার অবশিষ্ট থাকল না—না ভাঙা টুকরো, না আগুন।

'সত্যি কথা বলবেন, আপনি দুঃখ পাননি তো?' মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল কবীর চৌধুরী।

রানা জবাব দিল, 'কংগ্রাচুলেশন্স!'

এগারো

গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম-এর সাহায্যে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হবার সুযোগটা কবীর চৌধুরী গ্রহণ করছে না। কারণ হিসেবে রানাকে সে জানাল, তাতে নাকি সংশ্লিষ্ট স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশ ফোরবল-এর আন্ডারওয়াটার ফ্যাসিলিটির হদিশ পেয়ে যেতে পারে।

বঙ্গোপসাগরে পৌঁছে আধঘণ্টা ধরে এদিক-ওদিক ওড়াউড়ির পর পাইলট খানিকটা উদ্বেগের সঙ্গেই জানাল, সারফেসে সে কোন বয়া দেখতে পাচ্ছে না। তার উদ্বেগ কবীর চৌধুরীকে স্পর্শ করল কিনা বোঝা গেল না, তবে সময় নষ্ট না করে ম্যাপ খুলে নিজেদের অবস্থান জানার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। সীমাহীন সাগরে কোন ল্যান্ডমার্ক নেই, কাজেই মাপকাঠি হিসেবে সূর্যের অবস্থান, ঘড়ির কাঁটা, অক্ষ ও দ্রাঘিমার সাহায্য নিল সে। তার নির্দেশে আরও প্রায় একশো মাইল উত্তর-পুব দিকে সরে এল পাইলট। ওদের কথাবার্তা থেকে রানা ধারণা করল, এই মুহূর্তে বাংলাদেশের উপকূল থেকে প্রায় দুশো মাইল দূরে রয়েছে ওরা।

কবীর চৌধুরীর কাছে বিভিন্ন ধরনের কয়েকটা রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইস রয়েছে, তারই একটা বের করে সুইচ টিপল সে।

বঙ্গোপসাগর এই মুহূর্তে একদম শান্ত, সারফেস আয়নার মত

মসৃণ। আলোড়নটা সেজন্যেই চোখে পড়ল। টমাহক শূন্যে স্থির হয়ে আছে, সরাসরি নিচে উথলে উঠল সাগরের পানি। ধীরে ধীরে সাগর থেকে মাথাচাড়া দিচ্ছে চৌকো একটা প্ল্যাটফর্ম। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে খুব একটা বড় নয় ওটা, তবে একসঙ্গে দুটো হেলিকপ্টার ল্যান্ড করতে পারবে।

কবীর চৌধুরী বলল, 'নানা কাজে এরকম বেশ কয়েকটা প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করি আমরা, এটাই সবচেয়ে ছোট।'

রানা লক্ষ করল, হেলিকপ্টার ল্যান্ড করার সময় প্ল্যাটফর্মটা দুলল না বা নড়ল না। এর মানে হলো, এটা ভাসমান নয়; সাগরের তলায় পোঁতা রয়েছে এর গোড়া। টমাহক ল্যান্ড করতে যা দেরি, সঙ্গে-সঙ্গে প্ল্যাটফর্মের পাশে ভুশ করে একটা সাবমেরিন ভেসে উঠল। কপ্টার থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মের কিনারায় এসে দাঁড়াল কবীর চৌধুরী ও রানা। গায়ের জ্যাকেটটা পাইলটের সীটের পিঠে ঝুলিয়ে রেখে এসেছে রানা। ওটার ভেতরে ভাঙা সুটকেসের একটা ছোট টুকরো আছে, যমুনা নিজের হাতে কাপড়ে মুড়ে সেলাই করে দিয়েছে।

বাপের মতই অফ-হোয়াইট রঙের দামী কাপড়ের সুট পরেছে, সাবমেরিনের কনিং টাওয়ার থেকে বেরিয়ে এল খায়রুল কবীর। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে রানার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল কবীর চৌধুরী। 'আমাদের আন্ডারওয়াটার ফ্যাসিলিটির চীফ এঞ্জিনিয়ার, আমার একমাত্র পুত্র খায়রুল কবীর; খায়রুল, ইনি আইএসআই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর ব্রিগেডিয়ার মহব্বতজান খাস্তগীর।'

হ্যান্ডশেক করল ওরা। খায়রুল কবীরকে গম্ভীর ও চিন্তিত দেখাচ্ছে।

কবীর চৌধুরী জিজ্ঞেস করল, 'এনিথিং রঙ, মাই সান?'

দেখা যাচ্ছে না, তবে ঘাড় ফিরিয়ে বাংলাদেশ উপকূল রেখার

দিকে তাকাল খায়রুল। 'ঠিক বুঝতে পারছি না, ড্যাড। এই পাঁচ-সাত ঘণ্টা আগে থেকে আমাদের ইকো সাউন্ডারে এমন কিছু পালস পাচ্ছি, মনে হচ্ছে পতেঙ্গার কাছে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী হঠাৎ বড় বেশি তৎপর হয়ে উঠেছে। বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর আসা-যাওয়াও বন্ধ করে দিয়েছে।'

'হয়তো কোন মহড়ার আয়োজন চলছে,' বলল কবীর চৌধুরী। 'আর কিছু, বাবা?'

'শুধু সোনার নয়, ড্যাড; রাডার থেকেও অস্বাভাবিক রীডিং পাচ্ছি,' বলল খায়রুল কবীর। 'কাছাকাছি আসছে না, তবে এক ঝাঁক ফাইটার জেট উপকূল এলাকার ওপর কড়া নজর রাখছে। কেন, কি ব্যাপার, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।'

'মিগ?' এবার একটু যেন উদ্বিগ্ন দেখাল কবীর চৌধুরীকে।

'হ্যাঁ, মিগ। একটা পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে চলে এসেছিল, সেজন্যেই তো বয়াগুলো পানির নিচে টেনে নিয়েছি। এঞ্জিনিয়ারদেরও বলে দিয়েছি, পানির ওপর আপাতত যেন কোন বুদ্বুদ না ওঠে।'

কবীর চৌধুরী গম্ভীর হয়ে গেল। 'তুমি সাবমেরিনের কমিউনিকেশন রূমে থাকো, খায়রুল,' বলল সে। 'একটা সুপারট্যাংকার আসছে তেল নিতে, আসতে নিষেধ করে দাও। মনিটরে চোখ রাখো, সন্দেহজনক কিছু দেখলেই আমাকে জানাবে।'

'ইয়েস, ড্যাড!' কনিং টাওয়ার থেকে মই বেয়ে সাবমেরিনের নিচে নেমে গেল খায়রুল কবীর।

রানার দিকে ফিরল কবীর চৌধুরী, সরাসরি ওর বুকে একটা আঙুল তাক করল, তারপর চোখ গরম করে বলল, 'আমি একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছি!'

রানার বুক ধক করে উঠল। 'কি রকম?'

প্ল্যাটফর্মের ওপর উত্তেজিতভাবে পায়চারি শুরু করল কবীর চৌধুরী। 'হিসেবেও আমার একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে!' আপনমনে বিড় বিড় করছে সে।

'মি. চৌধুরী, আপনার কথা কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।' শঙ্কিত বোধ করছে রানা। কবীর চৌধুরীর আচরণে পাগলামির ভাব ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

রানার সামনে থামল কবীর চৌধুরী। 'এ ষড়যন্ত্রের হোতাকে আমি চিনি! সে আমার জন্মশত্রু মাসুদ রানা!' হিসহিস করে বলল সে। 'মিস্টার ভবনিয়ার এজেন্ট মল্লিকা রত্নপ্রভাকে খুন করার আগে নিশ্চয়ই ইন্টারোগেট করেছিল রানা, তখনই জেনে ফেলে তেলখনিটা বাংলাদেশের জলসীমার শেষ প্রান্তে কোথাও।'

'হ্যাঁ, একটা সম্ভাবনা বটে,' রানার গলায় সমর্থনের সুর।

'তথ্যটা পেয়ে শালা আর দেরি করেনি,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল পথভ্রষ্ট বিজ্ঞানী, 'বাংলাদেশের নৌ ও বিমানবাহিনীকে সতর্ক করে দিয়েছিল। আর আজ, আমরা পয়েন্ট পেড্রো থেকে রওনা হবার পর, আমাদের লোকেশনও জানিয়ে দিয়েছে।'

'আমারও তাই সন্দেহ,' বলল রানা।

কপ্টারের খোলা দরজা দিয়ে পাইলটের গলা ভেসে এল, 'মিস্টার চৌধুরী, মনিটরে এক ঝাঁক ফাইটার প্লেন দেখতে পাচ্ছি। কাছে আসছে না, দূর থেকে চক্কর দিচ্ছে।'

হঠাৎ গলা ছেড়ে হেসে উঠল কবীর চৌধুরী।

'কি ব্যাপার, মিস্টার চৌধুরী?' একটা ঢোক গিলল রানা।

'তাহলে প্রথম থেকে খুলে বলতে হয়,' হাসি থামিয়ে বলল উন্মাদ বিজ্ঞানী। 'আমার ধারণা ছিল ফোরবল-এর আস্তানা হিসেবে মিস্টার ভবনিয়ার দুর্গে হানা দেবে রানা। সেভাবে প্রস্তুতিও নেয়া হয়। আমি প্রথম থেকেই বলে আসছি, ধরতে পারলে ওই শালাকে জ্যান্ত কবর দেব। কিন্তু মিস্টার ভবনিয়া

চাইছেন, শিকারী বাজপাখিকে দিয়ে ঠুকরে প্রথমে ওর চোখ তুলে নেবেন।'

'মিস্টার ভবনিয়া কি বাজপাখি পোষেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। যতই স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করুক, মুখোশের ভেতর ঘামছে ও, বুকটাও ধড়ফড় করছে।

'সময়ের অভাবে দুর্গটা তো আপনাকে ঘুরে দেখানো হলো না। বাজপাখি পোষেন মানে? গণ্ডায় গণ্ডায় পোষেন। ওগুলো তিনি আরব শেখদের কাছ থেকে উপহার পেয়েছেন। ট্রেনিং দেয়া বাজ, শিস বাজিয়ে নির্দেশ দিলেই আপনার চোখ তুলে নেবে...'

'আমার?'

'কথার কথা বলছি আর কি। আপনি যদি মাসুদ রানা হন, তো আপনারই। তবে আপনি যেমন বাজ পাখির কথা শুনে অবাক হচ্ছেন, রানা কিন্তু হবে না। কারণ, দুর্গে এক রাত ছিল সে, তখন বাজপাখির একটা পালক পড়ে থাকতে দেখেছে। ব্যাটার চোখও তো বাজপাখির মতই তীক্ষ্ণ। তো যা বলছিলাম। রানাকে কিভাবে মারা হবে তা নিয়ে আমার ও মিস্টার ভবনিয়ার মধ্যে মতপার্থক্য আছে। আপনিও যেহেতু আমাদের একজন পার্টনার, এ-ব্যাপারে আপনার মতামতও আমাদের জানা দরকার। বলুন, মি. খাস্তগীর, আপনি কিভাবে খুন করতে চান মাসুদ রানাকে?' অস্থির ও উদ্ভ্রান্ত লাগছে কবীর চৌধুরীকে।

'খুন করাটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়,' বলল রানা। 'যে-কোন একটা পদ্ধতি বেছে নিলেই হয়। তবে গুরুত্বপূর্ণ হলো ইন্টারোগেট করে তথ্য আদায়। আমি অন্তত সাতদিন বাঁচিয়ে রেখে কথা বলাতে চাই ওকে।'

'হুম। আইডিয়াটা মন্দ নয়।' আবার পায়চারি শুরু করল কবীর চৌধুরী। 'আমরা সাবমেরিনে চড়ে নিচে নামছি না কেন বলুন তো? আগে শুনতে চাই আমার ছেলে কি রিপোর্ট করে। ওর

রিপোর্ট থেকে আন্দাজ পাওয়া যাবে মাসুদ রানা কতটা বাড় বেড়েছে।'

'হিসাবে কি একটা ভুলের কথা বলছিলেন যেন?'

'আমার ধারণা ছিল দুর্গে হানা দেবে রানা,' বলল কবীর চৌধুরী। 'কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, এক ঢিলে দুই পাখি মারার প্রস্তুতি নিচ্ছে সে। দুর্গেও ঢুকবে, আবার আমাদের আন্ডারওয়াটার ফ্যাসিলিটিতেও হানা দেবে।'

'এখন তাহলে উপায়?' রাবারের মুখোশ এতই পাতলা যে রানার মুখে চিন্তার রেখাগুলো প্রায় হুবহু ফুটল তাতে। 'ধরুন, এখন যদি বাংলাদেশী নৌ ও বিমান বাহিনী ছুটে আসে, কি করব আমরা?'

'এই প্ল্যাটফর্ম আর সাবমেরিন যদি এখানে না থাকে, ওরা জানবে কিভাবে তেলখনির মুখটা কোথায়?' পাল্টা প্রশ্ন করল কবীর চৌধুরী।

'কিন্তু আপনিই তো এইমাত্র বললেন যে রানা আপনাদের আন্ডারওয়াটার ফ্যাসিলিটিতে হানা দেয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে।'

একটু থতমত খেয়ে গেল কবীর চৌধুরী। 'হ্যাঁ, বলেছি—হানা দেবে, বা দিতে পারবে, যদি আমাদের মধ্যে তার কোন চর লুকিয়ে থাকে।'

'আছে নাকি?'

'এখানেও হিসেবে একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছি আমি,' বলল কবীর চৌধুরী। 'চর একজন আছে। বোকার মত আমি তাকে সার্চ না করে এখানে নিয়ে এসেছি। সে আমার বোকামির সুযোগ নিয়ে খবর পাঠাচ্ছে...' কথা বলছে, একই সঙ্গে হাত দিয়ে ইশারাও করছে সে।

চোখের কোণ দিয়ে রানা লক্ষ করল, কপ্টারের পাশে দাঁড়ানো গানার ও রেডিও অপারেটরের হাতে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে।

অত্যন্ত সাবধানে, দু'দিক থেকে ধীর পায়ে রানার দিকে এগিয়ে আসছে তারা।

কিন্তু রানার কাছে তারা পৌঁছাবার আগে আরেক ঘটনা ঘটল। কনিং টাওয়ারে আবার উদয় হলো খায়রুল কবীর। সাংঘাতিক নার্ভাস। 'সর্বনাশ হয়ে গেছে, ড্যাড। দে আর কামিং!'

'হোয়াট!' বাঘের মত হুঙ্কার ছাড়ল কবীর চৌধুরী।

'ওদের চালাকি আমরা ধরতে পারিনি, ড্যাড!' বলল খায়রুল, থরথর করে কাঁপছে। 'তিনটে সাবমেরিন আসছে–বাংলাদেশী উপকূল থেকে নয়, ভারতের দিক থেকে। সেজন্যেই ওগুলোকে বাংলাদেশী বলে চিনতে দেরি হয়ে গেছে, ড্যাড। আর মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে ওগুলো।'

গানার ও রেডিও অপারেটরের দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'অ্যারেস্ট হিম!' গর্জে উঠল সে। 'তারপর সার্চ করো! ওর কাছে নিশ্চয়ই মাইক্রোফোন আছে।'

'হোয়াট!' খায়রুল যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'কে উনি? কি করেছেন?'

'বলো কি করেনি!' নিজের মাথার চুলে আঙুল চালাল কবীর চৌধুরী। 'তবে ও শালা যা-ই করুক, সবচেয়ে বড় ক্ষতি করে বসেছি আমি নিজেই। ও মাসুদ রানা, খায়রুল! আমি ওকে নিয়ে একটু নাটক করতে চেয়েছিলাম, এখন তার খেসারত দিতে হবে...'

অকস্মাৎ প্রচণ্ড একটা শব্দ হলো, যেন কাছেই অত্যন্ত শক্তিশালী কোন বোমা ফাটল।

'সনিক বুম!' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল খায়রুল।

সে থামতে না থামতে ওদের মাথার ওপর দিয়ে সগর্জনে ছুটে গেল একটা মিগ ফাইটার প্লেন। সাউন্ড ব্যারিয়ার ভাঙার ওই বিকট শব্দ আরও কয়েকটা শোনা গেল, মাথার ওপর দিয়ে

সুপারসনিক স্পীডে ছুটে গেল এক ঝাঁক মিগ।

সাদা কভারঅল পরা এক লোককে দেখা গেল কনিং টাওয়ারের মুখে। আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে আছে তার চোখ। 'এটা একটা ফুল-ফ্লেজড্ অ্যাটাক, স্যার! উপকূল থেকে এক ঝাঁক হেলিকপ্টার গানশিপ রওনা হয়েছে। পিছু নিয়ে আসছে তিনটে যুদ্ধ জাহাজ। সাবমেরিনগুলোও ফুল স্পীডে ছুটে আসছে।'

রানার দিকে আঙুল তাক করল খায়রুল কবীর। 'কিল হিম, ড্যাড! কিল হিম!'

'ওয়েট!' একটা হাত তুলে ছেলেকে থামিয়ে দিল কবীর চৌধুরী। 'ওকে নিয়ে কি করব, সে আমার মনই জানে। তুমি সাবমেরিন নিয়ে নিচে যাও, খায়রুল। রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করো, সবাইকে জানিয়ে দাও দশ মিনিটের মধ্যে আন্ডারওয়াটার ফ্যাসিলিটি ত্যাগ করতে হবে...'

'কিন্তু ড্যাড, দশ মিনিটের মধ্যে কি করে তা সম্ভব!' প্রতিবাদ করল খায়রুল। 'ফল্টের নিচে আমাদের এক্সপার্ট ও টেকনিশিয়ানরা কাজ করছে, উঠে আসতেই তো বিশ মিনিট লাগবে...'

'সেক্ষেত্রে ওদেরকে কিছু জানাবার দরকার নেই,' বলল কবীর চৌধুরী। 'শুধু কলোনিতে যারা আছে তাদেরকে অন্য দুটো সাবমেরিনে উঠতে বলো। বাকি যারা থেকে যাবে, তাদের কপাল খারাপ।'

'ড্যাড, তুমি আমাদেরকে পালাতে বলছ কেন?' খায়রুল হতভম্ব। 'আমরা জানতাম এরকম পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে, সেজন্যে যথেষ্ট প্রস্তুতিও নেয়া আছে। তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে আমাদের যে ফায়ার পাওয়ার মজুদ রাখা হয়েছে, ওগুলো কাজে লাগালে বাংলাদেশ নৌ আর বিমানবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হবে...'

'আপাতত। কিন্তু তারপর? ওরা আমাদের ফ্যাসিলিটির পজিশন জেনে ফেলেছে, খায়রুল। কাজেই এখন...'

রানার দিকে আবার আঙুল তাক করল খায়রুল। 'এই একটা লোকের কাছে বারবার হার মানতে হবে আমাদের?'

কবীর চৌধুরীর নির্দেশ মত গানার ও রেডিও অপারেটর রানার হাত দুটো পিছমোড়া করে বেঁধেছে ঠিকই, কিন্তু ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে পড়ায় এখনও ওকে সার্চ করেনি।

'না, খায়রুল, এটা আমাদের পরাজয় নয়,' বলল কবীর চৌধুরী। 'পরাজয় বলা যেত, যদি তেলখনিটা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারত ওরা। তা তো পারছে না। তবে রানা যে বারবার আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, এর একটা চূড়ান্ত বিহিত না করলেই নয় আর। জানি, জিজ্ঞেস করলে জবাব দেবে–আমাদের বিরুদ্ধে লাগাটা ওর দেশপ্রেমের অঙ্গ।' হঠাৎ হাসল সে। 'তুমি শুনে খুশি হবে, মাই সান, রানার ওই দেশপ্রেমের কঠিন একটা পরীক্ষা নেব আজ আমি। এখুনি প্রমাণ হয়ে যাবে, ওর দেশপ্রেম কতটা নির্ভেজাল–সত্যি কি নিজের চেয়ে দেশকেই বেশি ভালবাসে ও? এই প্রশ্নটা অনেক দিন ধরে বিরক্ত করছে আমাকে। আজ আমি উত্তরটা চাই।' সুটের ভেতরের একটা পকেটে হাত ঢোকাল সে।

এই সময় পশ্চিম আকাশে একটা বেসামরিক হেলিকপ্টার দেখা গেল। দেখেই চিনতে পারল রানা। এটাই ভাড়া করেছিল যমুনা। গায়ের ইন্টারপোল লেখাটা পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে। বিশেষ কেমিকেল কমপাউন্ডের প্রলেপ দেয়ায় কবীর চৌধুরীর রকেট অপারেটরের মনিটরে বা কোন রাডারে এতক্ষণ ধরা পড়েনি ওটা। রানা জানে, ওর আর কবীর চৌধুরীর সব কথা মাইক্রোফোন হয়ে সোহেলের কানে পৌঁছে গেছে, সব শোনার পর ওই হেলিকপ্টার থেকেই বাংলাদেশকে সতর্ক করে দিয়েছে

সে।

মিগ ফাইটারগুলো ঝাঁক বেঁধে চক্কর দিচ্ছে আকাশে। আরেকটা ঝাঁক দূর দিগন্তে মিলিয়ে গেছে, কে জানে কোথায়। উত্তর দিগন্তে এক সারিতে কয়েকটা যুদ্ধজাহাজ উদয় হলো, মাস্তুলে পতপত করে উড়ছে বাংলাদেশী পতাকা, ছুটে আসছে ফুল স্পীডে। ওগুলোর মাথার ওপর দেখা গেল এক ঝাঁক হেলিকপ্টার গানশিপ।

'ড্যাড!' সাবমেরিনের কনিং টাওয়ার থেকে চিৎকার করে উঠল খায়রুল। 'ঠিক কি করতে চাইছ বলো আমাকে। তোমাকে এরকম বিপদের মুখে ফেলে কোথাও আমি যাচ্ছি না।'

পকেট থেকে হাতটা এতক্ষণে বের করল কবীর চৌধুরী। ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসছে সে। 'চিনতে পারছ, মাই সান? তোমার নিজের হাতে তৈরি ডিভাইস এটা। লাল বোতামটা টিপতে যা দেরি, পানির তলায় গিরিখাদের দুপাশের দেয়ালে বসানো দুই টন জেলিগনাইট বিস্ফোরিত হবে। কয়েক লাখ টন মাটি আর পাথর ধসে পড়বে, চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যাবে ফল্টটা, সেই সঙ্গে চাপা পড়বে তেল খনির উৎসমুখ...'

'না, ড্যাড, না!' হাহাকার করে উঠল খায়রুল। 'এত বড় একটা সম্পদ এভাবে ধ্বংস করে দিয়ো না...'

'যে জিনিস আমাদের কোন কাজে লাগবে না, তাকে সম্পদ বলি কিভাবে? তাছাড়া, এই তেলখনি থেকে টাকা তো আমরা কম কামাইনি, খায়রুল।'

'তাই বলে ধ্বংস করে দিতে হবে!'

'রানা যাদেরকে খবর দিয়ে আনিয়েছে তাদের সুবুদ্ধির উদয় হলে ধ্বংস করার প্রয়োজন পড়বে না,' বলল কবীর চৌধুরী। 'বাংলাদেশ ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে একটা আপস রফায় আসতে পারে।'

'কিন্তু ড্যাড, তুমি কি ওদেরকে প্রস্তাব দেয়ার সময় পাবে?' উদ্বেগে অসুস্থ দেখাচ্ছে খায়রুলকে। চারদিকে চোখ বুলিয়ে যুদ্ধজাহাজ ও হেলিকপ্টার গানশিপ কত কাছে এল দেখে নিল সে, তারপর মিগগুলোর মতিগতি বোঝার চেষ্টা করল।

'রানাকে নিয়ে এখন আমি হেলিকপ্টারে চড়ব,' বলল কবীর চৌধুরী। 'ওর কাছে নিশ্চয়ই মাইক্রোফোন আছে, কাজেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে কোন সমস্যা হবে না। আমার প্রথম শর্ত, আধাআধি বখরা চাই। দ্বিতীয় শর্ত, রানার বেঁচে থাকা চলবে না। তেলের অর্ধেক বখরা পাবার বিনিময়ে ওকে হারাতে হবে। শুধু এই দুটো শর্ত মানা হলে আন্ডারওয়াটার ফ্যাসিলিটি যেমন আছে তেমনি থাকবে। তা না হলে এই ডিভাইস ব্যবহার করব আমি, লাল বোতাম টিপে দেব। শক ওয়েভ সাবমেরিনের মারাত্মক ক্ষতি করবে, মাই সান, কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূরে সরে যাও তোমরা...'

'কিন্তু তুমি যে বললে রানাকে পরীক্ষা করবে?' ঘন ঘন মিগগুলোর দিকে তাকাচ্ছে খায়রুল। পশ্চিমে হারিয়ে যাওয়া দুটো মিগ ফিরে এল আবার।

কবীর চৌধুরী হাসল। 'হ্যাঁ, করবই তো। কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁস করাটা কি উচিত হবে? তুমি যাও, খায়রুল।'

বাপের নির্দেশ মেনে নিতে পারছে না খায়রুল। 'কিন্তু, ড্যাড...'

খায়রুলের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব চিন্তা করার খানিকটা সময় এনে দিল রানাকে। কবীর চৌধুরী বলছে, হেলিকপ্টার নিয়ে আবার আকাশে উঠবে সে, তার সঙ্গে রানাও থাকবে। জানা কথা, রানাকে জিম্মি হিসেবে ব্যবহার করতে চায় সে, ওর সঙ্গে থাকা মাইক্রোফোনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে নিজের শর্ত জানিয়ে আপস রফার প্রস্তাব দেবে।

কবীর চৌধুরীর প্রস্তাবে পাগল ছাড়া আর কেউ রাজি হবে না। বাংলাদেশেরও রাজি হবার কথা নয়। প্রথম কারণ, একজন সন্ত্রাসীর কাছে নতি স্বীকার করা যে-কোন দেশের জন্যে অত্যন্ত অসম্মানজনক ও নীতিবিরুদ্ধ একটা কাজ। দ্বিতীয় কারণ, যে চুক্তিই হোক, কবীর চৌধুরী সে চুক্তি ভেঙে ছলে-বলে-কৌশলে বেশিরভাগ বা পুরোটা তেল মেরে দেয়ার চেষ্টা করবে। না, কবীর চৌধুরীর সঙ্গে যৌথ অংশীদারিত্বের ব্যবসা করা বাংলাদেশের উচিত হবে না। কিন্তু কবীর চৌধুরী তো প্রস্তাবের সঙ্গে জিম্মিকে খুন করার শর্তও দেবে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ কি করবে?

দেশের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিতে রানার আপত্তি নেই। কিন্তু নিজের প্রাণের বিনিময়ে দেশ উপকৃত হবে কিনা, এ-ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে হবে ওকে।

দ্রুত হিসাব করল রানা। হাতে খুব একটা কম সময় নেই। খায়রুল এখনও কনিং টাওয়ারে দাঁড়িয়ে বাপের সঙ্গে তর্ক করছে। সাবমেরিন নিয়ে সারফেস ত্যাগ করার পরও আন্ডারওয়াটার ফ্যাসিলিটি ছেড়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে অন্তত পনেরো থেকে বিশ মিনিট সময় লাগবে তার। ছেলের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে জলমগ্ন গিরিখাদের গায়ে বসানো বিস্ফোরক ফাটাবে না কবীর চৌধুরী। এই সময়সীমার ভেতরই কিছু একটা করতে হবে রানাকে। হাত বাঁধা থাকলেও, ওর যে কিছু করার নেই তা নয়।

পিছমোড়া করে বাঁধা রানার হাতের আঙুল বেল্টের একটা বোতাম ছুঁয়ে আছে। বেল্টটাই রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইস, ইচ্ছে করলে এখুনি হেলিকপ্টারটা উড়িয়ে দিতে পারে রানা। প্ল্যাটফর্মটা খুব বড় নয়, হেলিকপ্টারের ফুয়েল ট্যাংক বিস্ফোরিত হলে পাইলট, গানার, রকেট অপারেটর, রানা ও কবীর চৌধুরীর মারা যাবার কথা; এমনকি কনিং টাওয়ারে দাঁড়িয়ে থাকা খায়রুলও

হয়তো বাঁচবে না।

হঠাৎ কোন আবেগ নয়, অকাট্য যুক্তি রানাকে আত্মহত্যা করার পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে বলছে। হিসাবটা এত সহজ যে লোভটা সামলানো অত্যন্ত কঠিন বলে মনে হলো ওর। সাগরের তলায় রয়েছে শত-সহস্র কোটি টাকার তরল সোনা, এর পুরোটারই বৈধ মালিক বাংলাদেশ। এই তেল পেলে তেরো কোটি বাঙালী প্রাচুর্যের মুখ দেখবে, একজন লোকও গরীব থাকবে না। তেরো কোটি মানুষকে ধনী করে দেয়ার বিনিময়ে যদি মরে যেতে হয়, সেই মৃত্যুর চেয়ে গৌরবের আর কিছু আছে কি? এই মুহূর্তে যদি কবীর চৌধুরী মারা যায়, তেল খনির উৎসমুখ হাজার কোটি টন পাথরের নিচে চাপা পড়বে না। আর তাকে মারতে হলে, নিজেকেও রানার মারতে হবে। সহজ হিসাব, দুইয়ে দুইয়ে চার।

কবীর চৌধুরী ছেলের ওপর বিরক্ত, বলছে, 'তুমি অযথা সময় নষ্ট করিয়ে দিচ্ছ, খায়রুল। এক ঢিলে দুই পাখি মারার এই সুযোগ আমি ছাড়তে পারি না। বাংলাদেশ সরকার আমার শর্ত দুটো মেনে নিলে কি লাভ ভেবে দেখেছ? তেল বিক্রির টাকা এখন চার ভাগ হয়ে যাচ্ছে, তখন হবে দু'ভাগ—অর্থাৎ আমাদের আয় আরও বাড়বে। ফোরবল-এর কোন অস্তিত্বই থাকবে না। লাভ শুধু এখানেই নয়—মাসুদ রানা না থাকলে আমাদের প্রতিটি প্রজেক্ট এখন থেকে সাফল্যের মুখ দেখবে...'

'কিন্তু, ড্যাড...,' খায়রুল আতঙ্কিত, কারণ যুদ্ধজাহাজগুলো আর দশ মাইল দূরেও নয় এখন।

'শাট আপ!' গর্জে উঠল কবীর চৌধুরী। 'বেআদবি না করে যা বলছি করো। এখুনি নেমে যাও সাবমেরিন নিয়ে।' হাতঘড়ি দেখল সে। 'এখন থেকে ঠিক পনেরো মিনিট পর বোতামে চাপ দেব আমি—ওরা যদি আমার শর্ত না মানে। আর কোন কথা নয়, খায়রুল, এবার তুমি যাও।'

'সরি, ড্যাড,' দৃঢ় একটা ভঙ্গি নিয়ে বলল খায়রুল। 'তোমাকে ফেলে কোথাও যাচ্ছি না আমি।' কনিং টাওয়ার থেকে বেরিয়ে এল সে, লাফ দিয়ে সাবমেরিন থেকে প্ল্যাটফর্মে চলে এল। 'হেলিকপ্টার নিয়ে আকাশে উঠবে? বেশ, আমিও তোমার সঙ্গে থাকব।' অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে হেলিকপ্টারের দিকে এগোল সে।

ছেলের পিছু নিয়ে অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল কবীর চৌধুরী।

গানার ও রকেট অপারেটর বন্দী রানাকে নিয়ে কপ্টারে চড়ল। জ্যাকেটটা সীটের পিঠ থেকে নিয়ে রানার কোলের ওপর ফেলল পাইলট। খায়রুল বসল রানার ডানপাশের খালি সীটটায়, একটু পিছনে; আরেক দিকে কবীর চৌধুরী, আগের সেই বাঁ পাশের সীটেই।

'খায়রুল, সীটের সঙ্গে বাঁধো রানাকে,' ছেলেকে নির্দেশ দিল কবীর চৌধুরী। 'কখন কি করে বসে, সাবধানের মার নেই।'

পাইলটের কাছ থেকে এক প্রস্থ রশি চেয়ে নিয়ে সীটের সঙ্গে পেঁচিয়ে রানাকে বাঁধল খায়রুল।

সবাই আবার হেডসেট পরছে মাথায়, কবীর চৌধুরী বলল, 'রানার মাথাতেও পরাও। ওর মাধ্যমেই বাংলাদেশকে প্রস্তাবটা দেব আমি।'

রানার মনে আশ্চর্য এক উল্লাস। ওর একটা আঙুল এখনও রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইসের বোতামটা ছুঁয়ে আছে। দু'বার টিপে দিলেই কোলের ওপর রাখা শক্তিশালী জেলিগনাইট বিস্ফোরিত হবে। সৌভাগ্যই বলতে হবে, একা শুধু কবীর চৌধুরী নয়, তার কুখ্যাত ছেলে খায়রুলও হেলিকপ্টারে উঠেছে। বোতাম টিপলে শুধু যে চৌধুরী বংশ ধ্বংস হবে, তা নয়, সেই সঙ্গে তেলখনিটাও অক্ষত অবস্থায় পেয়ে যাবে বাংলাদেশ। এখন শুধু দরকার

আত্মত্যাগের ইচ্ছাটাকে কাজে পরিণত করা।

তবে আবেগের বশে হুট করে কিছু করে বসতে রাজি নয় রানা। দেশের স্বার্থে প্রাণ দিতে হয় দেবে, তবে তার আগে এ-ও দেখবে যে এমন কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা যাতে সাপও মরে আবার লাঠিও যেন না ভাঙে।

ইতিমধ্যে সারফেস থেকে নিচে নেমে গেছে সাবমেরিন। প্ল্যাটফর্মকে ঘিরে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর চারটে হেলিকপ্টার গানশিপ চক্কর দিচ্ছে বিরতিহীন। গোটা আকাশ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে ঝাঁক বেঁধে চারদিকে উড়ছে মিগ ফাইটারগুলো। তিনটে যুদ্ধজাহাজ প্ল্যাটফর্ম থেকে এখন মাত্র তিন কি চার মাইল দূরে।

হেলিকপ্টার প্ল্যাটফর্ম ত্যাগ করার পর কবীর চৌধুরী পাইলটকে নির্দেশ দিল, 'রেডিও অন করো, হে। দেখো কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো। পরিচয় জানিয়ে তাকে বলো, রানা কথা বলতে চায়।'

অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল রানা। 'সোহেলকে তো তুমি চেনোই, কবীর চৌধুরী। আমাদের সব কথা শুনতে পাচ্ছে ও। শুধু তাই নয়, বিসিআই চীফ, অর্থাৎ আমার বসের সঙ্গেও সরাসরি যোগাযোগ আছে ওর।' খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। 'যুদ্ধজাহাজগুলোর মাথার ওপর ওই যে বেসামরিক হেলিকপ্টারটা দেখছ, ওটাতেই আছে সোহেল। একটু চেষ্টা করলেই ওর ফ্রিকোয়েন্সি পেয়ে যাবে পাইলট। সোহেলই তখন জানাবে তোমার প্রস্তাব শুনে বাংলাদেশ কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।'

'ভেরি গুড!' উল্লাসে অধীর হয়ে উঠল কবীর চৌধুরী। 'এখন দেখার বিষয়, আমার জীবনের মূর্তিমান অভিশাপ মাসুদ রানাকে কোটি কোটি ব্যারেল তেল পাবার বিনিময়ে বলি দিতে রাজি হয় কিনা বিসিআই তথা বাংলাদেশ। আগেই বলেছি, তোমার জন্যে

এটা একটা কঠিন পরীক্ষা, রানা। গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনব আমরা সোহেলকে তুমি কি বলো। তোমার দেশপ্রেম কি এতই প্রবল যে সোহেলকে অনুরোধ করবে বাংলাদেশ যাতে আমার প্রস্তাব মেনে নেয়? দেশকে ভালবেসে আমার হাতে মরতে তুমি আপত্তি করবে না?'

'আবার না কেঁদে ফেলে,' রানার আরেক পাশ থেকে বলল খায়রুল। 'সমস্ত অতীত অপরাধের জন্যে ক্ষমা চেয়ে প্রাণ ভিক্ষার জন্যে তোমার হাতে-পায়ে ধরলে আমি একটুও অবাক হব না।'

'ধ্যাত্! নাহ্!' কবীর চৌধুরীর গলায় কৃত্রিম তিরস্কার, হাসছে। 'রানাকে এত ছোট করে দেখা তোমার উচিত হচ্ছে না, মাই সান। তুমি কি বলতে চাইছ, ওর আত্মসম্মান জ্ঞান বলতে কিছুই নেই?'

অকস্মাৎ বাপ-বেটার গালে যেন কষে চড় মারল পাইলট। 'স্যার, সর্বনাশ হয়ে গেছে! দুটো সুপারট্যাংকার থেকে মেডে কল পাচ্ছি আমি। মিগ ফাইটার থেকে রকেট ছোঁড়া হয়েছে, দুটোতেই আগুন ধরে গেছে...'

'এতক্ষণে বোঝা গেল দুটো মিগ কোথায় গিয়েছিল,' দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিস করে বলল খায়রুল।

'গোক্ষুরের লেজে পা দিয়েছে বাংলাদেশ,' হেডসেটে কবীর চৌধুরীর গলা পেল রানা। 'এর পরিণতি যে কি ভয়াবহ হবে, ওরা তা কল্পনাও করতে পারছে না। আমি এমন প্রতিশোধ নেব...'

'তুমি শুধু হুমকিই দাও,' অভিযোগের সুরে বলল খায়রুল, 'সুযোগ থাকতে সেই হুমকি কাজে পরিণত করো না। আমি বলি কি, ড্যাড—মুঠোয় যখন পেয়েছি, আর দেরি করার কোন মানে হয় না, মাথায় একটা গুলি করে রানাকে সাগরে ফেলে দাও এখুনি।'

'আরও একটা দুঃসংবাদ, স্যার,' বলল পাইলট; এটাকে চড় না বলে পদাঘাত বলাই উচিত। 'দুই ট্যাংকারের মেডে কল-এর

জবাবে ওদের শিপিং কোম্পানি লা মর্তে ল্যাম্পি জানাচ্ছে, প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরে ওদের যে আরও পাঁচটা সুপাট্যাংকার রয়েছে, সেগুলো থেকেও মেডে কল রিসিভ করছে তারা।'

'হোয়াট!'

'ওগুলোতেও আগুন জ্বলছে, স্যার। সন্দেহ করা হচ্ছে, রানা এজেন্সির ডুবুরীরা নোঙর করা দুটো ট্যাংকারে লিমপেট মাইন আটকে রেখে গিয়েছিল। তৃতীয় ট্যাংকারে বারোটা গ্রেনেড ছোঁড়া হয়েছে গ্রেনেড লঞ্চারের সাহায্যে—পাশ কাটাবার সময় একটা ইয়ট থেকে। বাকি দুটো ট্যাংকারে বেসামরিক হেলিকপ্টার থেকে বোমা ফেলা হয়েছে। প্রতিটি স্যাবটাজের জন্যে রানা এজেন্সিকেই দায়ী করছে লা মর্তে ল্যাম্পি।'

'কেন?'

'কোম্পানির হেড অফিসকে টেলিফোনে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল, তাদের সবগুলো সুপারট্যাংকার যেন চট্টগ্রাম বন্দরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। শুনে হাসাহাসি করছিল ওরা। তারপরই এই ঘটনা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, টেলিফোনটা করা হয়েছিল রানা এজেন্সির হেড অফিস, লন্ডন থেকে।'

কবীর চৌধুরী বলল, 'রানা এজেন্সির কপালও তাহলে পুড়ল। দ্যুমা দ্যেঁতা চেরোকির সঙ্গে লাগার ফল এবার টের পাবে ওরা।'

'না, স্যার,' তাড়াতাড়ি বলল পাইলট। 'আমি আরও যে-সব মেসেজ পাচ্ছি, তাতে দেখা যাচ্ছে দ্যুমা দ্যেঁতা চেরোকি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। হসপিটালের বেড থেকে বলেছেন, যেহেতু আপনি তাঁকে এই ব্যবসায় নামিয়েছেন, তাই রানা এজেন্সির বিরুদ্ধে যা করার আপনাকেই করতে হবে। আপনি এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে চেরোকি আপনাকে এক হাত দেখে নেবেন বলে হুমকিও দিয়েছেন।'

সে থামতেই খায়রুল বলল, 'আমি বলি কি, ড্যাড, রানার

সঙ্গে তোমার পাইলটকেও সাগরে ফেলে দাও। একের পর এক এত দুঃসংবাদ, মনটাই ভেঙে দিচ্ছে...'

'তুমি প্রলাপ বকছ!' ছেলেকে এক ধমকে চুপ করিয়ে দিল কবীর চৌধুরী। তারপর পাইলটকে বলল, 'ওর মাথার ঠিক নেই, তুমি কিছু মনে কোরো না। এখন দেখো দেখি, সোহেলের ফ্রিকোয়েন্সি পাও কিনা।'

'কিন্তু, স্যার...,' শুরু করেও থেমে গেল পাইলট, যেন কথা বলতে ভয় পাচ্ছে। 'না, থাক।'

'কি ব্যাপার? আরও কোন দুঃসংবাদ নাকি?' মারমুখো হয়ে জানতে চাইল খায়রুল।

'মাফ করবেন, স্যার,' ভয়ে ভয়ে বলল পাইলট। 'ঘরে বউ-বাচ্চা আছে, আপনারা আমাকে সাগরে ফেললে তারা না খেয়ে মরবে।'

'তারমানে তুমি কোন মেসেজ চেপে যাচ্ছ।' কবীর চৌধুরীর গলায় অবিশ্বাস। 'কি! এত বড় স্পর্ধা তোমার? কার মেসেজ তাড়াতাড়ি বলো, তা না হলে...'

'আমি এখন যাই কোথায়!' প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা হলো পাইলটের। 'বাপ বলেন ঝেড়ে কাশ, ছেলে বলে মরতে চাস, আমার তো গলায় ফাঁস।'

'এটা কাব্যচর্চার সময় নয়,' ধমক দিল কবীর চৌধুরী। 'কার মেসেজ? কি বলল?'

'আমাদের মাত্র একটা সাবমেরিন পালাতে পেরেছে, স্যার,' বলল পাইলট। 'বাকি দুটোকে টর্পেডো মেরে ডুবিয়ে দিয়েছে ওরা।'

খায়রুলের প্রতিক্রিয়া হলো তাৎক্ষণিক। 'ড্যাড, এখনও তুমি রানাকে বাঁচিয়ে রাখবে?'

'শাট আপ!' ছেলেকে চুপ করিয়ে দিয়ে কবীর চৌধুরী

পাইলটকে বলল, 'এই মেসেজ কে দিল তোমাকে?'

'কেউ দেয়নি, স্যার,' বলল পাইলট। 'ঢাকা থেকে রাহাত খান নামে কোন ভদ্রলোককে রিপোর্ট করছিল বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর একজন ন্যাভাল অফিসার, সেই রিপোর্ট আমি শুনে ফেলেছি। আরও শুনলাম...'

'থামলে কেন, বলো আর কি শুনলে!'

'ঢাকার ওই ভদ্রলোক সোহেল নামে এক ভদ্রলোককে কিছু তথ্য ও নির্দেশ দিলেন, স্যার।'

'তথ্য? নির্দেশ?'

'জ্বী, স্যার।' ঘন ঘন ঢোক গিলছে পাইলট। 'আমরা এখানে যা বলছি, ওরা সব শুনতে পাচ্ছে, স্যার। আপনার প্রস্তাব শুনে ভদ্রলোক বললেন, ওটা ভুয়া। আপনার শর্তে ওরা রাজি হলেও আপনি নাকি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আন্ডারওয়াটার ফ্যাসিলিটি ধ্বংস করে দেবেন। বলছেন, আপনি নাকি পাগল-ছাগল মানুষ, কথার দাম নেই। তাই ওঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আমাদের সঙ্গে কোন কথাই বলবেন না। শুধু তাই নয়, সাবমেরিন ও যুদ্ধজাহাজগুলোকে প্লাটফর্ম থেকে অন্তত পাঁচ মাইল দূরে সরে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

'আমার ড্যাডকে পাগল-ছাগল বলল?' খায়রুল হতভম্ব।

'তারমানে ওরা তেল চায় না?' কবীর চৌধুরী বিমূঢ়।

'আমার কথা শেষ হয়নি, স্যার,' বলল পাইলট। 'আসল তথ্যটাই আপনাকে বলা হয়নি।'

'কি?' নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে রেখে জানতে চাইল পাগল বিজ্ঞানী।

'পানির তলার ওই তেলখনির মুখ আমরা ধ্বংস করে দিলে ওদের নাকি তেমন কোন ক্ষতিই হবে না,' বলল পাইলট। 'লোকেশনটা জানা থাকায় পাথর আর মাটি সরিয়ে ওটা ওরা

ঠিকই পেয়ে যাবে। বলছে, খুব বেশি হলে মাত্র তিন বছর সময় লাগবে।'

'শালা বুড়ো তো দেখছি ভারি ধড়িবাজ!' বিড় বিড় করল কবীর চৌধুরী। 'কিন্তু রানা? রানার ব্যাপারে কি ভাবছে? নাকি ওকে যে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেটাও ভুয়া বলে মনে করছে?'

'ওই ভদ্রলোক, রাহাত খান, বললেন–রানা নাকি নিজেকে ঠিকই রক্ষা করতে পারবে।'

'রেডিওর সঙ্গে আমার হেডসেটের কানেকশন দাও!' থমথমে গলায় নির্দেশ দিল কবীর চৌধুরী। কানেকশন পেতেই চিৎকার জুড়ে দিল সে, 'শুনুন, বিসিআই চীফ, বুড়ো বয়সে আপনাকে ভীমরতিতে ধরেছে, তা না হলে আমার লোভনীয় প্রস্তাবটাকে ভুয়া বলতেন না। শুনুন, বাংলাদেশের তেরো কোটি হাভাতের মুখ চেয়ে শেষ একটা সুযোগ দিচ্ছি আমি, গ্রহণ করা না করা আপনার ব্যাপার। দশ পর্যন্ত গুনব আমি, এর মধ্যে আমার প্রস্তাবে রাজি না হলে দুই টন বিস্ফোরক ফাটিয়ে দিয়ে ফল্টটা বন্ধ করে দেব। তিন বছর নয়, জঞ্জাল সরিয়ে তেলখনির মুখটা বের করতে সময় লাগবে আপনাদের কম করেও পঞ্চাশ বছর, আর খরচ পড়বে সব মিলিয়ে ছয়শো হাজার কোটি ডলার। এই পরিমাণ অতিরিক্ত টাকা বাংলাদেশের নেই, কাজেই তেলের মুখ কোনকালেই দেখতে পাবেন না। যাই হোক, প্রস্তাব না মানলে প্রথমে রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইসের বোতামে চাপ দেব, তারপর পিস্তলের ট্রিগারে। আজ আপনি কার মুখ দেখে উঠেছিলেন বলুন তো? তেল ও রানা, দুটোই হারাতে যাচ্ছেন। আমি গুনছি–এক...দুই...তিন...'

বারো

গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে সাত বছরের ছোট্ট রানা কাশবনে হারিয়ে গেছে, কাঁদতে কাঁদতে কখন নদীর ধারে চলে এসেছে নিজেও জানে না, উঁচু পাড় থেকে গড়িয়ে ঝুপ করে পানিতে পড়ে তলিয়ে গেল। রূপালি এক ঝাঁক মাছ দূর থেকে আড়চোখে দেখছে ওকে। কাছেই ছিল এক নৌকার মাঝি। সেই প্রৌঢ় মাঝির মুখ অনেক চেষ্টা করেও আজ আর মনে করতে পারে না রানা। সেজন্যে বুকে একটা চিনচিনে কষ্ট লাগছে। হায়, তার সেই ঋণ তো পরিশোধ করা হলো না!

রানা তখন বোধহয় আরও ছোট। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেছে। ঘরের গাঢ় ছায়াগুলোকে জ্যান্ত প্রাণী মনে হচ্ছে, ভূতের ভয়ে কাঁটা দিচ্ছে গা। কান্না শুনে বুকে টেনে নিলেন মা। মায়ের গায়ের সেই গন্ধ আজও লেগে আছে নাকে। গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে সেদিন অভয় দিয়েছিলেন তিনি। চোখের সামনে আজও তাঁকে দেখতে পাচ্ছে রানা, বলছেন—'ভয় কি, বাপ, আমার কাছেই তো আসবি...আয়, চলে আয়।'

নদীর কলকল, বৃষ্টির ঝির্‌ঝির্‌, পাতার খসখস, পাখির কলকাকলি, বাতাসের শোঁ-শোঁ, প্রকৃতি মায়ের সমস্ত বিচিত্র স্বর একযোগে একই দাবি জানিয়ে বলছে, 'যেতে নাহি দিব।'

তারপর চোখের সামনে ভিড় করে দাঁড়াল অসংখ্য মানুষ, শিশু

থেকে বৃদ্ধ সব বয়সেরই আছে; কবে বা কিভাবে মনে পড়ে না, শুধু মনে পড়ল এদেরকে বাঁচিয়েছিল ও। বলছে, 'না! না!'

মেয়েগুলো সোহানার সঙ্গে এক জোট হয়ে চলে এল, অনেককেই রানা ভাল করে চিনতে পারছে না। কান্না ভেজা সব চোখে একই প্রশ্ন, 'কেন যাবে? কোথায় যাবে?'

তারপর সোহেল। তাকে রানা রাগে ফেটে পড়তে দেখল। 'এ কাজ করলে আমি তোকে ক্ষমা করব না। কখ্খনো না!'

তার জায়গায় রানা এখন রাহাত খানকে দেখতে পাচ্ছে। হাসছেন তিনি। বললেন, 'ইট'স আপ টু ইউ, মাই বয়। তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে! তোমার প্রতি আমার আশীর্বাদ থাকল।'

এরকম ছেঁড়া ছেঁড়া হাজারও স্মৃতি ভিড় করছে মনে।

তারপর রানা শুনতে পেল, কবীর চৌধুরী গুনছে, '...পাঁচ...ছয়...'

মাত্র এক কি দুই সেকেন্ডের মধ্যে জীবনের পুরো অতীত ভ্রমণ করে এসেছে ও।

'...সাত...আট...'

রানা ভয় পাচ্ছে না।

'নয়...' নাটকীয়তা আনার জন্যে বিরতি নিল কবীর চৌধুরী। তারপর সুর করে উচ্চারণ করল, 'দ-অ-অ-শ!'

এবার অন্তত প্রতিশ্রুতি ঠিকই রক্ষা করল কবীর চৌধুরী। রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইসটা তার হাতে আগেই বেরিয়ে এসেছিল, দশ পর্যন্ত গোনা শেষ হতে লাল বোতাম পর-পর দু'বার টিপে দিল।

বিস্ফোরণের কোন আওয়াজই ওরা শুনতে পেল না, তবে দেখতে পেল নিচে থেকে মাথাচাড়া দিচ্ছে সাগরের বিশাল একটা অংশ। দুশো ফুট ওপরে রয়েছে ওদের হেলিকপ্টার, সরাসরি নিচে সাগরের শান্ত সারফেস হঠাৎ ফুলে-ফেঁপে উঠল, যেন প্রকাণ্ড

একটা কুঁজ তৈরি হচ্ছে, তারপর কুঁজের সংখ্যা বাড়তে লাগল, আকৃতি বদলে প্রতিটি বিপুল জলরাশির স্তম্ভ হয়ে উঠছে, জ্যান্ত দানবের মত নাগাল পেতে চাইছে ওদের। সাগরের এই আকস্মিক উত্থান নিঃশব্দ নয়, তবে এর সঙ্গে তুলনা করা চলে এমন কোন আওয়াজের সঙ্গে কেউই ওরা পরিচিত নয়। স্তম্ভগুলো একেকটা পাহাড় যেন, স্বপ্ন; ভেতরে দেখা যাচ্ছে প্রকাণ্ড আকারের পাথর, ভাঙা টাওয়ার ও প্ল্যাটফর্মের টন-টন লোহা ও ইস্পাত, অক্সিজেন ভরা ট্যাংক, সাবমেরিনের ভাঙা অংশ, শত-শত মোটা পাইপ আর মানুষের লাশ।

সাগরের তলায় চেইন রিয়্যাকশনে যতক্ষণ বিস্ফোরকগুলো ফাটল, একের পর এক নতুন নতুন কুঁজ ও স্তম্ভ দেখতে পেল ওরা। এক সময় ধীরে ধীরে নিচু হলো স্তম্ভগুলো, তার বদলে প্রায় দুই বর্গমাইল জুড়ে শুরু হলো প্রবল আলোড়ন। যেন সবকিছু উলটপালট করে দিয়ে সাগরের তলায় ভূমিকম্প হচ্ছে। উথলে ওঠা সাগর থেকে দৈত্যাকার ঢেউ তৈরি হলো, একেকটা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ফুট উঁচু। তিন কি চার মাইল দূরে স্থির হয়ে থাকা যুদ্ধজাহাজগুলো ঘণ্টায় ষাট মাইল গতিতে ছুটে আসা সেই ঢেউয়ের ধাক্কায় খড়কুটোর মত ভেসে যাচ্ছে আরও দূরে। স্তম্ভগুলো ভেঙে পড়লেও, গোটা আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিপুল জলকণা, সূর্য সহ দশ দিগন্ত সেই ঘন কুয়াশার ভেতর ঢাকা পড়ে গেল।

যুদ্ধজাহাজ, হেলিকপ্টার গানশিপ, নিঃসঙ্গ বেসামরিক হেলিকপ্টার বা মিগ ফাইটারগুলোকে ওরা এখন আর দেখতে পাচ্ছে না, এমনকি সাগরের আলোড়িত সারফেসও কুয়াশার আড়ালে পড়ে গেছে।

নিঃস্তব্ধতা ভাঙল কবীর চৌধুরী। 'ছি-ছি, রানা, এই তোমার দেশপ্রেম?' হেসে উঠল সে। 'বাংলাদেশের এত বড় একটা ক্ষতি

চোখের সামনে ঘটতে দেখেও একটিবার বাধা দিলে না তুমি?'

শান্ত ও চুপচাপ, রানাকে যেন বোবায় ধরেছে।

'ভেবেছিলাম তোমার দেশপ্রেমের একটা পরীক্ষা নেব,' আবার বলল পাগল বিজ্ঞানী। 'কিন্তু তুমি যে এভাবে সাদা খাতা জমা দেবে, কল্পনাও করিনি।'

রানা সাড়া দিচ্ছে না।

পাইলট বলল, 'এখন আমরা কি করব, স্যার?'

'রিটার্ন জার্নি শুরু করার আগে আরেকটা কাজ বাকি আছে,' মনে করিয়ে দেয়ার সুরে বলল খায়রুল। 'ড্যাড, মাথায় একটা গুলি করে রানাকে নিচে ফেলে দিই?'

'বোকার মত কথা বোলো না!' ছেলেকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল কবীর চৌধুরী।

'কিন্তু তুমিই তো বলছিলে যে...'

'কি বলেছি ভুলে যাও,' বলল কবীর চৌধুরী। 'রানাকে এখন মেরে ফেললে আমাদের কি হবে ভেবে দেখেছ? এই হেলিকপ্টার আকাশে রাখবে ওরা? অতগুলো গানশিপ আর মিগ ফাইটারের সঙ্গে আমরা পারব?'

খায়রুল ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল। 'এখন তাহলে কি হবে?'

'রানাকে যতক্ষণ বাঁচিয়ে রাখব ততক্ষণ ওরা গুলি করবে না,' বলল কবীর চৌধুরী। এক মুহূর্ত চিন্তা করল সে, তারপর পাইলটকে বলল, 'পয়েন্ট পেড্রোতে ফিরে চলো, হে। রানাকে আপাতত ওখানেই আমরা বন্দী করে রাখব। ভেবে দেখতে হবে, ওকে মুক্তি দেয়ার বিনিময়ে বিসিআই-এর কাছ থেকে কত টাকা চাওয়া যায়।'

দিক বদলে পশ্চিম দিকে রওনা হলো হেলিকপ্টার।

'গানশিপ আর ফাইটার পিছু নেবে,' মন্তব্য করল খায়রুল,

ভয় পেয়েছে সে।

কবীর চৌধুরী হাসল। 'বাপের ওপর আস্থা রাখো, খায়রুল। পিছনে ওরা কতক্ষণ থাকবে? ফুয়েলের হিসাব রাখতে হবে না? আমার তো ধারণা, কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে মিগ বা গানশিপ কিছুই আমরা দেখতে পাব না।' পাইলটের মাথার পিছনে টোকা দিল সে। পাইলট ঘাড় ফেরাতে ইঙ্গিতে নির্দেশ দিল—রেডিও অফ করো।

এক মিনিট পরই ঘন কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ওদের হেলিকপ্টার। কবীর চৌধুরীর ধারণাই ঠিক—মিগগুলো এরই মধ্যে আকাশ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে, ফিরতি পথে রয়েছে হেলিকপ্টার গানশিপের ঝাঁকটা। এমনকি যুদ্ধজাহাজগুলোও উত্তর দিকে ঘুরে গেছে।

'আর কোন ভয় নেই,' সহাস্যে বলল কবীর চৌধুরী। 'এবার তুমি তোমার অনেক দিনের সাধ পূরণ করতে পারো, মাই সান।'

'মানে?' খায়রুল বাপের কথা ঠিক বুঝতে পারছে না।

'তোমার বাপকে রানা কম অপমান করেছে? আর ক্ষতি? যখনই বড় কোন কাজে হাত দিয়েছি, তখনই কোত্থেকে ছুটে এসে সব লণ্ডভণ্ড করে করে দিয়েছে রানা। তুমি প্রতিশোধ নিতে চাও না?'

'চাই না আবার! কিন্তু তুমি বলছিলে বিসিআই-এর কাছ থেকে মুক্তিপণ...'

'আরে বোকা, তখন তো রেডিও অন করা ছিল।' হাসল কবীর চৌধুরী। 'যা বলেছি ওদেরকে শুনিয়ে। এখন ওরা আমাদের পিছু নিয়ে আসছেও না, আমাদের কথা শুনতেও পাচ্ছে না। কাজেই, ওকে নিয়ে যা খুশি করতে পারো তুমি।'

'আমার বিচার খুব নির্মম, ড্যাড।' খায়রুল গম্ভীর। 'এটা ফৌজদারী আদালতও নয়, আমার আইনও সাধারণ কোন আইন

নয়।' রানার দিকে তাকাল সে। 'এটা সামরিক ট্রাইবুনাল, রানা। এই ট্রাইবুনালে কোন আপিল চলে না। এই গ্রহটাকে স্বর্গে পরিণত করার মহান সাধনায় তুমি বিঘ্ন সৃষ্টি করেছ বারবার, এই অপরাধে আমি তোমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলাম। এবং এই দণ্ড এখুনি কার্যকর করা হবে।'

'আমিও তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম,' অনেকক্ষণ পর এই প্রথম মুখ খুলল রানা। হাসছে ও। 'একা শুধু তোমাকে নয়, তোমার উন্মাদ জনক কবীর চৌধুরীকেও ওই একই শাস্তি দিলাম। তোমাদের বিরুদ্ধে একটাই অভিযোগ–মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। তোমাদের সহযোগী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করলাম পাইলট, গানার আর রকেট অপারেটরকেও। ওদেরকেও মৃত্যুদণ্ড দিলাম।'

'ড্যাড, কি বলছে ও?' খায়রুল বিরক্ত।

'ওর কথায় কান দিয়ো না,' বলল কবীর চৌধুরী। 'হয় ও পাগল হয়ে গেছে, নয়তো ব্লাফ দেয়ার চেষ্টা করছে। তুমি তোমার কাজ শুরু করো। পিছমোড়া করে বাঁধা হাত দুটো যেমন আছে তেমনি থাকুক, তবে সীটের সঙ্গে বাঁধা রশিটা খুলে নাও। শুধু সাগরে ফেলে দিলেই চলে, হানড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত হবার জন্যে মাথায় একটা গুলি করো। সাবধানে, কেমন? সবচেয়ে ভাল হয় খুলিতে মাজল ঠেকিয়ে ট্রিগার টানলে।'

কবীর চৌধুরী থামতেই হেসে উঠল রানা।

'ড্যাড, ও হাসছে কেন?' খায়রুল অস্বস্তি বোধ করছে।

'হাসছি এই জন্যে যে আমার কথা তোমরা বিশ্বাস করবে না, তাই,' বলল রানা।

'তোমার কি কথা বিশ্বাস করব না?' খায়রুল অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখছে।

'তোমাকে আর তোমার বাপকে একটা কথা ভেবে দেখতে

বলি,' বলল রানা। 'আমার বস্ রাহাত খান কি বলেছেন? বলেছেন, আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারব। তাঁর এ-কথার তাৎপর্য কি, ভেবে দেখো।'

পাইলট বলল, 'হ্যাঁ, সোহেল আহমেদকে এই কথা রাহাত খান সত্যি বলেছেন, আমি নিজের কানে শুনেছি...'

'তুমি চুপ করো!' ধমক দিল কবীর চৌধুরী। 'খায়রুল!'

'ইয়েস, ড্যাড!'

'বোকার মত কিছু করে বোসো না।' ছেলেকে পরামর্শ দিল কবীর চৌধুরী। 'রানাকে আমার বিশ্বাস নেই। সীটে জড়ানো রশিটা খোলার আগে ভাল মত সার্চ করো ওকে।'

'সার্চ করার দরকার নেই,' বলল রানা। 'রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইস আর ডেটোনেটর সহ জেলিগনাইট কোথায় আছে আমিই বলে দিচ্ছি।'

'হোয়াট!' হেলিকপ্টারের ভেতর যেন বোমা পড়ল, থর থর করে কাঁপছে খায়রুল। 'ড্যাড...'

'ড্যাড-ড্যাড কোরো না তো!' দাঁতে দাঁত ঘষল কবীর চৌধুরী। 'আমার বিশ্বাস রানা ব্লাফ দিচ্ছে।'

রানা বলল, 'আমার হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা উচিত হয়নি তোমাদের। ওগুলো সামনে থাকলে আমি কি আর রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইসের নাগাল পেতাম?'

'জানি...,' নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে খায়রুল বলল, 'আমি একটা ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি!'

'আমি সবাইকে নিয়ে মরতে চাই, এটাকে যদি তোমরা ষড়যন্ত্র বলো, আমার কোন আপত্তি নেই।' রানা হাসছে।

এঞ্জিনের গর্জনকে বাদ দিলে কপ্টারের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে রানা আবার বলল, 'কি আশ্চর্য, তোমরা ডিভাইস আর বিস্ফোরক দেখতেও চাইবে না? মৃত্যুকে

এত ভয় পেলে চলে কি করে?’

সরাসরি রানার দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী, ‘ও-সব তোমার কাছে আছে, এ আমি বিশ্বাস করি না।’

‘আমার কোলে পড়ে রয়েছে, এটা তাহলে কি?’ চোখ ইশারায় জ্যাকেটটা দেখাল রানা।

সবাই জ্যাকেটটার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

‘আমি অনুমতি না দিলে জ্যাকেটে কেউ হাত দিয়ো না,’ সাবধান করে দিল রানা। ‘কেউ হাত দিতে যাচ্ছে দেখলেই বোতামে চাপ দেব আমি।’

‘তুমি সত্যি কথা বলছ কিনা বুঝব কিভাবে?’ রুদ্ধস্বরে জানতে চাইল খায়রুল।

‘ঘাড় বাঁকা করে দেখো আমার ডান হাতের আঙুলগুলো কোথায় রয়েছে,’ বলল রানা। ‘সাবধান, আমার হাত বা আঙুল ছুঁয়ো না–সঙ্গে সঙ্গে হেলিকপ্টার বিস্ফোরিত হবে।’

ঘাড় বাঁকা করে রানার পিঠের নিচের দিকে তাকাল খায়রুল। ‘তোমার ডান হাতের আঙুল তো শার্টের নিচে হারিয়ে গেছে, দেখব কিভাবে?’

‘শার্ট সরাবার অনুমতি চাও।’

‘চাইলাম।’

‘খুব সাবধানে শার্টের কিনারা ধরে একটু উঁচু করো,’ বলল রানা। ‘আবার সতর্ক করছি, হাত বা আঙুল ছোঁবে না।’

শার্ট তুলে খায়রুল দেখল রানার কোমরে জড়ানো বেল্টের বাইরের দিকে সত্যি একটা বোতাম রয়েছে, সেই বোতামে রানার একটা আঙুলও ছোঁয়ানো; ওর আরও দুটো আঙুল বেল্ট ও শিরদাঁড়ার মাঝখানে ঢোকানো–হঠাৎ কেউ টান দিলেও হাতটা বা আঙুলগুলো বেল্ট ছেড়ে সরে আসবে না।

‘কি দেখছ?’ ধৈর্য হারিয়ে জিজ্ঞেস করল কবীর চৌধুরী।

‘একটা বোতাম সত্যি আছে,’ বলল খায়রুল। ‘বেল্টের ভেতর দিকে ডিভাইস থাকতে পারে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।’

পাইলট শুকনো গলায় বলল, ‘বোতাম যখন আছে...’

‘চোপ!’ রানার দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। ‘আমি এখনও মনে করি তুমি আমাদেরকে ধোঁকা দিয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছ...’

‘জ্যাকেটের ভেতর যে জেলিগনাইট আছে, এবার তাহলে তা-ও দেখাতে হয়।’ হাসল রানা। ‘শক্ত মোড়কের ভেতর ভরা ওটা, জ্যাকেটের ভেতর দিকে কাপড় দিয়ে সেলাই করা। খুলে দেখাবার উপায় নেই, হাতের স্পর্শ দিয়ে অনুভব করতে পারো।’

‘ড্যাড...’

খায়রুলকে থামিয়ে দিল কবীর চৌধুরী। ‘হাত দিয়ে দেখো, খায়রুল,’ নির্দেশ দিল সে।

‘শুধু ছুঁয়ে বা একটু টিপে দেখবে,’ বলল রানা। ‘টান দিয়ে কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করলে–বুম!’

দুই ঊরুর মাঝখানে জ্যাকেটটা আটকে রেখেছে রানা। খায়রুল অত্যন্ত সাবধানে হাত বুলাল সেটায়। এক কি দুই সেকেন্ড পরই চট করে হাতটা টেনে নিল সে। ‘ওহ্, গড! ওহ্, গড!’ হাতটা ঘনঘন শূন্যে ঝাড়ছে সে, যেন গরম ছ্যাঁকা খেয়েছে।

‘কি হলো? অমন করছ কেন?’ কবীর চৌধুরী জিজ্ঞেস করল।

‘আছে, ড্যাড। শক্ত কিছু একটা আছে!’

‘আমার বউটা সুন্দরী, তার বিয়ে হয়ে যাবে,’ বলল পাইলট। ‘কিন্তু বাচ্চাগুলো একদম ছোট, খালি পেটে রাস্তায় রাস্তায়...’

‘চোপ! আমাকে চিন্তা করতে দাও!’

কবীর চৌধুরীর ধমক খেয়ে থেমে গেল পাইলট। কপ্টারের ভেতর আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল।

কবীর চৌধুরী কি নিয়ে চিন্তা করছে বলা মুশকিল, তবে

রানার চিন্তার বিষয় হলো যমুনা। বিসিআই-এর ট্রেনিং পাওয়া প্রথম শ্রেণীর এজেন্ট সে, তার কোন কাজে খুঁত বা ক্রুটি থাকা প্রায় অসম্ভব, বিশেষ করে সেই কাজের ওপর যদি আরেকজন স্বদেশী এজেন্টের জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন জড়িত থাকে। ক্রুটি থাকার প্রশ্ন যেমন ওঠে না, তেমনি বেঈমানী করার প্রশ্নও ওঠে না; অথচ দুটোর যে-কোন একটা সত্যি।

কবীর চৌধুরী দশ গোনা শেষ করতে পারেনি, তার আগেই রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইসে চাপ দিয়েছিল রানা। কিন্তু ওর জ্যাকেটে লুকিয়ে রাখা জেলিগনাইট বিস্ফোরিত হয়নি।

সোহেল ও রাহাত খান নিজেদের মধ্যে তেলখনি নিয়ে কি আলাপ করেছেন তার সম্ভবত কোন গুরুত্বই নেই; বেশিরভাগ সম্ভাবনা আলাপটা করা হয়েছে কবীর চৌধুরীকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে—তেলখনি ধ্বংস করলেও বাংলাদেশের তেমন কোন ক্ষতি হবে না, এ-কথা জেনে কবীর চৌধুরী যদি প্ল্যানটা বাদ দেয় ভেবে। মাটি ও পাথর সরিয়ে তেলখনির উৎসমুখে পৌঁছাতে তিন বছর লাগবে, এই হিসাবটা যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়নি রানার। বরং কবীর চৌধুরীর হিসাবটা অনেক বেশি বাস্তব। পঞ্চাশ বছর না হলেও, ত্রিশ বছর তো লাগারই কথা। খরচাও হয়তো ছয়শো হাজার কোটি ডলারের কাছাকাছি পড়ে যাবে। দেশের মানুষের ঘাম ঝরানো এতো কোটি টাকার চেয়ে নিজের দাম বেশি বলে মনে করতে পারেনি রানা, সেজন্যেই বোতামে চাপ দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেনি। যমুনার ক্রুটি দায়ী হোক বা বিশ্বাসঘাতকতা, রানা এখনও বেঁচে আছে; তবে বাংলাদেশ পিছিয়ে গেছে আরেক হিসাবে কম করেও একশো বছর। এর জন্যে যমুনা দায়ী। জেলিগনাইট কেন ফাটেনি, এর জবাব অবশ্যই তাকে দিতে হবে।

ফাটেনি, ফাটবেও না। তবে চৌধুরীরা সে-কথা জানে না।

তাদের এই অজ্ঞতাকে পুঁজি করে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করছে রানা। যে বিস্ফোরক ওকে খুন করতে পারেনি দেখা যাক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই বিস্ফোরকই এখন ওকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে কিনা।

'ফিফটি-ফিফটি চান্স,' নিস্তব্ধতা ভেঙে বলল কবীর চৌধুরী। 'রানার জ্যাকেটে ওটা বিস্ফোরক হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে।'

'এখন তাহলে আমরা...'

ছেলেকে থামিয়ে দিয়ে কবীর চৌধুরী বলল, 'আমরা কোন ঝুঁকি নেব না। ভালয় ভালয় পয়েন্ট পেড্রোতে পৌঁছাই, তারপর দেখা যাবে।'

খায়রুল বলল, 'কিন্তু ড্যাড, ভুলে গেলে চলবে না যে মি. ভবনিয়ার দুর্গে রানার একজন সহকারিণী আছে। সে-ও নিশ্চয়ই বিসিআই এজেন্ট...'

'তার ব্যাপারে মি. ভবনিয়ার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে,' বলল কবীর চৌধুরী। 'মেয়েটিকে খুব ভাল লেগে যাওয়ায় নিজের কাছে রেখে দিতে চান তিনি। আমি তাঁকে পরামর্শ দিয়েছি, যমুনা যদি দল বদলে রাজি হয় তবেই যেন তাকে গ্রহণ করা হয়। আমার বিশ্বাস, ভবনিয়ার যে ক্ষমতা আর ধনসম্পদ, যমুনা দল বদলে রাজি না হয়ে পারবে না।'

রানাকে নিয়ে কি করা হবে বা ওদেরকে নিয়ে রানা কি করবে, এই দুটো প্রশ্ন সযত্নে এড়িয়ে গেল বাপ ও ব্যাটা।

রানা আপাতত খুশি। তবে দুর্গে পৌঁছাবার পর কি ঘটবে, ও জানে না। ধোঁকা দিয়ে যে বেশিক্ষণ টিকে থাকা যাবে না, এটা পরিষ্কার।

তেরো

কিছুটা সূর্যের পিছু নিয়েই দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ছুটল হেলিকপ্টার। কবীর চৌধুরী রেডিও অন করে সাংকেতিক ভাষায় কার সঙ্গে আলাপ করল বোঝা গেল না, তবে পাইলটকে নির্দেশ দিয়ে বলল, ভারতীয় জলসীমার ভেতর ঢুকে কালো রঙ করা একটা বার্জ খুঁজতে হবে।

ব্যাপারটা লক্ষ করে খায়রুল জিজ্ঞেস করল, 'সাংকেতিক ভাষায় কথা বললে যে, ড্যাড? তার মানে কি আমাদের কথা এখনও ওরা শুনতে পাচ্ছে?'

'শুনতে না পাবার কোন কারণ আছে?' পাল্টা প্রশ্ন করল কবীর চৌধুরী। 'আমরা কি রানাকে সার্চ করে মাইক্রোফোনটা কেড়ে নিয়েছি?'

একমুহূর্ত পর খায়রুল বলল, 'কিন্তু খালি চোখে বা মনিটরে কিছুই তো দেখছি না। কোথায় বা কিসে বসে আমাদের কথা শুনছে ওরা?'

'খালি চোখে দেখছি না, কারণ দৃষ্টিসীমার মধ্যে নেই। আর মনিটরকে নির্ঘাত কোনভাবে ফাঁকি দিচ্ছে। বেসামরিক যে হেলিকপ্টারটাকে ঘুর-ঘুর করতে দেখেছিলাম, আমার ধারণা ওটায় সোহেল আছে। কুয়াশা থেকে বেরুবার পর ওটাকে কেউ তোমরা দেখেছ? আমি অন্তত দেখিনি।'

সবাই চুপ করে থাকল।

'আমার ধারণা, ওই হেলিকপ্টার নিয়ে আমাদের সামনে আছে সোহেল,' আবার বলল কবীর চৌধুরী।

সামান্য একটু দিক বদলে বার্জটাকে খুঁজে নিতে পাইলটের কোন সমস্যা হলো না। ক্রুরা তৈরি হয়েই ছিল, হেলিকপ্টার নামতেই দ্রুত ফুয়েল ভরে দিল ট্যাংকে, দশ মিনিট পর আবার রওনা হলো হেলিকপ্টার। ইতিমধ্যে আটশো কিলোমিটার, প্রস্থ অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসেছে ওরা; সূর্য ডোবার খানিক আগেই পৌঁছে যাবে পয়েন্ট পেড্রোতে।

পাইলটকে দিয়ে রেডিও অন করিয়ে সাংকেতিক ভাষায় আবার কার সঙ্গে যেন আলাপ শুরু করল কবীর চৌধুরী। তবে রানা বাধা দিতে আলাপটা সংক্ষেপে সেরে যোগাযোগ কেটে দিতে বাধ্য হলো সে।

রানা বলল, 'এমন ভাব কোরো না, যেন আমি তোমাদের হাতে জিম্মি।'

'তুমি কি বলতে চাও, আমরা তোমার হাতে জিম্মি?' বিদ্রূপের সুরে জানতে চাইল খায়রুল। 'তাই যদি হয়, আমাদের ইচ্ছা অনুসারে হেলিকপ্টার পয়েন্ট পেড্রোয় যাচ্ছে কিভাবে? পাইলটকে তুমি বাংলাদেশে যেতে বাধ্য করছ না কেন?'

'এটা আসলে স্টেলমেট,' বলল রানা। অচলাবস্থা। 'তোমরা আমাকে পয়েন্ট পেড্রোতে নিয়ে যাচ্ছ না, আমি নিজেই ওখানে যাচ্ছি।'

'কেন?' বাপ-ব্যাটা একসঙ্গে জানতে চাইল।

রানা হাসছে। 'প্রশ্নপত্র ফাঁস করা কি উচিত হবে?'

'তারমানে দুর্গে পৌঁছে তুমি আমাদের পরীক্ষা নিতে চাও?' জিজ্ঞেস করল কবীর চৌধুরী।

'ঠিক ধরেছ।'

দুই চৌধুরী নিরবে দৃষ্টি বিনিময় করল। তারপর বড় চৌধুরী, বলল, 'জানি না ঠিক কি করার কথা ভাবছ তুমি, রানা। তবে যমুনার সাহায্য নিয়ে তুমি যদি আমাদেরকে শায়েস্তা করার কথা ভেবে থাকো, নেহাতই বোকামি হবে সেটা।'

'কেন?' রানা চাইছে এ-প্রসঙ্গে আরও কথা বলুক কবীর চৌধুরী।

'একটু আগে মিস্টার ভবনিয়ার সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমার,' বলল কবীর চৌধুরী। 'যা আশা করেছিলাম, তোমার কপাল আরেকটু পুড়েছে, রানা।'

'কি বলতে চাও?'

'বিসিআই এজেন্ট যমুনা ভবনিয়া বাহিনীর প্রধান মিস্টার ভবনিয়ার প্রাইভেট সেক্রেটারি হতে রাজি হয়েছে।' কবীর চৌধুরীর সারা মুখে আত্মতৃপ্তির হাসি। 'তোমার ও নিজের আসল পরিচয় তো স্বীকার করেছেই, বিসিআই-এর গোপন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সব কথা ফাঁস করে দিতেও আপত্তি নেই বলে জানিয়েছে সে। আরও শুনবে? যমুনা বলেছে, সে তার বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য প্রমাণ করার জন্যে নিজের হাতে তোমাকে খুন করতেও রাজি। আমি তোমাকে জ্যান্ত কবর দিতে চাই শুনে মিস্টার ভবনিয়া দুর্গের উঠানে মাটি খুঁড়ে রেখেছে, এ-সব দেখেশুনে যমুনার নাকি খুব অভিমান হয়েছে। কেন? না, সে নিজের হাতে তোমাকে খুন করতে চায়।'

পাইলট জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কি তাহলে কবরের পাশেই নামব?'

যমুনা বিশ্বাসঘাতিনী, এটা রানা মেনে নিতে পারছে না। তার সম্পর্কে মনে সংশয় জেগেছে ঠিকই, কিন্তু এ-ও আশা করছে যে ওর নির্দেশ অমান্য করে ওকে বিস্ফোরক না দেয়ার কারণটা ব্যাখ্যা করতে পারবে যমুনা। ওর এই বিশ্বাস আরও একটু দৃঢ়

হলো কবীর চৌধুরীর কথা শুনে। নিজের হাতে ওকে খুন করতে চায়, যমুনার এ-কথা বলার পিছনে আসল উদ্দেশ্য হয়তো কবীর চৌধুরী যাতে রানাকে দুর্গে ফেরার পথে খুন না করে।

ওদের, যমুনা ও রানার, একটা প্ল্যান আছে। রানা বহাল তবিয়তে দুর্গে ফিরলেই শুধু তা কার্যকরী করা সম্ভব। ওকে নিজের হাতে খুন করতে চায় বলে যমুনা নিশ্চয়ই দুর্গে ওর ফেরাটা নিশ্চিত করতে চাইছে।

সূর্য এইমাত্র ডুবে গেল, তবে দিনের আলো এখনও উজ্জ্বল। পাইলট রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'দুর্গের উঠানে নামতে যাচ্ছি আমরা, স্যার। মিস্টার ভবনিয়ার হেলিকপ্টারের ঠিক পাশেই। কিন্তু তারপর কি হবে, স্যার?'

'মনিটরে কিছু আছে?' জিজ্ঞেস করল খায়রুল। 'কিংবা খালি চোখে কিছু দেখা যাচ্ছে?'

'না।'

হেলিকপ্টার নিরাপদেই ল্যান্ড করল দুর্গের উঠানে। শুধু সশস্ত্র কয়েকজন গার্ডকে দেখা গেল, কাঁধে রাইফেল নিয়ে চারদিকে টহল দিচ্ছে। ভবনিয়া বা যমুনাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। উঠানের আরেক প্রান্তে রোলসরয়েস ও মার্সিডিজগুলোকে দেখা গেল।

'এখন কি হবে?' রানাকে জিজ্ঞেস করল কবীর চৌধুরী।

'অচলাবস্থার অবসান ঘটানোর জন্যে তোমাদেরকে আমি মুক্তি দেব,' বলল রানা। 'তবে শর্ত আছে।'

'আমাদেরকে তুমি মুক্তি দেবে?' খায়রুলের চোখে-মুখে নগ্ন সন্দেহ।

'তুমি চুপ করো!' বলল কবীর চৌধুরী। 'কি শর্ত, রানা?'

'তোমাদের বদলে এই হেলিকপ্টারে আমি যমুনাকে চাই,' বলল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে খায়রুল জিজ্ঞেস করল, 'ড্যাড, গার্ডদের ডেকে বলি, বিসিআই এজেন্টকে নিয়ে আসুক?'

'ভাবছি,' চিন্তিত দেখাল কবীর চৌধুরীকে, 'মিস্টার ভবনিয়া কি যমুনাকে ছাড়তে রাজি হবেন?'

'তাহলে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছ তুমি, ড্যাড?' রাগ চেপে জিজ্ঞেস করল খায়রুল। 'কেমন বন্ধু সে যে তোমার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে সামান্য একটা মেয়েকে হারাতে রাজি হবে না?'

ছেলের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কবীর চৌধুরী রানাকে বলল, 'ধরো, মিস্টার ভবনিয়া রাজি হলেন, কিন্তু যমুনা আসতে চাইল না। তখন কি হবে?'

'তুমি বলো।'

'এই অচলাবস্থার অবসান ঘটাবার সহজ একটা সমাধান আছে আমার কাছে,' বলল কবীর চৌধুরী। 'ভেবে দেখো পছন্দ হয় কিনা।'

'আমি শুনছি।'

'গার্ডদের নিয়ে আমরা সবাই হেলিকপ্টার থেকে নেমে যাব,' বলল কবীর চৌধুরী। 'তুমিও হেলিকপ্টার নিয়ে যেখানে খুশি চলে যাবে।'

'ড্যাড!' অবিশ্বাসে চেঁচিয়ে উঠল খায়রুল। 'হাতে পেয়েও শয়তানটাকে তুমি ছেড়ে দিতে চাইছ?'

'ছেড়ে না দিয়ে আর কোন উপায় আছে?' খেঁকিয়ে উঠল কবীর চৌধুরী। 'দেখতে পাচ্ছ না, রিমোট কন্ট্রোলের বোতামে এখনও ও আঙুল ঠেকিয়ে রেখেছে?'

'দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, ছেলেটাকে তুমি মানুষ করতে পারোনি,' বলল রানা। 'স্রেফ একটা শিক্ষিত গাধা বানিয়েছ...'

বাধা দিল কবীর চৌধুরী। 'আমার প্রস্তাব সম্পর্কে বলো।'

‘তোমরা যে বাংলাদেশের এত বড় ক্ষতি করলে,’ বলল রানা, ‘ভেবেছ তার শাস্তি না দিয়েই তোমাদেরকে আমি ছেড়ে দেব?’

কবীর চৌধুরীর মুখে তৃপ্তির হাসি। ‘যাক, শেষ পর্যন্ত তাহলে স্বীকার করলে যে বাংলাদেশের খুব বড় একটা ক্ষতি হয়েছে। তা, শাস্তিটা কিভাবে তুমি দিতে চাও, শুনি? বিস্ফোরক ফাটিয়ে? জেলিগনাইট বিস্ফোরিত হলে তুমিও তো মারা যাবে। আর তুমি যে একটা কাপুরুষ, মরতে ভয় পাও, সেটা তো তখনই প্রমাণ হয়ে গেছে যখন আমি আন্ডারওয়াটার ফ্যাসিলিটি উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিলাম, অথচ তুমি রিমোট কন্ট্রোলের বোতামে চাপ দিলে না।’

অপমানটা রানা গায়ে মাখল না। ‘সব কথা কি তোমাকে আমি বলেছি, না বলব? শোনো, নিজেকে বাঁচিয়ে তোমাকে শাস্তি দেয়ার উপায় আমার জানা আছে। আমি সংকেত দিলেই সোহেল দলবল নিয়ে চলে আসবে। তবে বাধ্য না হলে আমি চাইব না যে একটা খুনোখুনি বাধুক বা রক্তগঙ্গা বয়ে যাক। যা বলছি, শোনো–যমুনাকে ডেকে পাঠাও।’

এক মুহূর্ত চিন্তা করল কবীর চৌধুরী। তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি থেকে সরে যাবে না তো? যমুনাকে পেলে আমাদেরকে নেমে যেতে দেবে?’

‘আমি এক কথার মানুষ।’

‘ঠিক আছে। তাই হোক।’ কপ্টারের দরজা খুলে হাত ইশারায় গার্ডদের ডাকল কবীর চৌধুরী।

একা যমুনা নয়, তার সঙ্গে ভবনিয়াও দুর্গের ভেতর থেকে উঠানে বেরিয়ে এল। পরস্পরের হাত ধরে আছে ওরা, ভবনিয়ার কি একটা কথায় হেসে উঠল যমুনা; হাসতে হাসতে যাকে বলে একেবারে গড়িয়ে পড়ার অবস্থা।

‘কেমন বুঝছ, রানা?’ জিজ্ঞেস করল কবীর চৌধুরী। ‘এখন বিশ্বাস হচ্ছে তো তোমার কপাল সত্যি পুড়েছে?’

রানা হতভম্ব, বোকার মত হাঁ করে যমুনার দিকে তাকিয়ে আছে।

যমুনা নির্লজ্জের মত ঢলাঢলি শুরু করল, তার এলোমেলো পা ফেলা দেখে কারও আর বুঝতে বাকি থাকল না যে সে নেশা করেছে।

‘কি ব্যাপার? কে ডাকে আমাকে?’ হেলিকপ্টারের খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল যমুনা, ভবনিয়ার একটা কাঁধ ধরে তাল সামলাচ্ছে।

‘তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে, যমুনা,’ বলল রানা। ‘আমি চাই তুমি হেলিকপ্টারে উঠে আমার পাশের সীটে বসবে। তুমি বসলে ওরা সবাই নেমে যাবে...’

রানার দিকে ভুলেও তাকাল না যমুনা, তাকিয়ে আছে সরাসরি কবীর চৌধুরীর দিকে। রানার কথা শেষ হয়নি, বাধা দিয়ে বলল, ‘এই লোকটার কথা শোনার জন্যে আমাকে ডাকা হয়েছে?’ প্রবলবেগে মাথা নাড়ল। ‘অসম্ভব! ওর সঙ্গে আমার কোন কথা নেই। ও কে? ওকে তো আমি চিনিই না!’ ভবনিয়ার দিকে তাকাল। ‘কি, বস্, ওকে আমি চিনি?’

ভবনিয়া মুচকি হেসে কবীর চৌধুরীর উদ্দেশে একটা চোখ টিপল।

‘যদি কিছু শুনতেই হয়, আমি আপনার কথা শুনব, মিস্টার চৌধুরী,’ আবার বলল যমুনা। ‘আপনি আমার বসের বন্ধু, কাজেই আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু ও কে? ও তো স্রেফ একটা আপদ, বাতিল মাল।’

‘ঠিক আছে, আমিই সব বলছি,’ বলল কবীর চৌধুরী। সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করল সে।

'জেলিগনাইট? রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইস?' কবীর চৌধুরী থামতেই প্রশ্ন করল যমুনা। তারপর গলা ছেড়ে হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই বলল, 'হায় আল্লাহ, কি বোকাই না বানিয়েছে আপনাদের! ওই বেল্ট আমিই ওকে দিয়েছিলাম, বলেছিলাম ওটায় রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইস ফিট করা আছে–লকটা আছে বেল্টের ভেতর দিকে, সেটা খুলতে হলে আঙুল দিয়ে লিভারটা একপাশে সরিয়ে দিতে হবে, তারপর বাইরের বোতামে চাপ দিলেই জ্যাকেটে লুকানো জেলিগনাইট বিস্ফোরিত হবে। বলেছিলাম ঠিকই, কিন্তু সত্যি কথা বলেছিলাম নাকি মিথ্যে কথা, ও যাচাই করেনি। তাহলেই বুঝুন কেমন গর্দভ ও। আপনারাও কম যান না, ওর কথা বিশ্বাস করে মৃত্যুভয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপছেন! নেমে আসুন, নেমে আসুন।'

যমুনার কথা শেষ হতে যা দেরি, হেলিকপ্টার থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল সবাই।

'কি আশ্চর্য, ওকেও তো নামাতে হবে!' বলল যমুনা, কারও জন্যে অপেক্ষা না করে নিজেই হেলিকপ্টারে উঠে পড়ল। প্রথমে রানার সঙ্গে সীটে জড়ানো রশিটা খুলল সে। তারপর ওর দুই ঊরুর মাঝখান থেকে জ্যাকেটটা নিয়ে ছুঁড়ে দিল বাইরে। দুই হেলিকপ্টারের মাঝখানে, পাকা উঠানে পড়ল সেটা। 'এই দেখুন, রিমোট কন্ট্রোলের বোতামে চাপ দিচ্ছি–,' রানার ডান হাতটা টেনে শিরদাঁড়ার কাছ থেকে সরাল, বেল্টের ভেতর দিকে আঙুল ঢোকাল একটা। 'লিভার ঠেলে এই খুললাম লক।' সেই আঙুল দিয়েই বেল্টের বাইরের দিকে বসানো বোতামটায় চাপ দিল, বারবার দিতেই থাকল। 'কই, ফাটছে?'

প্রথমে খায়রুল শুরু করল, দেখাদেখি আরও অনেকে, তারপর ভবনিয়া, এবং সবশেষে কবীর চৌধুরী–তবে ওদের হাততালির শব্দকে ছাপিয়ে উঠল যমুনার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, 'এখুনি

হাততালি কিসের? আপদটাকে আগে বিদায় করি, তারপর না!' কপ্টার থেকে নেমে এসে ভবনিয়ার সামনে হাত পাতল। 'একটা পিস্তল দিন, বস্। আর গার্ডদের বলুন, ওকে কপ্টার থেকে নামিয়ে পাঁচিলের সামনে দাঁড় করাক।'

'কিন্তু কথা ছিল ওই শালাকে আমরা মারব...,' শুরু করল খায়রুল।

ঝট্ করে তার দিকে তাকাল যমুনা। 'ও আবার কে? ওকে তো চিনলাম না, বস্! একজন ভদ্রমহিলার সামনে বাজে শব্দ ব্যবহার করছে!'

চাপা গলায় গর্জে উঠল কবীর চৌধুরী, 'খায়রুল, তুমি কি আমার মান-সম্মান ডোবাবে?' তারপর যমুনার দিকে তাকিয়ে অমায়িক হাসল। 'ও আমার ছেলে, খায়রুল কবীর। অত্যন্ত ব্রিলিয়ান্ট, ইলেকট্রনিক্স এক্সপার্ট...'

'বস্।' খায়রুল সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলল যমুনা, ভবনিয়ার আরও কাছে সরে এসে তার ঊরুতে নিতম্ব ঘষল। 'পিস্তলটা।'

'ওহ্, শিওর,' বলে শোল্ডার হোলস্টার থেকে নিজের পিস্তলটা বের করে যমুনাকে দিল ভবনিয়া।

'হ্যাঁ, মিস যমুনা,' কবীর চৌধুরী একটু আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বলল, 'আমার একটা বিশেষ অনুরোধ ছিল...'

'অনুরোধ?'

'দেখুন, মাসুদ রানা বলতে গেলে আমার জন্মশত্রু। নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ধরতে পারলে ওকে আমি জ্যান্ত কবর দেব। সে-কথা মিস্টার ভবনিয়াও জানেন...'

'আমিও জানি,' বলল যমুনা। 'বস্ আপনার অনুরোধে মাটিও খুঁড়ে রেখেছে—ওই দেখুন।' হাত তুলে পাঁচিলের দিকটা দেখাল সে। দিনের শেষ আলোয় গর্তটা পরিষ্কারই দেখতে পেল সবাই।

'কিন্তু জ্যান্ত কবর দেয়ার প্রচলন এখন আর পৃথিবীর কোথাও নেই, মিস্টার চৌধুরী। ওটা শুধু অমানবিক, জেনেভা কনভেনশনের বরখেলাপ বা কুৎসিত নয়, রীতিমত একটা স্যাডিস্টিক নোংরামি।'

কবীর চৌধুরীর চেহারা কালচে হয়ে এল। 'কিন্তু, মিস যমুনা, আপনি যদি জানতেন রানা আমার কি ক্ষতি করেছে...'

'দেখুন, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে শত্রুর আয়ু বাড়াবার কোন মানে হয় না,' বলল যমুনা। 'আপনি আমার বসের বন্ধু, আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, কাজেই আপনার অনুরোধ ফেলাও সম্ভব নয়।' পিস্তলটা ভবনিয়াকে ফিরিয়ে দিল সে। 'দিন, তাহলে আপদটাকে জ্যান্তই কবর দিন। তবে, এই জঘন্য কাজটা আমাকে আপনারা দেখতে বলবেন না। বস্ তো আমাকে নিয়ে চলে যাবার প্রস্তুতি নিয়েই রেখেছেন, কাজেই আগে আমরা বিদায় নিই, তারপর রানাকে নিয়ে যা খুশি তাই করুন আপনি।'

'সেই ভাল! ড্যাড, আমারও একটা অনুরোধ আছে তোমার কাছে। তুমি ওকে জ্যান্ত কবর দিতে চাইছ, দাও; কিন্তু তার আগে পায়ে আর পেটে গুলি করে ওকে আমি খানিকটা ভোগাব–কথা দিচ্ছি, শুধু আহত হবে, মরবে না।'

'চুপ!' চাপা গলায় ধমক দিল কবীর চৌধুরী।

'বস্, এ-সব কথা শুনে আমার নেশা তো ছুটে গেছেই, এবার না আমি বমি করে ফেলি!' কবীর চৌধুরীর দিকে তাকাল যমুনা। 'আমরা হেলিকপ্টারে চড়ে জাহাজে ওঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এক হাজার টন সোনা, সোনার সঙ্গে স্বয়ং বসের থাকা দরকার। ভবনিয়া বাহিনীর বেশিরভাগ সদস্যকে আগেই জাফনার উদ্দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আমরা রওনা হবার পর যা করার করবেন আপনারা। অন্তত রোলসরয়েস জেটিতে না পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। মোটকথা, গুলির শব্দ বা এই লোকটার চিৎকার

আমি যেন শুনতে না পাই।'

'ঠিক আছে, তাই হবে,' কথা দিল কবীর চৌধুরী। 'তবে অন্য এক প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন...'

'বলুন?'

'আমার লোকজনরা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কবীর চৌধুরী। 'তাদের একজনকেও তো দেখছি না।'

যমুনা হাসল। 'এর জবাব দেবেন মিস্টার ভবনিয়া।'

খুক করে কেশে ভবনিয়া বলল, 'তেলখনি হাতছাড়া হবার পর পার্টনারশিপ ব্যবসারও সমাপ্তি ঘটেছে, মি. চৌধুরী। ফোরবল-এর আর কোন অস্তিত্ব নেই। আমার নতুন প্রাইভেট সেক্রেটারির পরামর্শে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এখন আর লাভের অংশ কাউকে দেয়া হবে না।

'এই সিদ্ধান্ত সবার ভাল না-ও লাগতে পারে, তাই আপনার লোকজনকে পাকিস্তানী জাহাজটায় তুলে বিদায় করা হয়েছে। আর ভবনিয়া বাহিনীর সংখ্যা এখানে এত বেশি ছিল যে তারা একজোট হয়ে বিদ্রোহ করলে সোনা তো হারাতামই, প্রাণেও বাঁচতাম না। তাই ওদেরকেও জাফনায় পাঠিয়ে দিয়েছি। সে-ও আমার নতুন প্রাইভেট সেক্রেটারির পরামর্শে...'

সবার সামনে ভবনিয়াকে একটা চুমো খেলো যমুনা। 'ওহ্, বস্! আপনি এত প্রশংসা করছেন যে আমার লজ্জাই লাগছে। আর সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না, চলুন এবার...'

রাগে ফোঁস-ফোঁস করছে কবীর চৌধুরী, কিন্তু প্রতিবাদ করে কিছু বলতে পারছে না। দুর্গে সে আর তার ছেলেই রয়েছে শুধু, সাহায্য করার মত আর কেউ নেই। কিন্তু ভবনিয়ার বিশ্বস্ত শিষ্যরা সংখ্যায় কম হলেও, প্রত্যেকে সশস্ত্র। তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল রানার ওপর। 'খায়রুল, ওই শালাকে কপ্টার থেকে বের করো! কবরের কিনারায় দাঁড় করাও। তারপর দু'জন মিলে একশোটা

গুলি করব শালার পায়ে। হাঁটুর নিচে পা বলে কিছু রাখবই না। তারপর জ্যান্ত মাটি চাপা দেব...'

'আমরা জেটিতে পৌঁছাবার আগে নয়,' মনে করিয়ে দিল যমুনা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে আমার,' হিসহিস করে বলল কবীর চৌধুরী। 'এবার দয়া করে যান আপনারা!'

চোদ্দ

কপ্টার থেকে নামানো হলো রানাকে। সদ্য খোঁড়া কবরটা ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ গজ দূরে, পাঁচিল ঘেঁষে খোঁড়া হয়েছে। পিস্তল দিয়ে রানার পিঠে খোঁচা মারল খায়রুল, ঠেলতে ঠেলতে কবরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তার ঠিক পিছনেই রয়েছে কবীর চৌধুরী। আক্রোশে এখনও ফুঁসছে সে, ঘাড় ফিরিয়ে বারবার রোলসরয়েসটার দিকে তাকাচ্ছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় চারদিকে গাঢ় হচ্ছে ছায়া, তবে এখনও অনেকদূর দৃষ্টি চলে।

রোলসরয়েসটা রয়েছে গাড়ি-বারান্দার মুখের কাছে, ধাপগুলোর কাছ থেকে সবচেয়ে দূরে। রোলসরয়েসের পিছনে রয়েছে দুটো মার্সিডিজ আর একটা জীপ। ভবনিয়া আর যমুনাকে কবীর চৌধুরী দেখতে পেল না, তারা ইতিমধ্যে রোলসরয়েসে উঠে পড়েছে।

রোলসরয়েসের ড্রাইভিং সীটে বসেছে ভবনিয়ার অতি বিশ্বস্ত

একজন গেরিলা। ‘ঠিক আছে, নম্রসিংমে, গাড়ি ছাড়ো,’ নির্দেশ দিল ভবনিয়া।

ভবনিয়ার গায়ে ঢলে পড়ল যমুনা! ‘ধ্যাত! ধ্যাত!’

‘কি হলো, মাই ডিয়ার?’ ভবনিয়া অবাক।

যমুনা বলল, ‘নম্রসিংমে, এক মিনিট, ভাই।’ তারপর ভবনিয়ার কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে ফিসফিস করল, ‘মেয়েলি ব্যাপার, বস্, খুলে বলা যাবে না।’ নিজের দিকের দরজা খুলে ফেলেছে সে। ‘আমি একটু বাথরূম থেকে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করে আনি।’

খিকখিক করে চাপা স্বরে হাসল ভবনিয়া। ‘ঠিক হ্যায়, ডার্লিং। তবে দেরি কোরো না, কেমন?’

‘যাব আর আসব,’ চুমো খাবার সময় ভবনিয়ার কানের লতিতে ছোট্ট একটা কামড় দিল যমুনা।

ওদিকে কবরের দিকে পিছন ফিরিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে রানাকে। দশ হাত পিছিয়ে গেছে খায়রুল। তার হাতে পিস্তল, তবে এখনও সেটা রানার দিকে তোলেনি। ছেলের পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে কবীর চৌধুরী, তার হাতে একটা মেশিন পিস্তল। সে তাকিয়ে আছে রোলসরয়েসের দিকে। ‘ডাইনীটা আবার যাচ্ছে কোথায়!’ যমুনাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে বিড় বিড় করল সে।

শুনে খায়রুলও ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। জোড়া হেলিকপ্টারের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল ধাপ বেয়ে দ্রুত উঠে যাচ্ছে যমুনা। তার হাতে একটা হ্যান্ডব্যাগ রয়েছে। ধাপের মাথায় কয়েকটা মোটা পিলার দেখা যাচ্ছে, তারপর বিল্ডিঙে ঢোকার দরজা। কিন্তু দরজার দিকে গেল না যমুনা। একটা পিলারের আড়ালে পড়ল সে। সেই আড়াল থেকে বেরুবে, এই আশায় তাকিয়ে থাকল দুই চৌধুরী।

ওদের কাছ থেকে বিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে চারজন গেরিলা, পাইলট, গানার ও রকেট অপারেটর। ওদের দেখাদেখি তারাও ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে একশো গজ দূরের পিলারটার দিকে। কিন্তু পিলারের আড়াল থেকে যমুনা বেরুচ্ছে না।

'ড্যাড!' খায়রুলের গলাটা একটু কেঁপে গেল। 'ব্যাপারটা আমার কিন্তু ভাল ঠেকছে না।'

'হ্যাঁ, আমারও সন্দেহ হচ্ছে...'

অকস্মাৎ বিরুপিল্লাই ভবনিয়া ও নম্রসিংমেকে বিদায় জানিয়ে বিস্ফোরিত হলো রোলসরয়েস। ভয়ে নয়, শক ওয়েভের ধাক্কায় বাপের গায়ের ওপর ছিটকে পড়ল খায়রুল, দু'জনেই পড়ে গেল উঠানে। এরকম একটা কিছু ঘটার অপেক্ষায় ছিল রানা, তা সত্ত্বেও ধাক্কাটা সামলাতে পারল না, ঝাঁকি খেয়ে কবরের মধ্যে পড়ে গেল।

বিস্ফোরণটা এত শক্তিশালী যে রোলসরয়েসের পুরো ছাদটাই উড়ে গেছে। ওটাকে এখন আর গাড়ি বলে চেনার কোন উপায় নেই, স্রেফ আগুনের একটা কুণ্ড। এরপর ফুয়েল ট্যাংক বিস্ফোরিত হলো, অগ্নিকুণ্ডটা পাঁচ-সাত ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, দুই মার্সিডিজেও আগুন ধরে গেল।

নিজে দাঁড়াল কবীর চৌধুরী, তারপর খায়রুলকে দাঁড়াতে সাহায্য করল।

আগুনের উজ্জ্বল ও লাল আভায় সিঁড়ির ধাপ ও তার ওপরের অংশ উদ্ভাসিত হয়ে আছে, কবরের নিচে দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকাতে রানা দেখল পিলারের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে যমুনা, তাকিয়ে আছে এদিকেই, হ্যান্ডব্যাগটা দু'হাতে বুকের কাছে ধরা। হঠাৎ চোখের কোণে কিছু নড়তে দেখল রানা। দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতেই দেখতে পেল জোড়া কপ্টারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চার সৈনিক একযোগে যমুনার দিকে রাইফেল তুলছে। পাইলটের পিছু

নিয়ে রকেট অপারেটর ও গানার লাফ দিয়ে উঠে পড়ল কপ্টারে।

আঁচড়াআঁচড়ি করে কবর থেকে উঠল রানা। বেল্টের ভেতর একটা আঙুল ঢোকানোই ছিল, লিভারটা একপাশে ঠেলে লক খুলল, আরেক আঙুল দিয়ে চাপ দিল বাইরের বোতামটায়।

বিস্ফোরণ ও আগুনের তীব্র ঝলক চার সৈনিককে রকেটের মত ছুঁড়ে দিল শূন্যে। দুটো হেলিকপ্টারই কাত হয়ে গেল। আগুন তো নয়, যেন নিশ্ছিদ্র মোড়ক হিসেবে গায়ে শোভা পাচ্ছে গাঢ় কমলা রঙের চাদর। শূন্য থেকে খসে পড়ার পর তাতে পুড়ছে চার সৈনিকের লাশ। ওখান থেকে বিশ গজ দূরে আবার উঠানের পাকা মেঝেতে ছিটকে পড়েছে দুই চৌধুরী। এবার খায়রুল প্রথমে দাঁড়াতে পারল। কিন্তু বাপকে দাঁড়াতে সাহায্য না করেই সে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে দৌড় দিল, হাতের ঝাপটা মেরে সুটের আগুন নেভাবার চেষ্টা করছে।

'একটু দাঁড়াও!' পিছন থেকে ভারী গলায় নির্দেশ দিল কবীর চৌধুরী। 'আমার কাঠের পা উড়ে গেছে!' আগুন জ্বলছে তার সুটেও।

একটু থমকাল খায়রুল। 'কতবার বলেছি ক্রাচ ব্যবহার করতে, কিন্তু আমার কথা শুনলে তো! এখন কি তোমার জন্যে নিজের প্রাণটাও হারাব আমি?' আবার ছুটল সে, কবরটাকে পাশ কাটিয়ে এসে পাঁচিলে ওঠার চেষ্টা করছে।

এক পায়ে লাফাতে লাফাতে কবীর চৌধুরীও ছুটল সেদিকে, সে-ও হাত ঝাপটা দিয়ে কাপড়ের আগুন নেভাচ্ছে। একটু দূরে কাঠের পা-টা পেয়ে চটজলদি পরে ফেলল।

আগুনের আঁচ সহ্য করতে না পেরে রানা এবার নিজেই কবরে লাফিয়ে পড়েছে। মাটিতে পড়ে বসে নেই, পিছমোড়া করে বাঁধা হাত দুটো অনবরত মুচড়ে বাঁধনটা খোলার চেষ্টা করছে। হঠাৎ শরীরের নিচে কয়েকবার কেঁপে উঠল মাটি, আওয়াজ শুনে

বোঝা গেল আরও বড় কয়েকটা বিস্ফোরণ ঘটল কোথাও। গিঁটগুলো আগেই আলগা করা ছিল, বাঁধন খুলে ফেলল রানা। আগুনের আঁচ এড়াবার জন্যে কবরের উল্টোদিক থেকে উঠানে উঠছে।

পাঁচিলটা অনেক উঁচু, ইতিমধ্যে খাঁজ ও গর্তে পা দিয়ে ওটার মাথায় উঠে পড়েছে খায়রুল। কিন্তু কবীর চৌধুরী অর্ধেকটা ওঠার পর সুবিধে করতে পারছে না, পাঁচিলের গায়ে প্রকাণ্ড একটা টিকটিকির মত সেঁটে আছে। 'এই ইডিয়ট, হাতটা ধরে টেনে তোলো আমাকে!' এরকম বেকায়দা অবস্থায় পড়েও গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্ব হারাতে রাজি নয় সে, কথার সুরে ধমক যেমন আছে, তেমনি শ্লেষেরও অভাব নেই। 'এমন আচরণ কোরো না লোকে যাতে বলে একটা অকৃতজ্ঞ সিংহ জন্ম দিয়েছি আমি।'

পাঁচিল থেকে লাফ দিয়ে উল্টোদিকে পড়তে যাচ্ছিল খায়রুল, বাপের কথা শুনে থমকাল। কুত্তা-বিড়াল-শেয়াল-ছুঁচো ইত্যাদি না বলে বাপ তাকে সিংহ কেন বলছে, এটা বুঝতে না পারার মত বোকা সে নয়। মুচকি হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। পাঁচিলের মাথায় তিন পা হাঁটল সে, ঝুঁকে বাপের একটা কনুই ধরল। 'কিন্তু এখানে ইঁদুর বা বক, কিছুই তো আমি দেখছি না!' বলে হ্যাঁচকা টান দিল।

'নিচে,' বলল রানা, লাফ দিল কবীর চৌধুরীর অক্ষত পা লক্ষ্য করে।

কিন্তু সেই মুহূর্তে ওই পা পাঁচিলের মাথায় টেনে নিয়েছে কবীর চৌধুরী। দ্বিতীয়বার লাফ দিয়ে তার দ্বিতীয় পায়ের নাগাল পেয়ে গেল রানা, ধরতেও পারল। কবীর চৌধুরীর হাঁটু থেকে আধহাত লম্বা কাঠের ভাঙা পা-টা খসে এল ওর হাতে। সেই মুহূর্তে বাপকে নিয়ে পাঁচিল থেকে উল্টোদিকে লাফিয়ে পড়ল খায়রুল।

একটু পর পাঁচিলের মাথায় উঠল রানা। নিচের জঙ্গল ও

অন্ধকার থেকে একটা গুলি হলো, কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটটা। খালি হাতে ধাওয়া করাটা বোকামি, বাধ্য হয়ে আবার কবরের পাশে নেমে পড়ল রানা।

পাঁচিলের দিকে পিছন ফিরতেই হকচকিয়ে গেল ও। গোটা দুর্গে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে। মনে মনে যমুনার প্রশংসা করতে হলো। ওর অনুপস্থিতির সুযোগে শুধু যে বিরুপিল্লাই ভবনিয়ার মনোরঞ্জন করে সময় কাটিয়েছে, তা নয়, গাড়িতে আর দুর্গের বিভিন্ন জায়গায় জেলিগনাইটও বসিয়েছে।

মাথার ওপর একটা হেলিকপ্টার উড়ে এল। এল জেটি ও সাগরের দিক থেকে। আগুনের আভায় যমুনাকেও দেখতে পেল রানা, ধাপ বেয়ে নেমে এসে উঠান ধরে ছুটে আসছে ওর দিকে, চিৎকার করে বলছে, 'রানা! রানা!'

হেলিকপ্টারটা উঠানের মাঝখানে নামছে।

ছুটে এসে রানার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল যমুনা।

আলিঙ্গন সাধারণত এত দীর্ঘ হয় না। কিন্তু যমুনা এত বেশি কাঁপছে যে রানা তাকে ছাড়তে পারছে না। শুধু যে কাঁপছে, তা-ও নয়, অদম্য কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে তার পিঠ। 'এই বোকা, তুমি তো হাসবে!' বলল রানা, যমুনার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। 'একার চেষ্টায় এত বড় একটা ঘাঁটি ধ্বংস করে দিয়ে কাঁদে কেউ?'

দু'হাত দিয়ে রানার গাল ধরল যমুনা। 'এ আমার আনন্দের কান্না, রানা। যে-কাজ করেছিলাম, ভাবিনি তোমাকে জীবিত দেখব আবার...'

'তুমি বোধহয় ওই লোকটার কথা বলছ।'

'হ্যাঁ। আমি জানতাম তেলখনি রক্ষা করার প্রয়োজনে তুমি মরতেও পিছপা হবে না, তাই কিছুতেই তোমাকে বলতে পারিনি যে ডিভাইসটায় লক করার সিস্টেম আছে। কিন্তু তুমি চলে যাবার

পর দুশ্চিন্তায় পাগল হবার অবস্থা হলো আমার। বুঝলাম, ঝোঁকের মাথায় মারাত্মক ভুল করে ফেলেছি–লকের কথা না জানার কারণেই তুমি হয়তো মারা যেতে পারো...'

'দেখতেই পাচ্ছ তা যাইনি,' বলল রানা। 'জেলিগনাইট যখন ফাটল না, তোমার ওপর প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল আমার, এমনকি তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করলে কি না এই সন্দেহও জেগেছিল মনে। কিন্তু ভুল হোক আর বোকামি হোক, তোমার ওই ভুল বা বোকামির জন্যেই এখনও আমি বেঁচে আছি, এই সত্যটা তো অস্বীকার করতে পারছি না। তাছাড়া জীবনের চেয়ে বড় আর কি আছে?' যমুনাকে একটা চুমো খেতে যাচ্ছে ও।

হঠাৎ খুক করে কে যেন কাশল। 'বসকে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখবি তোরা?'

পরস্পরকে ছেড়ে দিয়ে ঘাড় ফেরাল ওরা। পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাবাব যে হাড্ডি–সোহেল।

'হাই, সোহেল ভাই! বসও এসে হাজির?' রুমাল বের করে চোখ মুছল যমুনা। 'ভবনিয়ার ভব-যন্ত্রণা শেষ, কিন্তু তার সোনার কি হবে?'

'ওগুলোর বৈধ মালিক আসলে মল্লিকা রত্নপ্রভার মা-বাবা ও ভাই-বোন–এখনও যদি বেঁচে থাকে তারা,' বলল সোহেল। 'কারণ, মল্লিকার কাকা রত্নগিরির টাকা দিয়েই ওই সোনা কেনা হয়েছে।' যমুনাকে মাঝখানে নিয়ে কপ্টারের দিকে হাঁটছে ওরা। 'আমরা খবর দিয়েছি, গেরিলাদের ছদ্মবেশ নিয়ে সরকারী সৈন্যরা পয়েন্ট পেড্রোতে যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে। জাহাজে কয়েকজন ক্রু ছাড়া আর কেউ নেই, কাজেই ওটাকে দখল করে কলম্বোয় নিয়ে যেতে ওদের কোন সমস্যা হবে না।'

'কিন্তু তেলবিক্রির টাকা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

যমুনা বলল, 'ভবনিয়ার একটা কমপিউটর ডিস্ক চুরি করেছি

আমি। তাতে তেলবিক্রির টাকার হিসাব, যে সব সুইসব্যাংকে টাকাগুলো জমা রাখা হয়েছে সেগুলোর নাম, নমিনির নাম, অ্যাকাউন্টগুলোর কোড নাম্বার ইত্যাদি সমস্ত তথ্য ঠাসা। আমার মনে হয়, সরকারী পর্যায়ে চেষ্টা করা হলে তেলবিক্রির সমস্ত টাকা আমরা উদ্ধার করতে পারব।'

'ভেরি গুড,' বলল সোহেল। 'বস্ সম্ভবত এ-ব্যাপারেও তোদের সঙ্গে আলাপ করতে চাইছেন।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বুঝতে পারলি, স্যার কি আমার ওপর খেপে আছেন?'

'তোর ওপর খেপবেন?' সোহেল অবাক। 'কেন?'

'না, মানে, কবীর চৌধুরীর সঙ্গে একই হেলিকপ্টারে থাকা সত্ত্বেও তাকে আমি বাধা দিতে ব্যর্থ হলাম, তেলখনিটা রক্ষা করতে পারলাম না...'

'তেলখনি? ওটা আগে যেমন বাংলাদেশের ছিল, এখনও তেমনি বাংলাদেশেরই আছে। রাগ করা তো দূরের কথা, বস্ বলছিলেন তোর নিরাপত্তার কথা ভেবে গত কয়েক ঘণ্টায় তাঁর বয়স নাকি দশ বছর বেড়ে গেছে।'

'আর আমার ওপর?' চট্ করে জিজ্ঞেস করল যমুনা। 'এই যে লক সিস্টেমের কথা চেপে যাওয়া...'

'বস্ শুধু একটা কথাই বলেছেন: মেয়েটার প্রতি গোটা বি.সি.আই-এর প্রত্যেকে আমরা কৃতজ্ঞ হয়ে থাকলাম!'

চুলের গোড়া পর্যন্ত লাল হয়ে গেল যমুনার মুখটা, তাই দেখে হাসল সোহেল।

'উনি আরও বললেন: রানার প্রতি ওর বিশ্বাস ও ভক্তির পরিমাণটা বোঝা গেল। আর শেষের অভিনয়টুকুর তো কোনও তুলনাই হয় না!'

দেখার মত হলো যমুনার চেহারাটা। রানার দিকে ফিরল

সোহেল, 'আর তোর সম্পর্কে বললেন: আমার পাগলা ছেলেটা গেছিল আরেকটু হলে। ওকে ফিরে পেয়ে বড় ভাল লাগছে, সোহেল!'

'যাহ্, এ-কথা বস্ বলতেই পারেন না। তুই মিথ্যে...'

'খোদার কসম, একটুও বানিয়ে বলছি না।'

রানার চোখে সন্দেহ। 'তুই হঠাৎ এত সিরিয়াস হতে শিখলি কবে থেকে? ভেতরের সব কথা জানলিই বা কি করে?'

যমুনা বলল, 'রানা, আমার কাছে ছোট্ট একটা রেডিও আছে।'

'রেডিও আছে...তো?' রানা অবাক।

'সোহেল ভাইয়ের সঙ্গে এক সুযোগে কথা বলি আমি,' বলল যমুনা। 'লক সিস্টেমের কথা জানাই ওঁকে। উনি বসকে জানান। সেজন্যেই আমরা সবাই প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায় ভুগছিলাম।'

'শুধু-শুধু।' বলল রানা। 'লক সিস্টেম থাক বা না থাক, বোতামটায় আমি চাপ দিইনি...'

'মিথ্যে কথা! বোতামে তুমি চাপ দিয়েছ!' প্রতিবাদ করল যমুনা। 'তা না হলে কি করে তুমি ভাবলে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি?'

সোহেল দাঁড়িয়ে পড়ল। এক হাতে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরল রানাকে। থরথর করে কাঁপছে সোহেল। গাল বেয়ে নামছে জলের ধারা।

***

মাসুদ রানা

গোপন শত্রু

কাজী আনোয়ার হোসেন

এই দেশের প্রতি আপনার ভালবাসা নিঃস্বার্থ ও নির্ভেজাল। আপনি জানতে পারলেন ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের গোপন কিছু জরিপ রেকর্ডে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণে খনিজ তেল আছে। আপনি তো আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু তারপরই জানা গেল, ফোরবল নামে একটা ক্রাইম সিন্ডিকেট সেই তেল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। যদি সুযোগ থাকে, আপনার ইচ্ছে হবে না নিজের প্রাণ দিয়ে হলেও ওদেরকে বাধা দিতে? এই পরিস্থিতিতে আপনি হলে যা করতেন, মাসুদ রানাও ঠিক তাই করেছে। এবং বিশ্বাস করুন, সেই 'বোতামটা' সত্যি ও টিপেছিল।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০